رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا

(সূরা আল্ ফুরকান 25:75)

আয়েলি মাসায়েল আওর উনকা হাল্
(পারিবারিক সমস্যাবলী ও এর সমাধান)

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)
নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা

আয়েলি মাসায়েল আওর উনকা হাল্
(পারিবারিক সমস্যাবলী ও এর সমাধান)

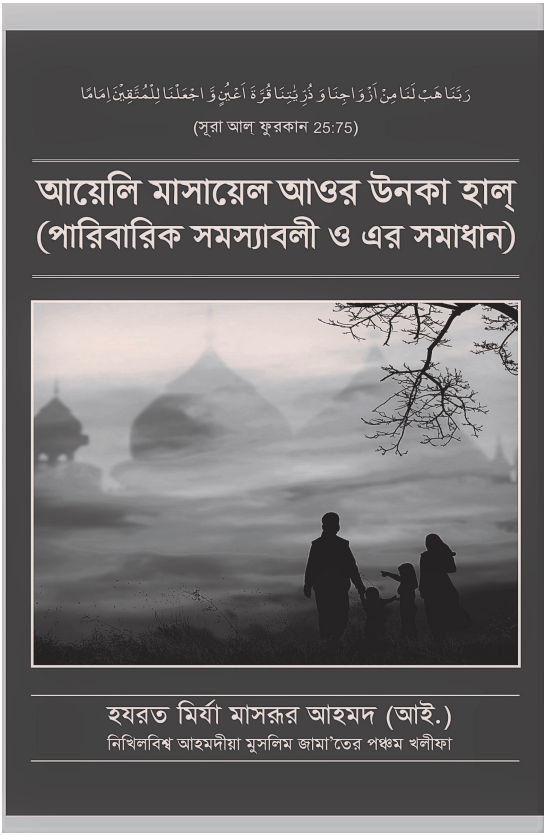

প্রকাশনায়

নাযারত নশর ও এশায়াত, কাদিয়ান

আয়েলি মাসায়েল আওর উনকা হাল্
(পারিবারিক সমস্যাবলী ও এর সমাধান)

লেখক	হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস
প্রকাশনায়	নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পাঞ্জাব
ভাষান্তর	বাংলা ডেস্ক; লন্ডন
প্রকাশকাল	আগষ্ট, ২০২২
সম্পাদনায়	বাংলা ডেস্ক, ভারত
সংখ্যা	৫০০ কপি
মুদ্রণে	ফযল এ উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান গুরদাসপুর, পাঞ্জাব

Issues of Family Life and Its Resolution

আয়েলি মাসায়েল আওর উনকা হাল্
(পারিবারিক সমস্যাবলী ও এর সমাধান)

by
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad*atba*
Khalifatul Masih the V
Translated by:
Bangladesk UK
Published by:
Nazarat Nashr O Isha'at Qadian
Gurdaspur; Punjab
Copies:
500
Edited by:
Bangla Desk, India
Edition:
August, 2022
Printed at:
Fazl Umar Printing Press,
Qadian

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রকাশকের কথা

আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ ও তত্ত্বসমৃদ্ধ নির্দেশনার সংকলন হ'ল "আয়েলি মাসায়েল আওর উনকা হাল্"। গ্রন্থটি সর্ব প্রথম ২০১৮ সালে উর্দূ ভাষায় যুক্তরাজ্যের লাজনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। এর বাংলা অনুবাদ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সালে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক লন্ডন থেকে প্রকাশনার ছাড়পত্রের সাথে গ্রন্থটির প্রিন্ট রেডি বাংলা অনুবাদ ফাইল আমরা পাই। মহান আল্লাহ্ তাআলা তাদের উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। তাদেরই দায়িত্বে এবং সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর অনুমোদনে গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ কাদিয়ান থেকে প্রথমবার প্রকাশিত হচ্ছে।

গ্রন্থটির রিভিউ এবং প্রুফ রিডিং করেছেন জনাব জাহিরুল হাসান ইনচার্য বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান এবং সাজিদা খাতুন সাহেবা। সাথে সহযোগিতা করেছেন জনাব হুমায়ূন কবীর ভরতপুর, শিক্ষার্থী জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ান। গ্রন্থটির প্রকাশে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে আল্লাহ্ তাআলা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং আমাদের সবাইকে তাঁর আদেশ পালন করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

আগষ্ট ২০২২

হাফিয মখদুম শরীফ
নাযির নশর ও এশায়াত কাদিয়ান

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

ভূমিকা

সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) তাঁর জুমআর খুতবার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের জলসা সালানা, লাজনা ইমাইল্লাহ্র ইজতেমা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষাবলীর আলোকে দৈনন্দিন বৈবাহিক সমস্যা এবং তার সমাধান সম্পর্কে ব্যাপক বিচক্ষণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। এগুলো সফল দাম্পত্য জীবনের জন্য এক আলোকবর্তিকাস্বরূপ।

মহান আল্লাহ্ পাকের রহমতে কেন্দ্রীয় লাজনা বিভাগ এই অমূল্য দিকনির্দেশনা এবং বরকতময় পরামর্শকে একত্রিত করতে সক্ষম হচ্ছে যা হুযুর আনোয়ারের খিলাফতের সূচনা লগ্ন থেকে ২০১৩ সন পর্যন্ত বিভিন্ন জার্নাল ও বইয়ে মুদ্রিত হয়েছে এবং পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়েছে। মহান আল্লাহ পাক এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। এবং বিশেষ করে এটি আহমদী মহিলাদের জন্য আশীর্বাদ ও পথনির্দেশের উৎস করে তুলুন যাতে আমাদের পরিবারগুলি জান্নাত-প্রতীম হয় এবং শান্তি ও নিরাপত্তার আবাসস্থল হয়ে ওঠে।

মাহমুদ মালিক সাহেব (জীবন উৎসর্গকারী কর্মকর্তা, অতিরিক্ত ওয়াকালাত এশায়াত লন্ডন) এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্ ইউ কে-এর প্রকাশনা বিভাগ এই গ্রন্থটির সমাপ্তি ও প্রকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে লাজনা বিভাগ টিমকে সহায়তা করেছে। আল্লাহ্ তাআলা তাদের উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন।

দোয়াপ্রার্থী,
রেহানা আহমদ
ইনচার্জ লাজনা বিভাগ,ইউ.কে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অবতরণিকা

"পারিবারিক সমস্যাবলী" সম্পর্কে আমি যেসব বিষয় বর্ণনা করেছি তা সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহের সাথে সম্পর্কযুক্ত। লাজনা ও নাসেরাতদের সেগুলো পাঠ করে তাদের ব্যবহারিক জীবনে এর প্রতিফলন ঘটানো উচিত। এছাড়া মজলিসগুলোরও উচিত এগুলো দৃষ্টিতে রাখা এবং নিজেদের মিটিং ও সমাবেশে বারবার পাঠ করা।

লাজনা সদস্যদেরকে আল্লাহ্ তা'লা এসব উপদেশ মেনে চলার সুযোগ ও সামর্থ্য দান করুন। আমীন

মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস

সূচিপত্র

বিবাহের ঘোষণায় পঠিত মসনূন আয়াতসমূহ **01**
ইসলামি বিবাহ: একটি চুক্তি **03**
বিয়ে হলো স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে সম্পাদিত এক চুক্তির নাম 06
বিয়েশাদির উদ্দেশ্য **10**
মানব-বংশ বিস্তারের মাধ্যম 10
টেকসই এবং স্থায়ী সম্পর্ক-বন্ধনের মূল ভিত্তি: সহজ-সরল-সত্য কথন 13
সরল সত্য কথন ও তাকওয়ার ঘাটতির কারণে শ্বশুরালয়ে বাড়াবাড়ি 15
ইসলাম এক পরিপূর্ণ জীবন-বিধান **19**
স্বামী ও স্ত্রী পস্পরের পোশাকস্বরূপ 21
ক্রোধ সংবরণ করা 23
সমাজে নারী পুরুষের ভূমিকা **28**
জীবনসঙ্গী ও সন্তানসন্ততির জন্য দোয়া 30
সন্তানদের ওপর পিতামাতার পারস্পরিক ভালোবাসা ও
প্রীতি-হীনতার ক্ষতিকর প্রভাব 34
'আসসালামু আলাইকুম' বলার কল্যাণসমূহ 35
সুন্দর ব্যবহারে উন্নত মান **37**
পিতামাতার সাথে উত্তম ব্যবহার 37
রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজনে অধিকার 40
রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয় এবং তাদের গুরুত্ব 40
আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ 43
পুরুষ নারীদের তত্ত্বাবধায়ক 45
Joint family system: যৌথ পরিবার ব্যবস্থা 57
পারিবারিক জীবনে সমস্যার বিভিন্ন কারণ **61**
স্ত্রীদের প্রতি দোষারোপ এবং অন্যায় আচরণ 61
পুরুষদের লোভ-লিপ্সা এবং আত্মসম্মানবোধের অভাব 67
অন্যায় দাবি-দাওয়া 70
স্ত্রীর সম্পদ ও সম্পত্তির প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি 73
মোহরানার গুরুত্ব **77**
প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা এবং মোহরানা আদায় 77
মোহরানা-সংশ্লিষ্ট স্ত্রীর অধিকার 79
সম্পর্ক-বন্ধনে তিক্ততা সৃষ্টির কতিপয় কারণ **83**
অপছন্দের বা অসম্মতির বিয়ে 83
অহমিকা সমস্যার এক পাহাড় 85
সহ্য ও ধৈর্যের অভাব 87

মিথ্যার কারণে আস্থাহীনতা 89
মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান 90
স্বল্পতুষ্টি এবং আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থার অভাব 92
মহিলাদের অন্যায় আকাঙ্খা ও দাবি-দাওয়া 93
শান্তিপূর্ণ পারিবারিক জীবনের জন্য প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা 100
ধৈর্য্য এবং স্থৈর্য্য 100
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 101
স্বামীর সাথে পূর্ণ বিশ্বস্ততা প্রদর্শন এবং ইস্তেগফারের অনুপ্রেরণা 103
দোয়া, সদকা এবং তওবা-ইস্তেগফারের মাধ্যমে
কঠিন সময়ের মোকাবিলা করা 103
পারিবারিক জীবনে মুখ, কান এবং চোখের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 106
অনুগত স্ত্রী এবং মুত্তাকী স্বামী 108
পুরুষের দায়-দায়িত্ব 110
পরিবার-পরিজনের সাথে উত্তম আচরণ 110
একাধিক বিয়ের শর্ত এবং পূর্বের স্ত্রীদের অধিকার 112
স্ত্রীর অধিকার প্রদান করা স্বামীর দায়িত্ব 117
পুরুষের আচার-আচরণ এবং তাদের উদ্দেশ্যে উপদেশ 122
প্রত্যেকেই রাখাল বা তত্ত্বাবধায়ক 123
তালাক অথবা খোলা 127
তালাকপ্রাপ্তা নারীদের প্রাপ্য অধিকার 128
হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী (রা.)-এর অনুকরণীয় আদর্শ 131
মহিলাদের আবেগ অনুভূতির প্রতি সংবেদশীলতা 136
আহমদী মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং তার দায়িত্ব 139
সমাজে মহিলাদের ভূমিকা 139
কুধারণা এবং পঙ্কিলতা থেকে শিশুদেরকে রক্ষা করুন 141
স্ত্রী হিসেবে নারী 142
মা হিসেবে নারী 143
ঘরের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নারী 147
উম্মুল মু'মিনীন হযরত আম্মাজান (রা.)-এর উপদেশ 150
আগুন থেকে পরিত্রাণের মাধ্যম হচ্ছে কন্যাসন্তান 152
দুই পক্ষের বন্ধু ও বান্ধবীদের ভূমিকা 154
কর্মকর্তাদের প্রতি উপদেশবাণী 156
কর্মকর্তাদেরকে নসীহত ও সতর্কীকরণ 156
লাজনা ইমাইল্লাহর দায়-দায়িত্ব 159
দুশ্চিন্তার সূরাহা: ইস্তেগফার 160
একটি পূর্ণাঙ্গীন বার্তা 161

বিবাহের ঘোষণায় পঠিত মসনূন আয়াতসমূহ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ ۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

অর্থঃ হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রভু প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন কর, যিনি একই সত্তা থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আর তাদের উভয় থেকে বহু নর ও নারীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে আবেদন নিবেদন করে থাক, (বিশেষ ভাবে) রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়তার ক্ষেত্রে (তাকওয়া অবলম্বন কর)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের পর্যবেক্ষক। (সূরা আন নিসা 4 : 2)

হে যারা ঈমান এনেছ। তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সহজ-সরল-স্বচ্ছ কথা বল; তাহলে তিনি তোমাদের আচরণ শুধরে দিবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন। আর যে-ই আল্লাহ্‌র ও তার রাসূলের আনুগত্য করে সে নিশ্চয় অনেক বড় সফলতা লাভ করে। (সূরা আল আহযাব 33 : 71-72)

হে যারা ঈমান এনেছ। আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। আর প্রত্যেকেরই লক্ষ্য রাখা উচিত যে, সে আগামীকালের জন্য অগ্রে কী প্রেরণ করছে। আর আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ সবিশেষ অবহিত। (সূরা আল হাশর 59 : 19)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর একটি নির্দেশনা

"স্বামী-স্ত্রী উভয়কে পরস্পরের মাঝে ভালো গুণাবলী সন্ধানের উপদেশ দিতে গিয়ে মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের একজনের চোখে যদি অপরজনের দোষত্রুটি ধরা পড়ে অথবা তার কোন অভ্যাস অপছন্দ হয়, তবে তার মাঝে অনেক অভ্যাস এমনও থাকবে যা পছন্দও হবে এবং ভালোও লাগবে। সুতরাং এই পছন্দনীয় কথাগুলো সামনে রেখে ত্যাগের মনমানসিকতা নিয়ে সমঝোতা ও সম্প্রীতির পরিবেশ গড়া উচিত।"

(খুতবা জুমুআ, ২ জুলাই ২০০৪, মিসিসাগা, কানাডা;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল ১৬ জুলাই ২০০৪)

ইসলামি বিবাহঃ একটি চুক্তি

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় সে আয়াতগুলো অনুবাদ সহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যেগুলো বিবাহের ঘোষণার সময় পাঠ করা সুন্নত। বিয়ের ঘোষণায় এ আয়াতগুলো পাঠের পশ্চাতে কী প্রজ্ঞা নিহিত তা বর্ণনা করতে গিয়ে সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন–

"ইসলামী নিকাহ বা বৈবাহিক বন্ধনের ঘোষণা দেয়ার মাঝে যে প্রজ্ঞা রয়েছে তাহলো, নরনারী যারা খোদার নির্দেশ অনুসারে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক-বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তারা বিয়ের সময় এই অঙ্গীকার করে যে আমরা এসব ঐশী নির্দেশ মেনে চলার চেষ্টা করব যা আমাদের বিয়ের ঘোষণার সময় পাঠ করা হয়েছে। এসব আয়াত পাঠ করার উদ্দেশ্য হলো, আমরা যেন আমাদের জীবনকে সে অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে পারি। এসব উপদেশের মাঝে সর্বপ্রথম নির্দেশ হলো, তাকওয়ার পথে পদচারণা কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর। সারকথা হলো, বিয়ের ঘোষণার সময় এই নির্দেশের অধীনে ছেলেমেয়ে বিয়েতে সম্মতি দিয়ে থাকে বা বিয়েতে মত দেয় যে আমরা এগুলো মেনে চলবো। কেননা যদি তোমাদের মাঝে তোমাদের সেই প্রভুর, সেই প্রিয় প্রভুর ভালোবাসা ও ভয় থাকে, যিনি তোমাদের জন্ম থেকে বরং জন্মেরও পূর্ব থেকে সকল প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রেখেছেন, সকল চাহিদা পূরণ করেছেন তাই তোমাদেরও সর্বদা তা-ই করা উচিত যা খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করবে আর এর ফলে তোমরা সেসকল নেয়ামতের উত্তরাধিকারী হবে। স্বামী-স্ত্রী যখন একটি অঙ্গিকারের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক-বন্ধনে আবদ্ধ হলো আর একে অন্যের প্রতি খেয়াল রাখার অঙ্গিকার করলো তখন উভয়ের প্রতি আবশ্যকীয় এ দায়িত্ব বর্তায় যে, এই সম্পর্ককে আরো দৃঢ় করার জন্য তারা পরস্পরের আত্মীয়-পরিজনের প্রতিও যত্নবান থাকবে।

মনে রাখবেন, স্বামী-স্ত্রী যদি একে অন্যের প্রতি যত্নবান হয়, একে অন্যের আবেগ অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, একে অন্যের আত্মীয়স্বজনদের খেয়াল রাখে, তাদেরকে যথাযথ সম্মান দেখায়, তাদেরকে তাদের প্রাপ্য সম্মান দেয় তাহলে সম্পর্ক-বন্ধনে ফাটল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কুমন্ত্রণাদাতাদের আক্রমণ অবশ্যই ব্যর্থ হবে। কেননা পরিবারের বাইরের পরিবেশও পারিবারিক সম্পর্কে প্রভাব ফেলে থাকে। আপনাদের দাম্পত্য জীবনের ভিত্তি যেহেতু তাকওয়ার

ওপর হবে (তাই আপনারা নিরাপদ) কেননা তাকওয়ার নীতিতে জীবনযাপনকারীদের খোদা তা'লা শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করে থাকেন। তাকওয়ার নীতির অনুসরণে স্বামী-স্ত্রী'র মাঝে যখন পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বস্ততাভিত্তিক সম্পর্ক গড়ে ওঠবে তখন উস্কানীদাতা ব্যক্তি সে যত প্রভাবশালী নিকটাত্মীয়ই হোক না কেন প্রতিবারই সে এ কথাই শুনতে পাবে যে, আমি আমার স্ত্রীকে অথবা স্ত্রী বলবে আমি আমার স্বামীকে ভালোভাবে জানি– আপনার নিশ্চয়ই কোন ভুল ধারণা জন্মেছে। চলুন, এখনই বিষয়টি স্পষ্ট করে নেই। যে ব্যক্তি একপক্ষের কাছে অন্য পক্ষের কথা পৌঁছায় সে যদি সৎ হয় তাহলে সে কখনোই বলবে না যে তোমার স্বামীর কাছে বা স্ত্রীর কাছে আমার নাম নিয়ে জিজ্ঞেস করবে না আর আমি কথাটি যাচাই বাছাই করার জন্য বলি নি। কথা পাড়বার পর অন্য কাউকে সেটি বলতে বারণকারী ব্যক্তি যেই হোক, নিশ্চিতভাবে জেনে নিন যে, সে সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টিকারী, দূরত্ব সৃষ্টিকারী এবং মিথ্যাচারী। যদি কারো সহানুভূতি থাকে আর সে সংশোধনও চায় তবে সে সব সময় এমন কথা বলবে যাতে স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

অতএব স্বামী ও স্ত্রী উভয়কেই সর্বক্ষেত্রে তাকওয়ার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে হবে। সম্পর্কের বন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্য দোয়ায় রত থাকতে হবে, একে অপরের আত্মীয়স্বজনদের সম্মান করতে হবে এবং তাদের প্রাপ্য সম্মান তাদেরকে যথাযথভাবে দিতে হবে। কখনো যদি কোন বিষয় কানে আসে সেই কথা প্রচারকারী যত ঘনিষ্ঠজনই হোক না কেন স্বামী-স্ত্রীর উচিত, ঠাণ্ডা মাথায় ভালোবাসার পরিবেশে সেই বিষয়টি পরিষ্কার করে নেয়া যাতে মিথ্যাচারীর প্রকৃতরূপ প্রকাশ পেয়ে যায়। তা না করে যদি কথাগুলো অন্তরে জমিয়ে রাখেন তাহলে ঘৃণা ও দূরত্ব সৃষ্টি হওয়া ছাড়া এবং সংসার ভাঙ্গা ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হবে না।

(জুমুআর খুতবা, ১০ নভেম্বর ২০০৬, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১ ডিসেম্বর ২০০৬)

একইভাবে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে, পরস্পরের মাঝে ভালো গুণাবলী সন্ধানের উপদেশ দিতে গিয়ে হুযূর (আই.) একবার বলেন–

"মহানবী (সা.) স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের মাঝে ভালো গুণাবলী সন্ধানের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, তোমাদের একজনের চোখে যদি অপরজনের দোষত্রুটি ধরা পড়ে অথবা তার কোন অভ্যাস অপছন্দ হয় তবে তার অনেক অভ্যাস এমনও থাকবে যা পছন্দও হবে এবং ভালোও লাগবে। সুতরাং এই

পছন্দনীয় গুণগুলো সামনে রেখে ত্যাগের মনমানসিকতা নিয়ে সমঝোতা ও সম্প্রীতির পরিবেশ গড়া উচিত। **অতএব এ উপদেশ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য।** এরা উভয়ে যদি আবেগ অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে তাহলে বাড়িতে সারাক্ষণ যেসব কলহ-বিবাদ চলতে থাকে তা হওয়ার কথা নয়। সামান্য কথা নিয়ে অনেক সময় বিষয় এমন কষ্টদায়ক রূপ ধারণ করে যে, ভেবে হতবাক হতে হয়ে অর্থাৎ এ জগতে এমন মানুষও আছে যারা মানুষ আখ্যায়িত হলেও কার্যত পশুর চেয়েও অধম।"

(জুমুআর খুতবা, ২ জুলাই ২০০৪, মিসিসাগা, কানাডা;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৬ জুলাই ২০০৪)

আরেক স্থলে হুযূর (আই.) বলেন–

"বিয়েশাদির বিষয়টি স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে এক ধরণের চুক্তির মর্যাদা রাখে। স্ত্রীর প্রতি নির্দেশ হলো এই চুক্তির আলোকে তোমার প্রতি নিম্নোক্ত দায়-দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। যেমন, স্বামীর চাহিদা ও প্রয়োজনগুলোর দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা, সন্তানসন্ততির লালনপালন করা ও পারিবারিক দায়িত্ব পালন করা। একইভাবে স্বামীর দায়িত্ব হলো স্ত্রী-সন্তানদের ভরণপোষণের দায়িত্ব বহন করা। তাদের যাবতীয় প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের দায়িত্ব তার কাঁধে বর্তায়। আর স্বামী-স্ত্রী উভয়ই সমন্বিত প্রচেষ্টায় সন্তানদের উত্তম ও উৎকৃষ্ট শিক্ষাদীক্ষা বা প্রশিক্ষণ দিবেন। এ কাজের দায়িত্ব তাদের উভয়ের ওপরই বর্তায়। এই চুক্তির আলোকে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর মিলেমিশে যত বেশি একে অন্যের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করবেন ততই সুন্দর ও আকর্ষণীয় একটি সমাজ গড়ে উঠবে।"

(জুমুআর খুতবা, ১৯ ডিসেম্বর ২০০৩, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৪)

জার্মানির বার্ষিক জলসায় আহমদী মহিলাদের সম্বোধন করে হুযূর (আই.) সূরা আন্ নিসার দ্বিতীয় আয়াতটি তেলাওয়াত করে কয়েকটি উপদেশ প্রদান করেন। হুযূর (আই.) বলেন–

"যে আয়াতটি আমি তেলাওয়াত করেছি এটি নিকাহর ঘোষণাকালে পাঠ করা হয়। এতে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, 'হে লোক সকল (নর ও নারী)! আল্লাহ্ তা'লার তাকওয়া অবলম্বন কর। তাঁকে ভয় কর আর তাঁর দেয়া বিধিনিষেধ মেনে চল। আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য অধিকারও আদায় কর এবং তাঁর বান্দাদের

প্রাপ্য অধিকার প্রদানও নিশ্চিত কর। আল্লাহ্‌র প্রাপ্য অধিকার আদায় করলে খোদাভীতি তোমাদের অন্তরে জাগরুক থাকবে। তোমাদের মন অনিয়ন্ত্রিতভাবে এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করবে না। শয়তান তোমাদেরকে পরাস্ত করতে পারবে না। (একই সাথে) বান্দাদের প্রাপ্য অধিকারও প্রদান করবে। এই আদেশ তোমরা, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য।

সর্বপ্রথম কথা হলো, স্ত্রী ও স্বামী উভয়ই যেন পারস্পরিক দায়িত্ব পালন করেন। একে অন্যের প্রাপ্য অধিকার যেন সুনিশ্চিত করেন। পরস্পরের প্রাপ্য অধিকারের বিষয়ে যেন যত্নবান হন। পারিবারিক পরিবেশকে স্নেহ, মমতা ও ভালোবাসার একটি কেন্দ্রস্থলে পরিণত করুন আর সন্তানসন্ততির প্রাপ্য অধিকারও প্রদান করুন। সন্তানদেরকে সময় দিন আর তাদের উত্তম শিক্ষাদীক্ষার প্রতি মনোযোগী হোন। এমন অনেক ছোটখাটো বিষয় আছে যেগুলো পিতামাতা উভয়কেই যৌথভাবে সন্তানদের শেখাতে হয়। তা না হলে তারা সেগুলো বাইরে থেকে ভুল শিখে আসবে। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পরস্পরের পিতামাতা, ভাইবোনের প্রতি প্রেম, প্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক রাখুন, তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করুন। এটি কেবল স্ত্রীদের দায়িত্ব নয় বরং পুরুষদেরও দায়িত্ব। এভাবে যে সমাজ গড়ে উঠবে তা হবে ভালোবাসা, হৃদ্যতা ও সহনশীলতায় পরিপূর্ণ এক সমাজ। সেখানে বাক-বিতণ্ডা করে নিজেদের অধিকার আদায়ের প্রশ্নই উঠবে না বরং এতে একে অন্যের অধিকার প্রদানের প্রতি সবাই মনোযোগী হবে। প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের অধিকার প্রদানে ত্যাগ স্বীকারে সচেষ্ট থাকবেন।

(জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৩ আগষ্ট ২০০৩;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৮ নভেম্বর ২০০৫)

বিয়ে হলো স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে সম্পাদিত এক চুক্তির নাম

২০১১ সালের ২৩ জুলাই বার্ষিক জলসা উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ভাষণের সূচনায় হুযূর (আই.) সেই সব আয়াত তেলাওয়াত করেন যা নিকাহর ঘোষণার প্রাক্কালে পাঠ করা হয়ে থাকে। হুযূর (আই.) এরপর বলেন–

"স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ হবার পর তারা একটি এককে পরিণত হন বা একদেহ একপ্রাণ হয়ে যান। এই সম্পর্ক বন্ধনকে কেন্দ্র করে বংশ বিস্তার ঘটে। এই এককের মাঝেই যদি তাকওয়া না থাকে, এই বিবাহিত দম্পতির

মাঝেই যদি তাকওয়া না থাকে তাহলে ভবিষ্যত প্রজন্মের মাঝে তাকওয়া সৃষ্টি হবারও কোন নিশ্চয়তা নেই আর সমাজেও উত্তম চরিত্র ও খোদাভীরুতা সৃষ্টি হবার কোন নিশ্চয়তা নেই। কেননা একজন থেকে দু'জন আর দু'জন থেকে চারজন হয় আর এভাবেই সমাজ গড়ে ওঠে।"

হুযূর (আই.) আরো বলেন–

"অতএব একজন মু'মিন একদিকে যেভাবে খোদার সাথে কৃত অঙ্গিকার রক্ষা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে, ঠিক একইভাবে মানুষের সাথে কৃত অঙ্গিকার রক্ষা করার ক্ষেত্রেও তার সাধ্যমত চেষ্টা থাকে। গতকালও আমি বলেছিলাম, হুকুকুল ইবাদ তথা মানুষের প্রাপ্য অধিকার প্রদান না করে হুকুকুল্লাহ তথা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য অধিকার সঠিকভাবে প্রদান করা যায় না। সে ক্ষেত্রেও (অর্থাৎ খোদার অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে) তখন সূক্ষ্ম ফাটল (Crack) দেখা দেয়। একবার কোন বাসনে সূক্ষ্ম ফাটল দেখা দিলে তা ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকে। তাই মানুষের প্রাপ্য অধিকার প্রদান নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর মানুষের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার প্রদান বিশেষ গুরুত্ব রাখে। সমাজ এবং পরবর্তী প্রজন্মের কল্যাণের নিরিখে এসবের গুরুত্ব অনেক বেশি। তাই এসব প্রাপ্য যথাযথভাবে প্রদান একজন প্রকৃত মু'মিনের গুরুদায়িত্ব।

আল্লাহ্ তা'লা স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সংরক্ষণের বিষয়ে এজন্য গুরুত্বারোপ করেছেন আর মহানবী (সা.) এ আয়াতগুলো এজন্য পাঠ করার বিধান রেখেছেন যাতে মানুষকে বুঝানো যায় যে, তোমরা যদি তাকওয়া অবলম্বন করে একে অন্যের অধিকার প্রদান কর, তবেই তোমরা আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত দায়িত্বাবলী আর ঈমানী অঙ্গিকারসমূহ সঠিকভাবে পালনে সক্ষম হবে আর একই সাথে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও ঈমানী দায়-দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে সক্ষম হবে। তাই মুমিন নরনারী এবং প্রত্যেক আহমদী স্বামী ও স্ত্রীকে মনে রাখতে হবে যে, তারা কেবল তখনই নিজেদের অঙ্গিকার রক্ষাকারী বলে গণ্য হবেন যখন প্রত্যেক আত্মীয়তার ক্ষেত্রে প্রাপ্য মৌলিক অধিকার আদায় করার সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন।"

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসার ভাষণ, ২৩ জুলাই ২০১১;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৪ মে ২০১২)

পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে আহমদীয়া জামা'তের সদস্যবর্গকে

নবীজি (সা.)-এর একটি হাদীসের বরাতে হুযূর (আই.) খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ প্রদান করে বলেন–

"হযরত আমের (রা.) বলেন, আমি নোমান বিন বশীর (রা.)-কে বলতে শুনেছি, মহানবী (সা.) বলেছেন, তুমি মু'মিন বা বিশ্বাসীদের পারস্পরিক অঙ্গীকার, ভালোবাসা ও হৃদ্যতার ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন দেহের মত দেখতে পাবে। দেহের কোন একটি অঙ্গ যখন রোগাক্রান্ত হয় তখন তার সমস্ত দেহই সে কারণে অস্বস্তিতে ও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে যায়।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বির্‌রে ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদব , বাবু তারাহুমিল মুমিনিনা ওয়া তা'আতুফিহিম ওয়া তা'আহুদিহিম)

নিজ সমাজে সৃষ্ট রোগব্যাধিকে আপনারা এক ও অভিন্ন দেহ হিসেবে উপলব্ধি করার মত যোগ্যতা লাভ করবেন– আল্লাহ্‌র কাছে এই দোয়াই থাকবে।"

হুযূর (আই.) আরো বলেন–

"মহানবী (সা.) মু'মিনদের সম্বোধন করে বলছেন, তোমরা একটি মালায় গ্রথিত হবার পর একে অপরের কষ্ট অনুভব কর। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক-বন্ধন, এর চেয়েও বেশি গভীর আর দৃঢ়তর এক বন্ধন। তোমরা একটি চুক্তি সম্পাদন করে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে এ কথার অঙ্গিকার করে থাক যে, আমরা তাকওয়ায় প্রতিষ্ঠিত থেকে একে অপরের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের চেষ্টায় রত থাকব। তাদের সাথে তোমরা এ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হও যে, তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আমরা ভবিষ্যতের জন্য কী কী পুণ্য সঞ্চয় করছি, আমাদের পরবর্তী জীবনে কী কী পুণ্যকর্ম আমাদের কাজে আসবে এবং মৃত্যুর পর কী কী পুণ্য আমাদের আত্মিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে ও আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে পুণ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সহায়ক হবে– এ বিষয়ের প্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখব। আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ– তোমরা আল্লাহ্ তা'লার এই সতর্কবাণীর অধীনে এই অঙ্গিকার করে থাক। নিজ জীবনে তোমরা জীবনসঙ্গীর সাথে যে আচরণই করবে তা তোমরা জগতবাসীর দৃষ্টিতে লুকাতে পার কিন্তু খোদা তা'লার দৃষ্টিতে লুকাতে পারবে না। তিনি প্রত্যেক বিষয়ে অবহিত। তিনি মানুষের অন্তর্যামী।"

(জুমুআর খুতবা ২৪ জুন ২০০৫, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, কানাডা;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৮ জুলাই ২০০৫)

যুগ খলীফা (আই.)-এর একটি নির্দেশনা

"একথা প্রত্যেক আহমদী দম্পতির মনে রাখা উচিত, নিজেদের জীবনের জন্য যদি কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নির্ধারিত থাকে সেক্ষেত্রে নবদম্পতি নিজেদের জীবনে যে পদক্ষেপই গ্রহণ করুক তারা সব সময় এই চিন্তা মাথায় রেখেই অগ্রসর হবে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার একটি আদেশ পালনকল্পে এ কাজটি করছি। মানুষ যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশ মেনে চলে তখন তার চিন্তাধারার প্রতিটি আঙ্গিক সেই অভিমুখী হয়ে থাকে যা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের পথ।"

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৮ জুন ২০১২)

বিয়েশাদির উদ্দেশ্য

মানব-বংশ বিস্তারের মাধ্যম

১৫ মে ২০১১, লন্ডনের ফযল মসজিদে প্রদত্ত এক নিকাহর খুতবায় হুযূর (আই.) বলেন–

"নিকাহ্ বা বিয়েকে আল্লাহ্ তা'লা মানব-বংশ বিস্তারের একটি মাধ্যম নির্ধারণ করেছেন। যাতে দু'টি পরিবারের মাঝে সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং দু'জনের মিলন ঘটে, ইসলাম এটিকে খুবই উত্তম কাজ আখ্যা দিয়েছে। কয়েকজন সাহাবী (রা.) একবার বলেছিলেন, আমরা কখনো বিয়ে করব না আমরা চিরকুমার থাকব। তখন মহানবী (সা.) বলেছিলেন, যে বা যারা আমার সুন্নত অনুযায়ী জীবনযাপন করে না তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিয়েও করি, দৈনন্দিন কাজকর্মও করি, আবার আমার সন্তানসন্ততিও আছে। (কাজকর্ম বলতে এখানে দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততা বুঝানো হয়েছে) এছাড়া আরও অনেক দায়-দায়িত্বও রয়েছে।"

হুযূর (আই.) আরো বলেন–

"বিয়ে করা একটি মৌলিক নির্দেশ– এর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কেবল বংশবিস্তার বা প্রজন্ম বৃদ্ধি করা নয় বরং অনেক পাপ থেকে নিজেদের রক্ষা করা আর একটি পূণ্যবান প্রজন্ম ধারা সূচিত করাও এর উদ্দেশ্য। অতএব, নব-দম্পতিকে সব সময় এ কথা মনে রাখতে হবে, বিয়ে, যা সব ধর্মের অনুসারীদের মাঝে বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের মাঝে হয়ে থাকে, একজন মুসলমানের জীবনে বিয়ের যে সুযোগ রয়েছে; এটি কেবল জাগতিক প্রশান্তি লাভের জন্য নয় বরং আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা ও আদেশ মান্য করাই এর লক্ষ্য আর ভবিষ্যতের জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করে একটি পূণ্যবান প্রজন্মের গোড়াপত্তন করাও এর উদ্দেশ্য।"

হুযূর আনোয়ার (আই.) এ প্রসঙ্গে আরো বলেন–

"অতএব এ কথা প্রত্যেক আহমদী দম্পতির মনে রাখতে হবে যে, যদি কোন লক্ষ্য থেকে থাকে তাহলে তা হবে আমরা আল্লাহ্ তা'লার একটি আদেশ পালনকল্পে এ কাজটি (অর্থাৎ বিয়ে) করছি। নব দম্পতি বা ছেলে ও মেয়ে নিজেদের জীবনে যে পদক্ষেপই গ্রহণ করুক তারা সব সময় এ চিন্তা মাথায়

রেখেই পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। মানুষ আল্লাহ্ তা'লার আদেশ পালনকারী হয়ে থাকলে তার চিন্তাচেতনার প্রতিটি ধারা এমনসব পথ ও পন্থা অন্বেষণ করে যার নিমিত্ত হয় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। এর ফলে পারস্পরিক সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয়। একে অন্যের আবেগ-অনুভূতির বিষয়ে যত্নবান হয়। এভাবে এ বন্ধন, যা জাগতিক কোন বন্ধন নয়, খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে পারস্পরিক বা দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে পর্যবসিত হয়। এছাড়া পরবর্তী প্রজন্মও পূণ্যবান আর নেক প্রজন্ম হয়ে থাকে। এটিই একজন আহমদী মুসলমানের বিয়ে করার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হওয়া উচিত।"

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৮ জুন ২০১২)

২০১২ সনের ৮ জুলাই হুযূর (আই.) কানাডার বায়তুল ইসলাম মসজিদে দুটো নিকাহ্‌র ঘোষণা দেন। এই অনুষ্ঠানে নিকাহ্‌র খুতবা প্রদানকালে হুযূর (আই.) বলেন–

"এখন আমি কয়েকটি বিয়ের ঘোষণা দিব। বর্তমান পৃথিবীতে মানবীয় মনস্তত্ত্ব নিয়ে অনেক ধরণের আলোচনা পর্যালোচনা হয়ে থাকে। কিন্তু যে গভীরতায় গিয়ে মহানবী (সা.) মানব মনস্তত্ত্বকে অনুধাবন করেছিলেন তার ধারেকাছেও এ যুগের বড় বড় মনস্তত্ত্ববিদরা ভিড়তে পারে না। এই মানসিকতা দৃষ্টিপটে রেখে নিকাহ্‌র ঘোষণাকালে যে ক'টি কুরআন শরীফের আয়াত তিনি নির্বাচন করেছেন সেগুলোতে **খোদাভীরুতা বা তাকওয়ার** বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং আত্মীয়তার বিষয়ে বিশেষ করে **রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়তার** বিষয়ে অনেক বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আবার একথাও বলা হয়েছে যে, লক্ষ্য করে দেখ! তোমরা ভবিষ্যতের জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছ? অতএব, এ বিষয়গুলো যদি নব-প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়তার মাঝে বিশেষ করে উভয় পক্ষের নিকটাত্মীয়দের মাঝে তথা পিতামাতা, ভাইবোন সবার মাঝে জাগরুক হয়ে যায় তাহলে সেসব বিষয় কখনোই মাথাচাড়া দিতে পারে না যেগুলো সাধারণত আত্মীয়তার বন্ধনে ফাটল সৃষ্টি করে, যেগুলো সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণ হয়, যেগুলো উভয় পরিবারের জন্য কষ্টের কারণ হয়, যা কোন কোন সময় মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত গড়ায়, আবার কখনো তা আমার কাছেও নিষ্পত্তির জন্য উত্থাপিত হয় যা ভীষণ পীড়াদায়ক হয়ে থাকে।

অতএব আত্মীয়তা করার সময় উভয় পক্ষকে, পাত্র ও পাত্রীকে এ দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে যে, এসব আত্মীয়তা যেন নিছক জাগতিক স্বার্থ ও প্রয়োজন

মেটানোর জন্য না হয়। কেবল নিজেদের জৈবিক চাহিদা ও প্রবৃত্তির কামনা মেটানোর লক্ষ্যেই যেন এ বন্ধন রচিত না হয়। কেবল পাত্রীর সম্পত্তি ও সৌন্দর্যের বাসনায় যেন সম্পর্ক-বন্ধন স্থাপিত না হয়। আবার পাত্রী পক্ষও যেন কেবল পাত্রের আয়-উপার্জন ও টাকাপয়সা দেখে সম্পর্ক না করে। মহানবী (সা.) বলেছেন, জগতের মানুষ আত্মীয়তার জন্য বিভিন্ন মানদণ্ড নির্ধারণ করে রেখেছে। কিন্তু তোমরা (হে আমার অনুসারীরা!) ধর্মের ক্ষেত্রে তোমাদের অবস্থা ও অবস্থান কেমন তা দেখ! ধর্মীয় অবস্থাকে প্রাধান্য দেয়া হলে পাত্র-পাত্রী উভয়ই ধর্মীয় মূল্যবোধের ক্ষেত্রে নিজ নিজ মান উন্নত করার চেষ্টা করবে। পাত্রকে যদি বলা হয় যে, তুমি রূপসৌন্দর্য কিংবা সহায় সম্পদের পরিবর্তে পাত্রির ধার্মিকতা কেমন তা দেখ, তখন এক দিকে যেমন পাত্রীদের মনে খোদাপ্রদত্ত অন্যান্য অনুগ্রহের পাশাপাশি ধর্মীয় আঙ্গিকে উন্নতি সাধন করার স্পৃহা জাগবে সেখানে পাত্রদেরও নিজেদের ধর্মীয় মান উন্নত করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হবে। কেননা, ধর্মীয় উন্নতি সাধন কখনো এক পক্ষের কাজ হতে পারে না। পাত্র নিজে নানা ধরণের অপকর্ম, বখাটে কার্যকলাপ আর জাগতিকতায় নিমজ্জিত থাকবে আর এ বাসনা রাখবে যে, তার হবু স্ত্রীর ধর্মীয় মান অনেক উন্নত হবে– তাতো অসম্ভব! স্পষ্টতই যেখানে সে নিজের ভবিষ্যৎ স্ত্রীকে ধার্মিক দেখতে চাইবে সেক্ষেত্রে নিজেও এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করবে। এ কারণেই নিকাহ্ উপলক্ষে প্রদত্ত খুতবায় তাকওয়ার বিষয়ে অনেক বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অতএব, আত্মীয়তার বন্ধন রচনাকারীরা যদি সর্বদা একথাটি দৃষ্টিপটে রাখেন যে, আমাদেরকে তাকওয়া বা খোদাভীরুতায় প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে, পরস্পরের প্রাপ্য প্রদান করতে হবে, ছোটখাটো ভুলত্রুটি উপেক্ষা করতে হবে, একে অপরের রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে, মেয়েকে স্বামী-পক্ষের তথা শ্বশুরবাড়ির প্রতি খেয়াল রাখতে হবে আর স্বামীকে নিজের শ্বশুরবাড়ির প্রতি দায়িত্বশীল হতে হবে, এমনটি হলে সেসব সমস্যা কখনো সৃষ্টি হবে না যা দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখা দিচ্ছে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, সব সময় পারস্পরিক আস্থা থাকা চাই। আস্থা এবং বিশ্বাস কেবল তখনই জন্ম নেয় যখন সততার ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে উঠে। 'কওলে সাদীদ' তথা সহজ-সরল-সৎ কথা বলার অর্থ হলো– এমন সত্য ও সততা যাতে কোন ধরণের বক্রতা থাকে না, যেন একেবারে পরিস্কার,

খাঁটি আর স্বচ্ছ হয়। বিয়ের পর জানা যায় পাত্র বা পাত্রীর ইন্টারনেটে তথা ই-মেইলে এমন কিছু যোগাযোগ বিদ্যমান যার ফলে পরবর্তীতে অনাস্থা সৃষ্টি হয়– এমন যেন না হয়। অতএব প্রথম যেদিন আত্মীয়তার সম্পর্ক রচিত হয় সেদিনই সততার ভিত্তিতে সম্পর্ক রচনা করার নিমিত্তে নিজেদের সব কথা পরিস্কারভাবে বলে দেয়া উচিত আর এরপর সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত, যাতে পরবর্তীতে কোন ধরণের অনাস্থা বা অবিশ্বাস দেখা না দেয়।

আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, এই বস্তুজগতকেই সবকিছু মনে করবে না বরং দেখ, ইহজগতে হাতেগোনা কয়েক বছরের জীবন অতিবাহিত করার পর, যৌবন অতিক্রান্ত করার পর বার্ধক্যে এমনিতেই জগতের মোহ হ্রাস পায়। যৌবনকালের কয়েকটি বছরই সর্বাধিক জাগতিক কামনা বাসনা চরিতার্থ করা যায়। কিন্তু বার্ধক্য ও যৌবনকাল মিলিয়ে সাধারনত মানুষ ৭০/৮০ বছর আয়ুষ্কালই পায়। কিন্তু পরকালের জীবন তথা পারলৌকিক জীবনই হচ্ছে স্থায়ী জীবন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন সেই জীবন সম্পর্কে সচেতন হও।

অতএব, আমাদের মাঝে যদি এসব মানসিকতা ও গুণ সৃষ্টি হয়ে যায়, আমাদের আত্মীয়তার গণ্ডিতে যদি এগুলো সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে কখনো অনাস্থা ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হতে পারে না, কখনো সম্পর্কচ্ছেদ ঘটতে পারে না আর কখনো দ্বন্দ্ব-বিবাদও সৃষ্টি হতে পারে না। বরং আমরা তখন একে অপরের আবেগের বিষয়ে যত্নবান হব, একে অন্যের অনুভূতির বিষয়ে সাবধান থাকব। আর আহমদীয়া জামা'তের অভ্যন্তরে এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি তদারকী করা দরকার। এমন এক যুগ ছিল, যখন আমরা বলতাম ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থায়, পশ্চিমা সমাজ ব্যবস্থায় অনেক বেশি সংখ্যায় সংসার ভাঙ্গে। আর সংসার ভাঙ্গার মূল কারণ হলো, একে অপরের প্রতি অনাস্থা বা অবিশ্বাস। এক দীর্ঘ সময় কাটানোর পর বর-কনে তথা স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে অনাস্থার জন্ম নেয়, যার ফলে সংসার ভেঙ্গে যায়।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১২)

টেকসই এবং স্থায়ী সম্পর্ক-বন্ধনের মূল ভিত্তিঃ সহজ-সরল-সত্য কথন

রহমান খোদার প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য এবং পারিবারিক সমস্যাদি প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে গিয়ে একস্থলে হুযূর (আই.) বলেন–

"এরপর দশম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, রহমান খোদার বান্দারা কখনো মিথ্যা কথা বলেন না আবার মিথ্যা সাক্ষ্যও প্রদান করেন না। মিথ্যা বলার বদ-অভ্যাসও জাতিসমূহের অধঃপতন ও ধ্বংসের একটি বড় কারণ হয়ে থাকে। আর আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় বান্দা এবং ঐশী জামা'তসমূহের জন্য সর্বদা উন্নতির পানে ধাবিত হওয়া অবধারিত। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদের জন্য উন্নত এবং উচ্চ পর্যায়ের বিভিন্ন আত্মিকমার্গ অতিক্রম করা অবধারিত। তারা ক্রমাগতভাবে উন্নতি করতে থাকবে। এদের মাঝে যদি মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটে সেক্ষত্রে এরা আর আল্লাহ্র সেই প্রিয় বান্দা থাকে না যাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ বর্ষিত হয়, আর যাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহসূলভ আচরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অতএব আহমদীদের দায়িত্ব হলো, তারা যেন সাক্ষ্য প্রদানের বেলায় এবং নিজেদের মামলা উপস্থাপন-কালে **শতভাগ সত্য অবলম্বন করে**। উদাহরণস্বরূপ, পারিবারিক বিষয়াদিতে বা নিকাহর ঘোষণাকালে এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করে আত্মীয়তার বন্ধন স্থাপন করেন যে, আমরা সহজ-সরল-সত্য কথা বলব, সততা অবলম্বন করব। আমরা এমন সত্য কথা বলব যার মাঝে কোন ধরণের অস্পষ্টতা বা অসঙ্গতি থাকবে না। এমন কথা বলবো যার ভেতর অন্য কোন অর্থ বের করা সম্ভব নয়। কথা স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হতে হবে। কিন্তু দেখা যায় বিয়ের পর পাত্রী পাত্রকে ভুল কথা বলে আবার পাত্রও পাত্রীকে অসত্য কথা বলে। উভয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা পরস্পর অসত্য কথা বলে বেড়ায়। এভাবে সম্পর্ক বন্ধনে ফাটল ধরতে থাকে এবং ধীরে ধীরে এক পর্যায়ে বিচ্ছেদ ঘটে যায়। কেবল ব্যক্তির হঠকারিতা প্রদর্শন আর ইচ্ছে পূরণের আকাঙ্খা সংসার ভাঙ্গার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইতোমধ্যে এদের সংসারে যদি সন্তানসন্ততি জন্ম নিয়ে থাকে তাহলে এর ফলে তারাও ধ্বংস হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে ইতোপূর্বেও আমি কয়েকবার বুঝিয়ে বলেছি। তাই আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করার নিমিত্তে আর তাঁর বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের লক্ষ্যে একজন মু'মিনের জন্য অর্থাৎ তাদের জন্য যারা নিজেদেরকে রহমান খোদার বান্দা বলে গণ্য করেন– সব ধরনের মিথ্যাকে ঘৃণা করা অত্যাবশ্যক।"

(জুমুআর খুতবা, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৬ অক্টোবর ২০০৯)

একইভাবে আরেকস্থলে হুযূর (আই.) বলেন–

"আমি আগেও বলেছি, নিকাহ্র ঘোষণাকালে কুরআন শরীফ প্রদত্ত উপদেশাবলী স্মরণ রাখুন, তাকওয়া অবলম্বন করুন, সহজ-সরল ও সত্য কথা বলুন, তাহলে কোন ধরণের সমস্যা সৃষ্টি হবে না। আপনারা অন্যায়ভাবে যা হরণ করবেন তা মিথ্যাচারের অন্তর্ভুক্ত আর মিথ্যার সাথে আপনারা শিরক করার অপরাধেও জড়িয়ে যাবেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, আমাদের কাছ থেকে (মিথ্যাচার করে) অন্যায় সিদ্ধান্ত আদায় করে নিলে মনে রাখবে, তোমরা আগুন দিয়ে উদর পূর্ণ করার ব্যবস্থা করছ। অতএব, তাকওয়া পরিত্যাগ করলে তোমরা নির্ঘাত শিরকের গহ্বরে মুখ থুবড়ে পড়বে। তাই ইস্তেগফার করতে করতে আল্লাহ্র সাহায্য যাচনা কর এবং সর্বদা খোদাভীরুতা অবলম্বন কর।"

(জুমুআর খুতবা, ১০ নভেম্বর ২০০৬, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১ ডিসেম্বর ২০০৬)

সরল সত্য কথন ও তাকওয়ার ঘাটতির কারণে শ্বশুরালয়ে বাড়াবাড়ি

পারিবারিক সমস্যাদির পর্যালোচনায় স্ত্রী বা পাত্রদের বিরুদ্ধে সংঘটিত বাড়াবাড়ির বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সরল-সত্য কথার বিষয়ে গুরত্বারোপ করে হুযূর (আই.) বলেন–

"আরেকটি সমস্যা যা আজকাল পারিবারিক সমস্যারূপে বিরাজমান আর প্রত্যহ কোন না কোনভাবে এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় তা হলো, নববধু বা কনেদের পক্ষ থেকে জানা যায়, তারা শ্বশুরবাড়ির লোকদের দ্বারা বা স্বামীর পক্ষ থেকে অত্যাচার ও নিপীড়নের সম্মুখীন। কখনো কখনো পাত্রীকে তার হবু স্বামীর বিষয়ে বিস্তারিত জানতেও দেয়া হয় না। অথবা রাখ-ঢাক্ করে এমনভাবে কথা বলা হয় যার ফলে কনে বা কনে-পক্ষ বিষয়টিকে তুচ্ছ বা সামান্য একটি বিষয় বলে মনে করে। কিন্তু গভীরে খতিয়ে দেখলে ভয়ানক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে রীতিমত গা শিউরে ওঠে। এমন পরিস্থিতিতে কখনো কখনো দেখা গেছে, স্বামী ভদ্রতা ও সহানুভূতির সাথে নিজের স্ত্রীকে সসম্মানে তার পরিবারে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে চায়, কিন্তু শাশুড়ি বা ননদেরা এত বাড়াবাড়ি করে বা নিজের পুত্র বা ভাইকে দিয়ে এমন বাড়াবাড়ি করায় যার

কারণে অসহায় নববধুর জন্য কেবল দু'টি পথই খোলা থাকে। হয় সে বাধ্য হয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, না হয় সারাটা জীবন এই দুর্বিষহ যাঁতাকলে পিষ্ট হবে। আবার একথাও জানা গেছে, কখনো কখনো এ ধরণের নির্যাতনের শিকার নববধুরা যখন বাড়ির বউ হিসেবে এক পর্যায়ে সংসারের কর্তৃত্ব লাভ করে তখন সে (প্রতিশোধস্বরূপ) শাশুড়ির বিরুদ্ধে নির্যাতন করা আরম্ভ করে দেয় আর নানা রকম অত্যাচার করে। এভাবে যেসব পরিবার তাকওয়া বা খোদাভীরুতা বিসর্জন দেয় সেসব পরিবারে একটি **অশুভ শয়তানী চক্র আবর্তিত হতে থাকে**। অথচ নিকাহ্‌র ঘোষণাকালে উভয় পক্ষের সম্মতি যখন গ্রহণ করা হয় তখন তাকওয়া অবলম্বন করার ও সরল সত্য কথা বলার শিক্ষাসম্বলিত আয়াতগুলো পড়ে আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করে বলা হয় যে, তোমরা এমন স্বর্গীয় পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি কর যাতে অন্যরাও তোমাদের আকর্ষণে ছুটে আসে। আমাদের জামা'তে এ ধরণের নেতিবাচক হাতেগোণা কয়েকটি ঘটনাও যদি থেকে থাকে তবুও এগুলো আমাদের জন্য ভীষণ দুঃখ ও কষ্টের কারণ হয়। এখন যে আয়াতের ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে এটিও নিকাহ্‌র অনুষ্ঠানে তেলাওয়াতকৃত আয়াতসমূহের অন্যতম।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেছেন, মানুষের উচিৎ প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করার আগে, প্রত্যেক কাজের পূর্বে সে যেন চিন্তা করে– এ কাজের পরিণতি কী হবে! সে যেন আরো জেনে রাখে, যে কাজই তোমরা কর আল্লাহ্ তা'লা তা ভালোভাবে জানেন। সীমালঙ্ঘনকারীরা মনে করে আমাদেরকে কেউ দেখছে না, পরের মেয়ের ওপর আমরা যেমন খুশি অত্যাচার করে যাব। অথচ আল্লাহ্ তা'লা এ বিষয়ে সব জানেন। আমাদের মনে যদি এই চিন্তা থাকে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দেখছেন, আল্লাহ্ তা'লা সব জানেন সে ক্ষেত্রে (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের মতে) এসব অনাচার ও পাপ পরিহার করে চলা সম্ভব।

আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করি, প্রত্যেক আহমদী পরিবার তারা স্বামী হোন বা স্ত্রী, শাশুড়ি বা বাড়ির বউ, ননদ বা ভাবিই হোন, সবাই যেন তাকওয়ার পথে অগ্রসর হয়ে একটি সুন্দর ও আকর্ষণীয় সমাজ প্রতিষ্ঠাকারী সাব্যস্ত হন, আমীন।"

(জুমুআর খুতবা, ৩০ মে ২০০৩, মসজিদ ফযল, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৮ জুলাই ২০০৩)

একই প্রসঙ্গে হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর আরেক খুতবায় বলেন–

"কখনো কখনো পারিবারিক পর্যায়ে অল্প-বিস্তর দ্বন্দ্ব-বিবাদ হয়ে যায়। শাশুড়িরা নিজেদের বিশেষ মন-মানসিকতার কারণে বাড়ির বউদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়ার কথা বলে ফেলেন। কিন্তু অবাক হতে হয় স্বামী এবং শ্বশুরদের দেখে। তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা বিবেকবুদ্ধি দান করা সত্ত্বেও তারা স্ত্রী বা মায়ের কথায় সায় দিয়ে বাড়ির বউকে বকাঝকা করতে আরম্ভ করে। এমনকি বিনা কারণে বাড়ির বউয়ের গায়ে হাতও তুলে ফেলে। আরো দুঃখজনক বিষয় হলো, এরা পুত্রদের উস্কে দিয়ে বলে, মার! মরে গেলেও ক্ষতি নেই, আমরা অন্য কাউকে তোমার বউ বানিয়ে আনব। এ ধরনের পুরুষদেরকে আল্লাহ্ বিবেক দিন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এ কথা এদের মনে রাখা উচিত, অর্থাৎ **এরা কাপুরুষ ও নপুংসক**।"

(জুমুআর খুতবা, ২ জুলাই ২০০৪, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, মিসিসাগা, কানাডা; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৬ জুলাই ২০০৪)

২৪ জুলাই ২০০৫ সনে টরন্টো, কানাডায় জুমুআর খুতবা প্রদানকালে হুযূর (আই.) পারস্পরিক হৃদ্যতা ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা প্রসঙ্গে জামা'তকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়ে বলেন–

"আমাকে বড়ই আক্ষেপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, কানাডায় বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পারস্পরিক তিক্ততা সৃষ্টির হার উদ্বেগজনক ভাবে বাড়ছে। আমার মনে হয়, পাত্রের বা পাত্রীর পিতামাতা এক্ষেত্রে বেশি দায়ী। এদের মাঝে ধৈর্য বা সহনশীলতার লেশমাত্র নেই। একদিকে ছেলের পিতামাতা কোন কোন সময় এ অপচেষ্টায় লেগে থাকে যে, পুত্র ও পুত্রবধূর মাঝে যেন Understanding বা মনের মিল না হয়। তারা চেষ্টা করে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যাতে আস্থা সৃষ্টিই না হয়, যেন তাদের পুত্রধন কোনমতেই হাতছাড়া না হয়। অপরদিকে কিছু সংখ্যক মা আছেন যারা নিজেদের মেয়েকে নষ্ট করে ফেলেন। এরা নিজ মেয়েদেরকে দিয়ে তাদের স্বামীদের কাছে অন্যায় আবদার করিয়ে থাকেন। এ ধরনের মানুষের কিছুটা হলেও আল্লাহকে ভয় করা উচিত।"

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৮ জুলাই ২০০৫)

হুযূর (আই.)-এর একটি উপদেশবাণী

"স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মাঝে পরস্পরের প্রতি অর্পিত দায়িত্বাবলী পালন করার বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা কতইনা সুন্দরভাবে চেতনাবোধ জাগ্রত করেছেন! তিনি বলেন–

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

অর্থাৎ তারা (অর্থাৎ স্ত্রীরা) হলো তোমাদের পোশাক এবং তোমরা (অর্থাৎ স্বামীরা) হলে তাদের পোশাক (সূরা বাকারা 2: 188)। অর্থাৎ পরস্পরের সম্পর্কের দিকগুলো গোপন রাখা উভয়েরই দায়িত্ব। পোশাকের যে উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বর্ণনা করেছেন তা হলো, প্রথমত পোশাক নগ্নতাকে ঢেকে রাখে, দ্বিতীয়ত পোশাক শোভা ও সৌন্দর্য বর্ধনের কারণ হয়। তৃতীয়ত শীত ও তাপ থেকে মানুষকে রক্ষা করে। সূতরাং একজন পুরুষ ও একজন নারী একবার যখন একটি চুক্তির ভিত্তিতে এক হয়ে যাবার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, তখন একে অপরকে সহ্য করার ও পরস্পরের দোষত্রুটি গোপন রাখার যথাসাধ্য চেষ্টাও করা উচিত।"

(জুমুআর খুতবা, ৩ এপ্রিল ২০০৯, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৪ এপ্রিল ২০০৯)

ইসলাম এক পরিপূর্ণ জীবন-বিধান

একজন আহমদী মুসলিম মহিলার ওপর অর্পিত গুরুত্বপূর্ণ দায়-দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন–

"হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের জীবনে যেসব পরিবর্তন দেখতে চান সেগুলোকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে অসংখ্য আদেশ দিয়েছেন। কিছু স্থানে, এভাবে সম্বোধন করেছেন যে, হে মুমিনগণ! এ কাজ কর। আবার কিছু স্থানে নারী পুরুষ দু'জনকেই পৃথক পৃথকভাবে সম্বোধন করে বিধিনিষেধ জারী করেছেন। **মুমিনগণ! এ কাজ কর– বলে যেখানেই সম্বোধন করেছেন, সেখানে নারী পুরুষ দু'জন-ই সম্বোধিত**। তিনি (আ.) এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কুরআন করীমে যেসব বিধিনিষেধ আছে তা তোমাদের সব নারী পুরুষের জন্য প্রযোজ্য। এগুলোকে বাস্তবায়নের চেষ্টা কর। আর তোমরা যদি এসব পুণ্যকর্ম কর, তবে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে চিরস্থায়ী প্রাণপ্রদ পুরস্কাররাজিতে ভূষিত করবেন, যা তোমাদেরকে ইহকাল ও পরকালে ঐশী পুরস্কারে সমৃদ্ধ করবে।"

হুযূর (আই.) বলেন–

"পবিত্র কুরআন এক পূর্ণাঙ্গীন শিক্ষা। এটি শিখুন এবং এর ওপর আমল করুন। কোন ধরণের হীনমন্যতায় ভুগবেন না। বরং যেভাবে আমি বলেছি, এই শিক্ষায় প্রতিষ্ঠিত থেকে জগদ্বাসীকে এ দিকে আহ্বান করুন এবং এমন উন্নত ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন যাতে করে জামা'তের বাইরের মহিলারাও আপনার উত্তম আদর্শ দেখে আপনাদের কাছ থেকে পথনির্দেশনা নেয়। বিশ্বের নারীরা যেন আপনাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে যে, যদিও আমরা জাগতিক কিছু জ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রগামী এবং বাহ্যত স্বাধীন এক পরিবেশে জীবনযাপন করছি তথাপি আমরা হৃদয়ের প্রশান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারি নি। আমাদের মধ্যে এক অস্থিরতা ও অশান্তি বিরাজমান এবং পরিবারে বিভক্তি বিদ্যমান, কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মতভেদের দেয়াল ক্রমশ উঁচু হতে থাকে, যার কারণে সন্তানরাও প্রভাবিত হয় আর শান্তি ও ঐকতান বজায় রেখে জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতে পারে না, অথচ তোমাদের পরিবারের চিত্র আমাদের পরিবার থেকে ভিন্নতর দেখায়।

আমরা তোমাদের পরিবারকে শান্তিপূর্ণ দেখতে পাই, তোমাদেরকে আমরা আদর্শ মনে করি। আমাদেরকে বলে দাও! এই শান্তি আমরা কীভাবে লাভ করতে পারি? আপনার কাছে এসে অন্যদের এ প্রশ্নই করা উচিত। তখন আপনারা তাদেরকে বলুন, আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন– আপনারা তা ভুলে যাচ্ছেন। নারী ও পুরুষের কেউই এটি মেনে চলছে না। আর তা হলো, তাঁর ইবাদত করা এবং পূণ্য ও সৎকর্ম সম্পাদন করা। আর এটি তোমরা কেবল প্রকৃত ইসলামেই খুঁজে পাবে।"

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৯ জুলাই ২০০৬)

হুযূর (আই.) আরো বলেন–

"হাদীসে আছে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য স্বামী যদি স্ত্রীর মুখে একটি লোকমা তুলে দেয় তাহলে সে এরও প্রতিদান পাবে। এর দ্বারা কেবল মুখে লোকমা তুলে দেয়াকেই বুঝায় না বরং এর অর্থ স্ত্রী-সন্তানের লালন-পালন এবং তাদের প্রয়োজন মিটানোও বটে। একজন পুরুষের আবশ্যিক কর্তব্য হলো, নিজ পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন করা। কিন্তু এই আবশ্যিক দায়িত্বও যদি সে এ মানসে পালন করে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার ওপর এই দায়িত্ব অর্পন করেছেন, তাই খোদার সন্তুষ্টির জন্য আমি আমার স্ত্রীকে তার প্রাপ্য প্রদান করব, কেননা সে নিজের পরিবার-পরিজন ছেড়ে আমার বাড়িতে এসেছে এবং নিজ সন্তানদের প্রাপ্য অধিকার আমি প্রদান করব তাহলে সেই দায়িত্ব পালনই পুণ্যে পর্যবসিত হয়। এটিও ইবাদত। প্রতিটি আহমদীর মাঝে যদি এই ধ্যানধারণা গড়ে উঠে তাহলে বর্তমান সময়ের যেসব পারিবারিক ঝগড়াবিবাদ, অশোভন আচরণ এবং ছোট ছোট বিষয়ে যে অসন্তুষ্টি জন্ম নিচ্ছে তা থেকে মানুষ রক্ষা পাবে। স্ত্রী যদি এ চেতনা রাখে যে আমার ওপর স্বামীর সেবা করার ও তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে, আর আমি এটি খোদা তা'লার উদ্দেশ্যে করছি, তাহলে এর প্রতিদান রয়েছে; এমন ক্ষেত্রে মহানবী (সা.) উভয় পক্ষকে শুভসংবাদ দিয়ে বলেছেন, তোমরা যদি এমন কর তাহলে তোমাদের এই কর্ম আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির কল্যাণে ইবাদত বলে পরিগণিত হবে। এর প্রতিদান পাবে। অতএব মানুষকে এসব বিষয় ভাবা উচিত আর এসব ছোট ছোট বিষয়ই অনেক পরিবারকে জান্নাত-প্রতিম করে তোলে।"

(জুমুআর খুতবা, ১৩ মার্চ ২০০৯, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩ এপ্রিল ২০০৯)

স্বামী ও স্ত্রী পস্পরের পোশাকস্বরূপ

"স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের পোশাকস্বরূপ" আল্লাহ্ তা'লার এ বাণী সম্পর্কে হুযূর (আই.) তাঁর এক জুমুআর খুতবায় বলেন–

"গত খুতবায় আমি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়েও সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছিলাম। সেখানে বলেছিলাম, পারস্পরিক মতবিরোধ এতটা কুৎসিত রূপ ধারন করে কোন কোন ক্ষেত্রে দুই পক্ষ একে অন্যের বিরুদ্ধে কাদা ছোড়াছুড়ি করা থেকেও বিরত থাকে না; আল্লাহ্ তা'লার নিকট এটি অত্যন্ত অপছন্দনীয় একটি বিষয়। আল্লাহ্ তা'লা কত সুন্দরভাবে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়কেই একে অন্যের ওপর অর্পিত দায়িত্বাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

অর্থাৎ **তারা (অর্থাৎ স্ত্রীরা) হলো তোমাদের পোশাক এবং তোমরা (অর্থাৎ স্বামীরা) হলে তাদের পোশাক** (সূরা আল বাকারা 2: 188)। অর্থাৎ পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করা দুজনেরই দায়িত্ব। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা পোশাকের যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন তা হলো পোশাক নগ্নতা ঢেকে রাখে। দ্বিতীয়ত পোশাক শোভা বৃদ্ধির কারণ হয়, সৌন্দর্যের কারণ হয়। তৃতীয়ত শীত ও তাপের প্রকোপ থেকে মানুষকে রক্ষা করে। অতএব এভাবে যখন একজন নারী ও পুরুষ একটি চুক্তির অধীনে পরস্পর বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তখন পরস্পরকে সহ্যও করতে হবে এবং দোষত্রুটি গোপন রাখার যথাসাধ্য চেষ্টাও করতে হবে। ছোট খাটো বিষয়ে নরনারী কারোরই উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়। বরং আহমদী দম্পতির মাঝে এমন সুসম্পর্ক থাকা উচিত যা এক দম্পতির সৌন্দর্যকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে। প্রতিটি আহমদী দম্পতির মাঝে এই সৌন্দর্য পরিলক্ষিত হওয়া উচিত যা অন্যদের জন্য একটি অনুকরণীয় আদর্শ হবে।"

হুযূর (আই.) আরো বলেন–

"যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও বলেছেন, মানুষ যখন উত্তেজনা এবং রাগ ও ক্রোধে সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন সে উলঙ্গ হয়ে যায় বা তার সব দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যায় তাই একে (অর্থাৎ রাগ) দমন করা উচিত। **ক্রোধ**

সংবরণ এমন একটি কাজ যা আল্লাহ্ তা'লার নিকট পছন্দনীয় এবং (তিনি) রাগ না করার আদেশ দিয়েছেন। অতএব প্রত্যেক আহমদী যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের আদলে এই অঙ্গীকার করেছে যে, আমি আমার মাঝে এক পবিত্র পরিবর্তন সাধন করব, আমার পারিবারিক সম্পর্ক সুমধুর করার চেষ্টা করব; তাকে এই অঙ্গীকার রক্ষা করার চেষ্টা করা উচিত।

আমি যখন এ ধরণের ঝগড়াবিবাদের কথা জানতে পারি এবং ছোটখাটো মনোমালিন্যের কারণে সংসারগুলো ভাঙ্গার কথা শুনি তখন সব সময়ই একটি মেয়ের কথা আমার মনে পড়ে যায়, যে এক দম্পতিকে উচিত শিক্ষা দিয়েছিল। এক দম্পতি তার সামনে ঝগড়া আরম্ভ করে বা বাক-বিতণ্ডা শুরু করে অথবা রাগের বশে গলাফাটিয়ে চেঁচামেচি আরম্ভ করে। তখন সেই মেয়েটি অবাক বিস্ময়ে অপলক নেত্রে তাদের প্রতি তাকিয়ে রইল। যাহোক, তারা সম্বিৎ ফিরে পেল আর মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, তোমার মা-বাবা কি কখনো ঝগড়া করে নি? তারা কি রাগ করে না? সে বললো, হ্যাঁ! তাদেরও রাগ হয় তবে আম্মা যখন রাগ করেন তখন আব্বা নিরবতা অবলম্বন করেন আর আমার আব্বা যখন রাগান্বিত হন তখন আম্মা চুপ হয়ে যান। অতএব এই সহ্যগুণ সৃষ্টি করতে হবে। অনেক সময়ে এসব ছোটখাটো কারণে সূচনাতেই সংসারে ভাঙ্গনের সুর বেজে উঠে। বিয়ের মাত্র কয়েকদিন অতিবাহিত হতে না হতেই এ সিদ্ধান্ত হয়ে যায় যে, আমাদের মনের মিল হওয়া সম্ভব না অথচ বিয়ের বেশ কয়েক বছর পূর্ব থেকেই তারা একে অন্যকে জানে এবং বিয়েও হয়। আসল কথা হলো পরস্পরের গোপনীয়তা রক্ষা না করে, ঘরের কথা যখন পরকে জানানো হয় তখন বাইরের লোকেরা, পরামর্শদাতারা, যাদের মজা নেয়ার অভ্যাস থাকে, তারা অভ্যাসজনিতভাবে কুপরামর্শ দিয়ে থাকে যার ফলে সংসারে ভাঙ্গনের সুর বেজে উঠে। **অতএব পরামর্শও এক ধরণের আমানত।** যখন এমন লোক, এমন দম্পতি, পুরুষ হোক বা নারী, ছেলে হোক বা মেয়ে যার কাছেই আসবে তখন একজন আহমদীর আবশ্যিক দায়িত্ব হলো, তাদেরকে এমন পরামর্শ দেয়া যাতে তাদের সংসার ভাঙ্গার পরিবর্তে (সম্পর্ক আরো) দৃঢ় হয়।

(জুমুআর খুতবা, ৩ এপ্রিল ২০০৯, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৪ এপ্রিল ২০০৯)

ক্রোধ সংবরণ করা

পারিবারিক সমস্যা যাতে মাথাচাড়া দিতে না পারে সেজন্য উভয়পক্ষেরই উচিত নিজেদের রাগ দমন করা এবং ক্রোধ সংবরণ করা। এ পরিপ্রেক্ষিতে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–

"অতএব স্বামী-স্ত্রী উভয়কে আমি পুনরায় বলছি, **গোপনীয়তাও তখনই রক্ষা হয় যখন রাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে** আর খোদাভীতি থাকলেই এটি সম্ভব। এজন্যে এক স্থানে আল্লাহ্ তা'লা তাকওয়ার পোশাকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ۔ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ۔ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

অর্থাৎ হে আদমসন্তান! নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের জন্য এমন পোশাক অবতীর্ণ করেছি যা তোমাদের দুর্বলতা ঢেকে রাখে এবং যা সৌন্দর্যেরও কারণ। আর থাকল তাকওয়ার পোশাক! এটি সর্বোত্তম (পোশাক)। এগুলো হলো আল্লাহ্ তা'লার কতক আয়াত যেন তারা (এ থেকে) উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা আল আরাফ 7 : 27)

এখানে পুনরায় সেই বিষয়ের উল্লেখ হয়েছে যা আমি পূর্বেও বলে এসেছি আর তা হলো, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে পোশাক দান করেছেন তোমাদের নগ্নতা ঢাকার জন্য এবং তোমাদের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য। এ তো হলো বাহ্যিক উপকরণ যা প্রধানত আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছেন অন্যান্য সৃষ্টি থেকে মানুষকে স্বতন্ত্র করার জন্য, অর্থাৎ একটি পোষাক দিয়েছেন যার মাধ্যমে তার সৌন্দর্যও প্রকাশ পায় আর নগ্নতাও ঢাকা পড়ে; কিন্তু একই সাথে তিনি বলেছেন, প্রকৃত পোশাক হলো তাকওয়ার পোশাক।

এখানে আমি আরেকটি বিষয়ও স্পষ্ট করে দিতে চাই আর তা হলো, একজন মু'মিন এবং যে মু'মিন নয় এমন ব্যক্তিদের পোশাকের সৌন্দর্যের মান ভিন্ন হয়ে থাকে। যেকোন ভদ্র লোকের পোশাকের সৌন্দর্যের মান ভিন্ন হয়ে থাকে। আজকাল পাশ্চাত্যে বরং প্রাচ্যেও ফ্যাশনেবল ও বস্তুবাদী লোকদের কাছে যদি

পোশাকে নগ্নতা প্রকাশ পায় এবং দেহসৌষ্ঠবের প্রদর্শন হয় তবে সেটিকেই পোশাকের সৌন্দর্য মনে করা হয় বরং পশ্চিমা বিশ্বে সর্বস্তরেই এমনটি মনে করা হয়। বলা হয়, পুরুষের ক্ষেত্রে সারা শরীর আবৃতকারী পোশাকই হলো সৌন্দর্য কিন্তু একই পুরুষই কামনা করে যে, নারীর পোশাক যেন এমন হয় যার ফলে দেহ থাকবে অনাবৃত। অধিকাংশ স্থানে মহিলারাও এটিই পছন্দ করে থাকে। যে নারীর আল্লাহ্‌র ভয় নেই তার কাছে পোশাক তাকওয়া নয় আর এমন পুরুষও এটিই চায়। এক শ্রেণির পুরুষ কামনা করে নারীরা যেন আধুনিক পোশাকে সজ্জিত থাকে আর নিজেদের স্ত্রীদের জন্যও এমনটিই পছন্দ করে যেন তাদেরকে উচ্চ শ্রেণির এবং ফ্যাশনেবল মানুষ মনে করা হয়– পোষাক নগ্নতা ঢাকুক বা না ঢাকুক।

কিন্তু একজন মু'মিন এবং যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে কেবল সেই পোশাকই পরিধান করা পছন্দ করবে যা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম হয় আর তাকওয়ার পোশাকের অনুসন্ধানে থাকলেই এই পোশাক অর্জিত হবে। যখন বিশেষ সতর্কতার সাথে নিজের বাহ্যিক পোশাকের বিষয়ে সচেতন দৃষ্টি রাখা হবে এবং স্বামী-স্ত্রী যারা পরস্পরের পোশাক, তারাও তাকওয়ার সাথে পরস্পরের প্রতি যত্নবান হবে, তখন সমাজেও একে অন্যের দোষত্রুটি গোপন রাখতে পারস্পরিক সম্পর্কের গণ্ডিতে বিভেদ বা মতভেদ হলে তাকওয়াকে দৃষ্টিপটে রাখা হবে।"

(জুমুআর খুতবা, ৩ এপ্রিল ২০০৯, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৪ এপ্রিল ২০০৯)

হুযূর (আই.) উল্লেখিত বিষয়টিকে কুরআনের শিক্ষার আলোকে নিম্নে এভাবে বর্ণনা করেন–

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

অর্থাৎ "তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক। (সূরা আল বাকারা 2:188) **পুনরায় এ আদেশও দিয়েছেন যে, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের জন্য পোশাক অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী পরস্পরের গোপনীয়তা রক্ষাকারী।** এ শিক্ষাটি নারী পুরুষ উভয়ের জন্য। এই গোপনীয়তা সবসময় বজায় থাকা উচিত। ঝগড়া হওয়া মাত্রই একে অপরের অপ্রয়োজনীয় কথা ছড়াতে শুরু করবে, মানুষকে বলতে আরম্ভ করবে– এমনটি হওয়া উচিত নয়। এছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যদি

সুসম্পর্ক থাকে, সমাজ যদি জানে যে, তাদের মাঝে সুসম্পর্ক রয়েছে, তাহলে সমাজেও স্বামী-স্ত্রীর একটি মর্যাদা বজায় থাকে আর স্বামী-স্ত্রী কারো প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশের কেউ ধৃষ্টতা দেখায় না। অতএব এখানে স্বামী ও স্ত্রীর দায়িত্ব হলো নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী তা উপলব্ধি করা। স্বামীর উচিত স্ত্রীর বিশ্বাসকে পদদলিত না করা একইভাবে স্ত্রীরও উচিত স্বামীর আস্থায় ভাটা পড়তে না দেয়া। আল্লাহ্ বলেন, এতে করে অর্থাৎ সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে তোমরা যে কেবল নিজেদের পারিবারিক জীবনকেই স্বস্তিদায়ক করবে তা নয়, বরং পরবর্তী প্রজন্মকেও সুরক্ষিত করবে বা তাদের সুরক্ষার উপকরণ সৃষ্টি করবে। অতএব এভাবে আল্লাহ্ তা'লা স্বামী ও স্ত্রীর বহুবিধ অধিকার এবং আবশ্যিক দায়িত্ব নির্ধারণ করেছেন আর উভয়ের ওপরই এগুলো পালনের দায়িত্বভার ন্যস্ত করেছেন। নারীরাও পুরুষের মতই সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তারা দুজনই যদি সঠিক থাকে তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মও সঠিকভাবে উন্নতি করবে আর তাদের যথাযথ তরবিয়্যত বা সুশিক্ষা লাভ হবে। এ জন্য আল্লাহ্ তা'লা নিজ নিজ দায়িত্বাবলী পালনের প্রতি তাদের উভয়েরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।"

(জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২১ অগাষ্ট ২০০৪;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১ মে ২০১৫)

এক জুমুআর খুতবায় হুযূর (আই.) মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শের আলোকে বলেন–

"মহানবী (সা.) যেখানে নিজে আমানত ও সততার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সেখানে তিনি তাঁর উম্মতকেও নসীহত করেছেন যে, এর দৃষ্টান্ত স্থাপন কর এবং এ ক্ষেত্রে ছোট ছোট বিষয়েও যত্নশীল হও। উদাহরণস্বরূপ 'স্বামী-স্ত্রী'-এর সম্পর্কই নিন। তিনি (সা.) নসীহত করেছেন যে, এ সব সম্পর্ক আমানত হয়ে থাকে, এ সম্পর্কগুলো বজায় রাখতে যত্নবান হও।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'লার নিকট সবচেয়ে বড় খেয়ানত (বা বিশ্বাসঘাতকতা) বলে যে বিষয়টি গণ্য হবে তাহলো, নিজ স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পর স্ত্রীর গোপন বিষয়াদি লোকদের মাঝে বলে বেড়ানো।

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব ফি নাকলিল হাদীস)

বর্তমান সমাজে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে কথাবার্তা হয় তা মানুষ তাদের পিতামাতাকে বলে দেয় আর এর ফলে অনেক সময়ে অশান্তি দেখা দেয়। ঝগড়াবিবাদ সৃষ্টি হয়। অনেক সময় পিতামাতারই এমন স্বভাব থাকে যে, তারা তাদের সন্তানের কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কথা বের করে আর এরপর তা ঝগড়াবিবাদের কারণ হয়ে যায়। এজন্য মহানবী (সা.) বলেছেন, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে ধরণের কথাই হোক না কেন, তারা তা অন্যদের বলার অধিকার রাখে না আর অন্যদেরও তা জিজ্ঞেস করা বা শোনা উচিত নয়।

সবাই যদি এই নির্দেশ মেনে চলে তাহলে আমার মনে হয় অনেক ঝগড়াবিবাদ এমনিতেই শেষ হয়ে যাবে।"

(জুমুআর খুতবা, ১৫ জুলাই ২০০৫, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৫ অগাষ্ট ২০০৫)

হুযূর (আই.) অপর এক স্থানে বলেন–

"এসব পারিবারিক ঝগড়াবিবাদে, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াঝাটির ক্ষেত্রে বিষয় যদি বিচ্ছেদের দ্বারপ্রান্তেও পৌঁছে যায় তাহলেও এখন থেকে দোয়া করে, এই পবিত্র পরিবেশ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হয়ে দোয়ার ওপর জোর দিয়ে এই ভগ্ন হৃদয়গুলোকে জোড়া লাগানোর চেষ্টা করুন। এছাড়া আরো কিছু কারণেও সমাজে তিক্ততা সৃষ্টি হয়। মিথ্যা অহমিকার কারণে সমাজে যে ঘৃণা-বিদ্বেষ লালিত হচ্ছে বা সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলো দূর করুন। একে অন্যের ভুলভ্রান্তি, অন্যায় এবং দোষত্রুটি গোপন রাখুন। একজন আরেকজনকে খাঁটো করার জন্য তাদের দোষত্রুটি প্রচার করার পরিবর্তে তা গোপন রাখুন। প্রত্যেকেরই তার নিজের দোষত্রুটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকা উচিত। আল্লাহ্কে ভয় করা উচিত।"

(জুমুআর খুতবা, ২৪ জুন ২০০৫, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, টরন্টো, কানাডা;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৮ জুন ২০০৫)

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর একটি নির্দেশ

"আল্লাহ্ তা'লা দোয়া শিখিয়েছেন,

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا

অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক! তুমি আমাদের জীবনসঙ্গী ও সন্তানসন্ততির পক্ষ থেকে আমাদের নয়ন স্নিগ্ধ কর এবং আমাদের (প্রত্যেককে) মুত্তাকীদের ইমাম বানিয়ে দাও। (সূরা আল ফুরকান 25: 75)

অতএব এই দোয়া পুরুষের জন্য যেভাবে গুরুত্বপূর্ণ তেমনই নারীদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ একে অপরের জন্য চোখ জুড়ানোর কারণ হোন। একে অপরের জন্য চোখ জুড়ানোর কারণ হবার জন্য দোয়া করলে একে অপরের সাথে ভালো ব্যবহার করার প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে।

(জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৫ জুন ২০১১;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৩ এপ্রিল ২০১২)

সমাজে নারী পুরুষের ভূমিকা

হল্যান্ড-এর জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান কালে তাশাহুদ, তাআউয এবং সূরা ফাতেহা পাঠের পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন–

"আজ আমি সংক্ষিপ্ত পরিসরে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি মহিলাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। কেননা সমাজে, বিশেষ করে ইসলামি সমাজে নারী পুরুষের স্ব স্ব ভূমিকা রয়েছে। এ জন্যে ইসলাম নারীর প্রাপ্য অধিকার প্রদান ও তার দায়িত্ব পালনের প্রতি সেভাবেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যেভাবে পুরুষের প্রাপ্য অধিকার প্রদান ও দায়-দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নারীদের কোলেই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম লালিত হয়। একটি জাতির উন্নতি ও অবনতিতে নারীরাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

যেভাবে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) নারীদের প্রাপ্য অধিকার এবং তাদের দায়-দায়িত্ব পালনের বিষয়টি পরিস্কারভাবে বর্ণনা করেছেন এবং কুরআনের শিক্ষার আলোকে যেভাবে তাকওয়ার পথ অনুসরণ করে নিজেদের পরিবারে সন্তানসন্ততিকে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা অনুসারে তরবিয়্যত দেয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, নারীরা যদি নিজেদের সেই দায়িত্ব উপলব্ধি করে তবে আহমদীদের মাঝেও ক্রমাগতভাবে সুন্দর সমাজ গড়ে উঠবে। এর প্রভাব কেবল জামা'তের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং এর প্রভাব ঘরের গন্ডি পেরিয়ে বাইরেও প্রকাশিত হবে। আর এর প্রভাব জামা'তের গন্ডি পেরিয়ে সমাজেও পড়বে। অলিতে গলিতে, শহরে বন্দরে ও দেশে দেশে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে। সেই বিপ্লব, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের মাঝে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন তা বাস্তবায়ন করতে, ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার যে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে পাঠিয়েছেন সেই শিক্ষাকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে, বিশ্বের বুকে ইসলামের পতাকা উত্তোলন করতে এবং সমগ্র বিশ্বকে যতদ্রুত সম্ভব মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে একতাবদ্ধ করতে আমরা তখনই সফল হব যখন আহমদী নারীরা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হবেন, নিজেদের মর্যাদা উপলব্ধি করবেন এবং নিজেদের আবশ্যিক দায়িত্বাবলী বুঝে সে অনুযায়ী নিজেদের ভূমিকা পালনের চেষ্টা করবেন।"

(হল্যান্ড-এ সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৩ জুন ২০০৪;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২২ জুলাই ২০০৫)

অনুরূপভাবে জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদেরকে সম্বোধন করে হুযূর (আই.) বলেন–

"যেভাবে আমি গতকালের খুতবায় বলেছিলাম, আল্লাহ তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্তির যেসব ধাপ বা সোপান রয়েছে, তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে, খোদা ভীতি এবং তাঁর দরবারে সমর্পনের চেতনা হৃদয়ে গ্রথিত করে এগুলোর প্রতিটির অনুসরণ আবশ্যক, প্রতিটি আদেশ পালন করা আবশ্যক তবেই সফলকাম হবে এবং জান্নাতের উত্তরাধিকারীও হবে। সেই আদেশগুলোর (গতকাল আমি গুণে গুণে বলেছিলাম) প্রথমটি হলো, নিজের নামাযগুলো খোদাভীতির সাথে এবং অনুনয় বিনয়ের সাথে আদায় কর। আল্লাহ্ তা'লার সমীপে উপস্থিত হলে– এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর কাছে যাচনা কর যে তিনি আমার সামনে আছেন। নিজের জন্য, নিজের স্বামীর জন্য এবং নিজের সন্তানদের জন্যও প্রার্থনা করুন যে, হে আমার আল্লাহ্! তুমিই আমাদেরকে পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে থাক। তুমি আমাদেরকে সামর্থ দাও যাতে আমরা তোমার ইবাদত করতে পারি।

হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এবং আমাদের সন্তানসন্ততি ও স্বামীকে এসব পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত কর। নামায সম্বন্ধে উপদেশ হলো, আল্লাহ্র সমীপে উপস্থিত হতে হলে বিনয়ের সাথে উপস্থিত হতে হবে। এই বিনয় তখনই সৃষ্টি হবে যখন এই অনুভূতি জন্ম নিবে যে, আমি আল্লাহ্র দরবারে আছি। আল্লাহ্ তা'লার সামনে উপস্থিত আছি। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, (নামাযে) এই অনুভূতি যদি না থাকে যে, আমি খোদাকে দেখছি তাহলে ন্যূনতম এই বিশ্বাস থাকা উচিত যে, আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন। বিভিন্ন ধরণের বৃথাকর্ম ও অনর্থক বিষয়াদি এড়িয়ে চললেই বিনয় সৃষ্টি হবে এবং ইবাদতেও মন বসবে। এর জন্য চেষ্টা করুন এবং নামাযে দোয়া করুন, হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে এবং আমাদের সন্তানসন্ততি ও স্বামীকে এগুলো থেকে রক্ষা কর, **এসব বৃথাকর্ম হতে বাঁচাও।**"

এসব বৃথাকর্মের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হুযূর (আই.) আরো বলেন–

"বিশেষ করে মহিলাদের মাঝে একত্রে বসে খোশগল্প করা, বাজে কথাবার্তা বলার অভ্যাস বেশি থাকে; এ অভ্যাস পুরুষদেরও আছে। সর্বাবস্থায় এ থেকে বিরত থাকা উচিত। যেমন অমুকের কাপড় এমন, অমুকের বাড়িঘর এমন, অমুকের ছেলেমেয়ের মাঝে মন্দ এসব অভ্যাস আছে, অমুক দম্পতির সম্পর্ক

এমন। এসবই বৃথা কথাবার্তা ও অনর্থক বিষয়। আসলেই যদি (বদ অভ্যাস) থাকে তাহলে আপনাদের কাজ হলো দোয়া করা। আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে বলুন, তারাও আমাদের ভাই, তারাও আমাদের বোন, আল্লাহ্ তাদের মঙ্গল করুন, তাদের মাঝে যদি এই এই মন্দ বিষয় থাকে তাহলে তা দূরীভূত হোক। আর তাদের মাঝে যদি এমন কিছু না থাকে আর আপনারা কেবল উপভোগ করার জন্য এসব কথা বলে থাকেন তবে এটি পাপ। ইসলাম নারীকে যে মর্যাদা দিয়েছে অথবা যে মর্যাদায় তাকে দেখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে তার দাবি হলো প্রত্যেক নারী, বিশেষ করে প্রত্যেক আহমদী নারীর এসব বৃথাকর্ম ও পাপ হতে বিরত থাকা।"

(জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২১ আগষ্ট ২০০৪; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১ মে ২০১৫)

জীবনসঙ্গী ও সন্তানসন্ততির জন্য দোয়া

সফল পারিবারিক জীবনযাপনের জন্য যে দোয়ার গুরুত্ব কত বেশি, সে সম্পর্কে হুযূর আনোয়ার (আই.) একটি জলসা সালানায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দানকালে বলেন–

"প্রত্যেক নারী ও পুরুষের দোয়া এবং চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে নিজের মাঝে পরিবর্তন এনে প্রকৃত বয়আতকারীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত, যেন তারা সেসব মানুষের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যারা কেবল নিজেরা পুণ্যময় জীবন লাভের জন্য চিন্তিত থাকে না, বরং নিজেদের বংশধরদের কল্যাণের জন্যও তাদের দুশ্চিন্তা থাকে, যার জন্য আল্লাহ্ তা'লা এই দোয়া শিখিয়েছেন যে–

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের জীবনসঙ্গী ও সন্তানসন্ততির পক্ষ থেকে আমাদেরকে চোখ জুড়ানোর (উপকরণ) দান কর, আর আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম বানিয়ে দাও।' (সূরা আল ফুরকান 25: 75)

এই দোয়া পুরুষদের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনিভাবে নারীদের জন্যও আবশ্যক অর্থাৎ তারা যেন পরস্পরের জন্য চোখ জুড়ানোর কারণ হয়। একে

অপরের চোখ জুড়ানোর কারণ হওয়ার জন্য দোয়া করলে পরস্পরের সাথে সুন্দর ব্যবহার করার দিকেও দৃষ্টি থাকবে; একে অপরের দোষগুলো উপেক্ষা করবে ও পরস্পরের সুন্দর গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টি থাকবে। আমার কাছে মাঝে মাঝে নব-দম্পতিরা এসে বলে, 'আমাদের নসীহত করুন' আর যেমনটি আমি বলেছি যে আজকাল খোলা ও তালাক এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যা খুবই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আমি তাদেরকে এটাই বলি যে একে অপরের দোষগুলো উপেক্ষা কর আর পরস্পরের গুণগুলোর প্রতি দৃষ্টি দাও। এখন যেহেতু বিয়ে হয়ে গিয়েছে তাই এই বন্ধন ও সম্পর্ক রক্ষা করে চল! আর দোয়া কর– আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে একে অপরের নয়নের স্নিগ্ধতার কারণ করুন। যখন দোয়া ও চেষ্টার সাথে এমনটি করতে থাকবে, তখন ইনশাআল্লাহ্ বিয়েও সফল হবে।

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের চোখ জুড়ানোর কারণ হলে ভবিষ্যত প্রজন্মও মা-বাবার পুণ্যময় দৃষ্টান্ত দেখে নিজেরা পিতামাতার জন্য চোখ জুড়ানোর কারণ হওয়ার চেষ্টা করবে। যখন স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের জন্য এবং নিজেদের সন্তানদের জন্য খোদা তা'লার কাছে নয়নমনি হওয়ার দোয়া করতে থাকবে এবং বংশধরদের মাঝে মুত্তাকী সৃষ্টি হওয়ার দোয়া অব্যাহত রাখবে, অর্থাৎ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا পড়বে যা পুণ্যবান বংশধরের জন্য দোয়া বৈ-কী (তবেই এটি সম্ভব)। একটি পরিবারের কর্তা ব্যক্তি সেই পরিবারের ইমাম বা নেতা হয়ে থাকেন, যে আকুতি করে, 'আমাকে মুত্তাকীদের ইমাম বানিয়ে দাও', তার একথার অর্থ হলো, 'আমার বংশে কেবল পুণ্যবান লোকই সৃষ্টি করো'। পুরুষ এই দোয়া করার সময় নিজ স্ত্রী ও সন্তানদের মুত্তাকী হওয়ার জন্যও দোয়া করতে থাকবে; যখন স্ত্রী এই দোয়া করবে তখন গৃহকর্ত্রী বা ঘরের তত্ত্বাবধায়িকা হিসেবে নিজের সন্তানদের মুত্তাকী হওয়ার জন্যও দোয়া করবে। যদি এই আগ্রহের সাথে দোয়া করা হয় তাহলে নিজেকে তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টাও থাকবে আর তখন এমন ঘর জান্নাত-প্রতিম ঘরে পরিণত হবে, যেখানে ছোট-বড় সবাই খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টায় রত থাকবে। এমন বাবা-মা পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার পর সন্তানরা তাদের জন্য পুণ্যের কারণ হতে থাকবে; সন্তানদের উত্তম শিক্ষাদীক্ষার কারণে বাবা-মা পুণ্য পেতে থাকবেন। বাবা তো পুণ্যের ভাগী হবেনই; কিন্তু মা-ও বিশেষভাবে পুণ্য পেতে থাকবেন। কেননা, গৃহের তত্ত্বাবধায়িকা হওয়ার

দৃষ্টিকোণ থেকে মায়ের ওপর বিশাল এক দায়িত্ব থাকে। সন্তানদের পুণ্য তাদের (বাবা-মার) পদমর্যাদা উন্নীত হওয়ার কারণ হিসেবে কাজ করবে। এমন কোন মু'মিন আছে কি, যে ঈমানের দাবী করার পরও বলবে যে 'মৃত্যুর পর আমার পদমর্যাদা উন্নীত হওয়ার কোন দরকার নেই'? অতএব এই দোয়াটি এমন একটি দোয়া, যা সন্তানদেরও সংশোধনের কাজে আসে আর নিজেদের সংশোধনের ক্ষেত্রেও কাজে আসে আর মৃত্যুর পর পুণ্যবান সন্তানদের দোয়া ও কর্মের ফলে পদমর্যাদা উন্নীত হওয়ার বেলায়ও কাজে আসে; আবার এতে মু'মিনের মর্যাদার প্রতিও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মু'মিন ছোটোখাটো বিষয়েই তুষ্ট হয়ে যায় না, বরং ক্রমশ উন্নত থেকে উন্নততর গন্তব্যের পানে পদচারণা করতে থাকে, তার পদচারণা সম্মুখ পানে হয়। **তাকওয়ার ক্ষেত্রে মুত্তাকী নিজেও অগ্রগামী হয় আর নিজ সন্তানদেরকেও তাকওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগামী করতে সচেষ্ট থাকে।**

অতএব সৌভাগ্যবান সেসব পিতামাতা, যারা সন্তানদের সুশিক্ষার চিন্তায় থাকেন, তাদেরকে ধর্মের নিকটতর করেন, তাদের মাঝে খোদা তা'লার ভালোবাসা সৃষ্টি করেন আর নিজেদের অবস্থায় এক পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করে নিজেদের ইহকাল ও পরকালকেও সুসজ্জিত ও সুনিশ্চিৎ করেন। অতএব প্রত্যেক আহমদী নারী ও পুরুষের এই দোয়াটি গভীর মনোযোগ সহকারে ও বুঝে শুনে পড়া দরকার। সন্তানদের ব্যাপারে অনেকেরই অভিযোগ থাকে যে, সন্তান বিগড়ে গিয়েছে। যদি সুশিক্ষা প্রদান করা হয় এবং দোয়ার প্রতি মনোযোগ থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেন, বিরল কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সন্তানদেরকে বিগড়ে যাওয়া থেকে তিনি রক্ষা করেন।

(জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৫ জুন ২০১১;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৩ এপ্রিল ২০১২)

একই বিষয়ে হুযূর (আই.) তার আরেকটি খুতবায় বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা যে এই দোয়া–

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

(সূরা আল ফুরকান 25: 75)

শিখিয়েছেন– অর্থাৎ সন্তানদের 'কুররাতুল আইন' (অর্থাৎ চোখ জুড়ানোর কারণ) হওয়ার জন্য সর্বদা দোয়া করতে থাকা উচিত। অতএব মানুষ যখন সবসময় এই দোয়া করতে থাকবে 'হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের প্রতি কৃপা-দৃষ্টি দাও, আর সবসময়ই আমাদের ওপর দয়ার দৃষ্টি রেখো, কখনো শয়তানকে আমাদের ওপর বিজয়ী হতে দিও না, আমাদের ভুলভ্রান্তিসমূহ মার্জনা করে দিও আর আমরা তোমার কাছে তোমার ক্ষমারও প্রত্যাশী, আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর এবং পাপ ক্ষমা করার পর আমাদের ওপর এমন কৃপাদৃষ্টি দাও যেন আমরা আর কখনো শয়তানের খপ্পরে না পড়ি; আর যখন তুমি আমাদের প্রতি এত কৃপা করছ, তখন আমাদেরকে তোমার কৃপারাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তৌফীক দাও, সেগুলোকে স্মরণ করার তৌফীক দাও। সবচেয়ে বড় যে দানে তুমি আমাদের ধন্য করেছ তা হলো, ঈমান। আমাদেরকে সর্বদা এর ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখ, আমরা যেন কখনো এথেকে দূরে সরে না যাই, আর এই দোয়া পড়তে থাকি–

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا
وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

অর্থাৎ 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে হেদায়াত দানের পর আমাদের হৃদয়গুলোকে বক্র হতে দিও না, আর আমাদেরকে তোমার সন্নিধান হতে কৃপা দান কর, নিশ্চয় তুমি পরম দানশীল'। (আলে ইমরান 3: 9)

দোয়ার প্রতি যদি মনোযোগ না থাকে তাহলে শয়তান বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন পথে এসে প্ররোচিত করতে থাকবে; আর যেমনটি আমি আগেও অনেকবার বলেছি, আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও দয়া ছাড়া শয়তান থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথেই কথা বলেন, যে নিজে পূর্ব থেকেই তাঁর কাছে দোয়া করে আর যার প্রতি তাঁর কৃপা থাকে। হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা সৃষ্টি হলে এই দয়া আরো বহুগুণ বেড়ে যায়।"

(জুমুআর খুতবা, ১২ ডিসেম্বর ২০০৩, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন;
আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৪)

সন্তানদের তালীম ও তরবিয়্যত বা শিক্ষাদীক্ষার বিষয়ে বিশেষভাবে উপদেশ দিতে গিয়ে যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি উপস্থাপন করেন–

"হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'আমার নিজের অবস্থা হলো, আমার এমন কোন নামায নেই যাতে আমি নিজ বন্ধুবান্ধব, সন্তানসন্ততি ও স্ত্রীর জন্য দোয়া না করি। অনেক এমন পিতামাতা রয়েছে যারা নিজেদের সন্তানদের বদঅভ্যাসে অভ্যস্ত করে। প্রথমদিকে যখন তারা মন্দ কাজ শেখা আরম্ভ করে তখন তাদেরকে সতর্ক করে না। ফলাফল এই দাঁড়ায় যে তারা ক্রমশ দুঃসাহসী ও ধৃষ্ট হয়ে উঠে।... মনে রেখো, তার ঈমান সঠিক হতে পারে না যে সবচেয়ে কাছের সম্পর্ক কী তা বোঝে না; যখন সে এক্ষেত্রেই পিছিয়ে আছে সেখানে তার কাছে অন্যান্য পুণ্যের আর কীই-বা আশা করা যায়? আল্লাহ্ তা'লা সন্তানের জন্য শুভকামনা পোষণের বিষয়টি কুরআন শরীফে এভাবে বর্ণনা করেছেন–

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا

অর্থাৎ খোদা তা'লা, তুমি আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের পক্ষ হতে নয়নের স্নিগ্ধতা দান কর। (সূরা আল ফুরকান 25: 75) আর এটি তখনই লাভ হওয়া সম্ভব যখন তারা পাপ বা দুষ্কৃতিপূর্ণ জীবনযাপন থেকে বিরত থাকবে, বরং রহমান খোদার বান্দা-সুলভ জীবন অতিবাহিত করবে এবং সবকিছুর ওপর খোদা তা'লাকে প্রাধান্য দিবে। এরপর আরো স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন– وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا সন্তান যদি পুণ্যবান ও মুত্তাকী হয় তবে সে তাদের ইমাম-ই হবে। এটা যেন মুত্তাকী হওয়ার দোয়াও বটে।"

(মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬২-৫৬৩, নব সংস্করণ)
(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৬ জুলাই ২০০৩;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৯ আগস্ট ২০০৩)

সন্তানদের ওপর পিতামাতার পারস্পরিক ভালোবাসা ও প্রীতি-হীনতার ক্ষতিকর প্রভাব

শান্তিপূর্ণ পারিবারিক জীবনযাপনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–

"আমার একটি জরিপের ফলাফলস্বরূপ এ বিষয়টি সামনে এসেছে যে, যেসব বাড়িতে বাবা-মার মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা ও প্রীতির সম্পর্ক নেই,

তাদের সন্তানরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাইরে গিয়ে শান্তি খোঁজে। তাই আমি বাবা-মাদেরকেও বলব, নিজেদের ব্যক্তিগত অহমিকা ও তুচ্ছ কামনা-বাসনার বশবর্তী হয়ে ঘরের শান্তি নষ্ট করে নিজেদের সন্তানদের ধ্বংস করবেন না। প্রকৃত অর্থে মুত্তাকীদের ইমাম হওয়ার ও নিজেদের দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করুন; অধিকন্তু নিজেদের প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করুন যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত নেয়ার সময় আপনারা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর সামর্থ্য দান করুন। আমীন।"

(জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ১৫ আগস্ট ২০০৯;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২ মে ২০১৪)

'আসসালামু আলাইকুম' বলার কল্যাণসমূহ

'আসসালামু আলাইকুম' বলার অভ্যাস এবং এর উপকারিতা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) তার একটি জুমুআর খুতবায় একথাও বলেন–

"এটি একটি সার্বজনীন নির্দেশও বটে যে, যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ কর, তা সে নিজের ঘরই হোক না কেন, সালাম বাক্য উপহার দাও। কারণ এর দ্বারা বাড়িতে কল্যাণ বিস্তার লাভ করবে। এই সালামের উপহার যেহেতু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, যে কারণে তোমাদের মাঝে এই চেতনাবোধ জাগ্রত থাকবে যে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত উপহারের পর বাড়ির সদস্যদের সাথে আমার আচরণ কেমন হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

অর্থাৎ 'অতএব যখন তোমরা বাড়িতে প্রবেশ কর তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে স্বজনদেরকে এক কল্যাণময় ও পবিত্র সালাম উপহার দাও। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা বিবেকবুদ্ধি খাটাও।' (সূরা নূর 24: 62)

এভাবে বাড়ির সদস্যরা যখন একে অপরকে সালাম উপহার দেবে, একথা

মনে রেখে দেবে যে, এটি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে উপহার, তখন পারস্পরিক ভালোবাসাও বৃদ্ধি পাবে এবং একে অপরের আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার বিষয়েও অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ হবে। বাড়ির কর্তা যদি কঠোর প্রকৃতির হয়ে থাকে, তবে তার হাত থেকে, তার রূঢ় আচরণ থেকে তার স্ত্রী ও সন্তানরা সালামের কারণে নিরাপদ থাকবে। এই সমাজে (পশ্চিমা সমাজে) ক্ষেত্র বিশেষে এবং পৃথিবীজুড়ে মোটের ওপর পিতাদের অন্যায় কঠোরতা ও রূঢ় স্বভাবের কারণে কখনো কখনো সন্তান বিদ্রোহী হয়ে ওঠে; স্ত্রীরা ভয়ে চুপসে থাকে, আর এরপর একটা সময় এমন আসে যখন অনেক বছর একসাথে থাকার পরও স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদের পরিস্থিতি দেখা দেয়, বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে; সন্তানরা বড় হয়ে যায়, তাদের নিয়ে পরিবারের আলাদা দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। কিন্তু যদি এভাবে সালাম উপহার দিতে থাকে, তাহলে এই বিষয়গুলো কম হবে। অনুরূপভাবে, নারীরা যখন ঘরে সালাম বা শান্তির বাণী নিয়ে প্রবেশ করবে, তখন নিজেদের ঘরের তত্ত্বাবধান সঠিকভাবে করবে এবং নিজেদের পরিবারের সম্মানের সুরক্ষাকারী হবে। সন্তানদের তরবিয়্যত যখন এভাবে করা হবে, তখন যৌবনে পৌঁছেও নিজ পরিবার, বাবা-মা বা সমাজের জন্য অশান্তির কারণ হওয়ার পরিবর্তে শান্তির কারণে পরিণত হবে।"

(জুমুআর খুতবা, ২৫ মে ২০০৭, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৫ জুন ২০০৭)

সুন্দর ব্যবহারে উন্নত মান

পিতামাতার সাথে উত্তম ব্যবহার

আত্মীয়তা ও অন্যান্য সম্পর্কের গণ্ডিতে নিজেদের দায়িত্বাবলী সম্পর্কে জামা'তের সদস্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করে হুযূর আনোয়ার (আই.) একটি জুমুআর খুতবায় বিস্তারিত উপদেশমালা প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর অধিকারের প্রেক্ষাপটে বলেন–

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى
وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ
وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ۝

(সূরা আন নিসা 4: 37)

এখনই আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি তাতে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে, তোমরা আমার ইবাদত কর আর যেভাবে ইবাদত করা উচিত, সেভাবে কর। ছোট প্রতিমা বা বড় প্রতিমা বা মনের মাঝে লালিত প্রতিমারা কোনভাবেই যেন তোমাদেরকে আমার ইবাদত থেকে বিরত করতে না পারে। এরপর বাবা-মার সাথে সুন্দর ব্যবহার করার নির্দেশ রয়েছে যে তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার কর আর সেই সুন্দর ব্যবহারের ধরনও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণিত হয়েছে।"

এরপর হুযূর (আই.) বলেন–

"মৌলিক এ দু'টি বিষয় তোমাদের মাঝে সৃষ্টি হওয়ার পর উন্নতির জন্য অন্যান্য ধাপও অতিক্রম করতে হবে। ধর্মের সঠিক শিক্ষা পালন করতে হলে তোমাদেরকে চারিত্রিক মানদণ্ডে আরো উন্নত স্তরে উপনীত হতে হবে; যদি তাতে উপনীত হও তাহলে তোমরা প্রকৃত অর্থে মুসলমান আখ্যা পাওয়ার যোগ্য হবে। যদি এই মান অর্জিত হয় এবং তোমরা উন্নত চরিত্রের অধিকারী হয়ে যাও তাহলে ঠিক আছে, তোমরা লক্ষ্য অর্জন করেছ এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হয়ে গিয়েছ এবং হতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। আর

যদি এই উন্নত মান অর্জন না কর এবং অহংকার প্রদর্শন করতে থাক আর সবসময় এই চিন্তায় রত থাক যে, 'যেভাবেই হোক আমি নিজেকে জাহির করবই', তাহলে স্মরণ রেখো, এই বিষয়গুলো আল্লাহ্ তা'লার কাছে মারাত্মকভাবে অপছন্দীয়। এমন হলে তোমরা মানুষের প্রাপ্য অধিকার দিতে সক্ষম হবে না বরং নিজেদের ইবাদতসমূহের বিনষ্টকারী হবে। **উত্তম আচরণের সুউচ্চ মান প্রতিষ্ঠিত না করলে** এর সাথে সাথে তোমাদের ইবাদতগুলোও বিনষ্ট করবে আর সেই মান কী; যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মাঝে দেখতে চান? আল্লাহ্ বলেন, সেই মান হলো, তোমরা নিকটাত্মীয়দের সাথে সুন্দর ব্যবহার কর; সেসব নিকটাত্মীয়ের সাথে যারা তোমাদের পিতামাতার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকটাত্মীয়, তোমাদের রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়।

আবার যারা বিবাহিত, তাদের স্ত্রীর পক্ষের বা স্ত্রীর বেলায় তার স্বামীর পক্ষের আত্মীয়স্বজন, এরা সবাই নিকটাত্মীয়ের আওতাভুক্ত আর এই আত্মীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহার করার ব্যাপারে স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে সমানভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বা একই রকম নির্দেশ দেয়া হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী যখন একে অপরের রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়দের সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে, একে অপরের আপনজনদের সাথে সদাচরণ করবে, তাদের প্রতি দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই স্বামী-স্ত্রীর নিজেদের মধ্যকার ভালোবাসা ও প্রীতির বন্ধনও আপনা আপনিই দৃঢ় হবে এবং একে অপরের প্রতি দায়িত্ব পালনের পূর্ণ চেষ্টা করবে। তাই আল্লাহ্ বলেন, নিকটাত্মীয় অর্থাৎ রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়তা যদি রক্ষা করে চল তবে তোমরা আমার প্রিয়ভাজন হবে।"

(জুমুআর খুতবা, ২৩ জানুয়ারি ২০০৪; খুতবাতে মাসরূর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৪-৬৫, নাযারাত ইশাআত, রাবওয়া, সংস্করণ ২০০৫)

স্বামী ও স্ত্রীর নিকটাত্মীয় ও কাছের মানুষদের সম্মান করা প্রসঙ্গে হুযূর আনোয়ার (আই.) একবার বলেন–

"কিছু কিছু ঝগড়া বাড়িতে এজন্য হয় যে পরস্পরের আত্মীয়দের শ্রদ্ধা ও সম্মান বজায় থাকে না। স্বামী ও স্ত্রীর সবচেয়ে নিকটাত্মীয় হলো তাদের বাবা-মা। একদিকে নিজের বাবা-মার সাথে যেমন দয়ার্দ্র আচরণ করার নির্দেশ রয়েছে, অপরদিকে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের পিতামাতার সাথেও সদাচরণ

করার নির্দেশ রয়েছে। কখনো কখনো স্বামী অন্যায়ভাবে স্ত্রীর বাবা-মা ও স্বজনদেরকে অসঙ্গত কথা বলে বসে, আবার কখনো স্ত্রী অন্যায়ভাবে স্বামীর বাবা-মা ও নিকটাত্মীয়দেরকে অসঙ্গত কথা বলতে থাকে। আহমদী সমাজ, যাদের জন্য আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর এই নির্দেশ রয়েছে যে 'শান্তির বিস্তার ঘটাও', তাদের মাঝে এমন বিষয় থাকা অনুচিত। আমরা যারা যুগের ইমামকে মান্য করেছি, আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে উন্নত চরিত্রিক গুণাবলী ধরে রাখার উপায়ও শিখিয়ে দিয়েছেন, আর এ-ও বলে দিয়েছেন যে 'আমার সাথে সম্পর্ক রাখতে হলে সেই উন্নত চরিত্রের ধারক ও বাহক হও যার নির্দেশ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) দিয়েছেন'– এই সবকিছুর পর আমাদের মাঝে এমন বিষয় থাকা অনুচিত।

আমাদের চিন্তা করা উচিত, এই যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার পর আমাদেরকে এ কারণে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অর্থাৎ তারা বলে, 'তোমরা কেন সেই ব্যক্তিকে মেনেছ যে কিনা প্রতিশ্রুত ঈসা নবীউল্লাহ্ বলে দাবি করে? আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর কতককে নিজেদের আত্মীয়দের কাছ থেকেও অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে, স্বজনরা সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, পিতারা নিজদের সন্তানদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করে তাদেরকে ঘর থেকে বহিষ্কার করেছে আর এজন্য বের করে দিয়েছে যে, 'তুমি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছ'। সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে একজন আহমদীর আত্মীয়তার সম্পর্কের বিষয়ে কতটা যত্নশীল হওয়া দরকার! প্রত্যেকের ভাবা উচিত, যে ব্যক্তির নাম খোদা তা'লা রেখেছেন 'শান্তির যুবরাজ', তার প্রতি আরোপিত হওয়ার পর আমাদের কতটা শান্তি বিস্তারকারী ও আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় করার বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া দরকার! সুতরাং প্রত্যেক আহমদীর নিজের মাঝে এই চেতনাবোধ জাগ্রত করা প্রয়োজন, আমরা যেন শান্তির বরপুত্রের ওপর কালিমা লেপনকারী না হই। আমরা যদি আত্মীয়তার সম্পর্কের বিষয়ে যত্নবান না হই, আত্মীয়দের প্রতি দয়ার্দ্র আচরণ না করি, তাদের জন্য দোয়া না করি, তাদের দোয়া লাভ করতে না পারি, তাহলে যাদের সাথে আমাদের কোন রক্তসম্পর্ক নেই তাদের প্রতি কীভাবে দয়ার্দ্র আচরণ করতে পারব, তাদের সাথে কীভাবে অনুগ্রহের সম্পর্ক সুদৃঢ় করবো? তাদের প্রতি কীভাবে যত্নবান হবো?"

(জুমুআর খুতবা, ১ জুন ২০০৭; ২২ জুন ২০০৭, আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল)

রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজনে অধিকার

রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজনের অধিকারের বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন–

রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়তা–এটি অনেক গভীর তাৎপর্যপূর্ণ একটি শব্দ। এতে স্ত্রীর আত্মীয়স্বজনেরও সেই একই অধিকার প্রাপ্য যা স্বামীর আত্মীয়স্বজনরা পায়। তাদের (অর্থাৎ স্ত্রীর দিকের আত্মীয়স্বজনের) সাথেও ততটাই আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায়ে রাখা আবশ্যক যতটা নিজের (তথা স্বামীর) আত্মীয়স্বজনের সাথে আবশ্যক। একবার যদি এই অভ্যাস সৃষ্টি হয় এবং উভয় পক্ষ থেকেই আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার এমন আদর্শ যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে কি কোন পরিবারে কখনো তুইতোকারি হতে পারে? কোন ঝগড়াবিবাদ হতে পারে? আদৌ নয়। কেননা অধিকাংশ ঝগড়াবিবাদের সূচনাই এর দ্বারা হয় যে, সামান্য কোন কথা হলো অথবা পিতামাতার পক্ষ থেকে কোনরূপ বিবাদ সৃষ্টি হলো কিংবা কারো মা অথবা বাবা কোন কথা বলে দিল, তা যদি ঠাট্টার ছলেও বলে আর কারো আঁতে ঘা লাগে তাহলে তাৎক্ষণিক অসন্তুষ্ট হয়ে বলে বসে, আমি তোমার মায়ের সাথে কথা বলব না, আমি তোমার বাবার সাথে কথা বলব না, আমি তোমার ভাইয়ের সাথে কথা বলব না। এরপর আপত্তি অন্বেষণ করা হয় যে, ও এমন, সে তেমন। এমন ছোট ছোট কথায় সৃষ্ট মনোমালিন্যই পরবর্তীতে বড় ঝগড়াবিবাদের ভিত রচনা করে।"

(জুমুআর খুতবা, ২ জুলাই ২০০৪ ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, মিসিসাগা, কানাডা;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৬ জুলাই ২০০৪)

রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয় এবং তাদের গুরুত্ব

রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন–

"এরপর রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়তার বিষয়টি রয়েছে। আত্মীয়দের পরস্পরের মাঝে প্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক আরো দৃঢ় করা আবশ্যক, এ ক্ষেত্রে উন্নতি করুন। 'সিলাহ রেহমী' অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা বলতে কী বুঝায়? মহিলাদের উচিত নিজেদের আত্মীয়দের বিষয়ে যত্নবান হওয়া এবং স্বামীর আত্মীয়দের খেয়াল রাখা। শাশুড়িরা বউমাদের প্রতি যত্নবান হোন এবং

তাদের আত্মীয়দের প্রতি খেয়াল রাখুন। প্রেমময় ও ভালোবাসাপূর্ণ একটি পরিবেশ গড়ে তুলুন যাতে করে জামা'তের উন্নতির ধারা পূর্বের চেয়ে আরো বেগবান হয়। একতা, ঐক্য এবং ভালোবাসায় আল্লাহ্ তা'লার যে কৃপা বর্ষিত হয় তা অনৈক্য এবং ঝগড়াবিবাদে হয় না। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লার কৃপা লাভের চেষ্টা করুন।"

(লাজনা ইমাইল্লাহ যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমায় ভাষণ, ২ নভেম্বর ২০০৮)

এই প্রসঙ্গে অপর এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন–

"হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, 'রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয় বলতে কেবল নিজের রক্তের সম্পর্কের আত্মীয় বুঝায় না বরং বিয়ের পর স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়গণ উভয়েরই আত্মীয় হয়ে যায়। অর্থাৎ স্বামীর ভাইবোন, পিতামাতা, স্ত্রীর পিতামাতা ও ভাইবোন হয়ে যায় ঠিক তেমনিভাবে স্ত্রীর ভাইবোন ও পিতামাতা স্বামীর ভাইবোন ও পিতামাতা হয়ে যান। চিন্তাচেতনা যদি এমন হয় তাহলে আত্মীয়দের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হতে পারে না কখনো সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে না। সুতরাং এ দায়িত্বগুলো উভয়ে এমনভাবে পালন করা উচিত যেভাবে নিজের আত্মীয়স্বজন, পিতামাতা এবং ভাইবোনের ক্ষেত্রে পালন করা হয়। এ নির্দেশ কেবল মহিলাদের ক্ষেত্রেই নয় বরং যেভাবে আমি বলেছি, পারস্পরিক প্রেমময় সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ছেলেকেও সেভাবেই ধৈর্য এবং দোয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেভাবে মেয়েকে দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে উভয় পক্ষের শ্বশুরবাড়ির দায়িত্ব হলো, ছেলে এবং মেয়েকে ভুল পথনির্দেশনা দিয়ে বা অসঙ্গত কথা বলে আত্মীয়তার বন্ধনে ফাটল সৃষ্টি করে সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট না করা। একইভাবে এই প্রথম আয়াতে এ শিক্ষাও দিয়েছেন যে, এই বিবাহ বন্ধনের ফলশ্রুতিতে তোমাদের ঘরে যে সন্তান জন্ম নিবে তাদের উত্তম শিক্ষাদিক্ষার ব্যবস্থা করা তোমাদের উভয়ের কর্তব্য। যেন ভবিষ্যতে সমাজে পুণ্য প্রসারকারী বংশধারা সূচীত হয়। তিনি (আল্লাহ্) বলেন, এটা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন করবে। আল্লাহ্ তা'লার তাকওয়া কী?

প্রত্যেক কাজ আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুযায়ী করা। নিজের সকল ব্যক্তিগত কামনাবাসনাকে পদদলিত করে কেবল এ উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখা যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, স্মরণ রাখবে, আমাকে প্রতারিত করা যায় না, কেননা তোমার প্রত্যেক কর্মের ওপর সদা

আমার দৃষ্টি রয়েছে। সুতরাং আহমদী স্বামী-স্ত্রী যদি এই নির্দেশকে সম্মুখে রাখে তাহলে তারা (শরিয়তের) সেই নির্দেশের বা শিক্ষার সন্ধানে থাকবে যা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের কারণ। বিয়ে-সংক্রান্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তা'লা পাঁচ জায়গায় তাকওয়া শব্দটি উল্লেখ করেছেন। যেব্যক্তি খোদা তা'লার তাকওয়াকে এতটা দৃষ্টিতে রাখবে তার ঘর বিশৃঙ্খলার আখড়ায় পরিণত হবে বা কখনো এতে ঝগড়াবিবাদ হবে– এটা হতেই পারে না। রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়তার সম্পর্ক যারা রক্ষা করবে, যারা একে অপরের আত্মীয়স্বজনের খেয়াল রাখবে, তাদের প্রতি যথাযথ দায়িত্বপালনকারী হবে, এসব লোকদের দোয়া গৃহীত হওয়ার সুসংবাদও এতে দেয়া হয়েছে।"

(লাজনা ইমাইল্লাহ যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৪ অক্টোবর ২০০৯)

২০১১ সালের যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদানের পূর্বে হুযূর আনোয়ার (আই.) নিকাহর ঘোষণার জন্য নির্ধারিত আয়াতগুলো পাঠ করেন। এরপর তিনি (আই.) বলেন–

"পারিবারিক যেসব সমস্যা আমাদের সম্মুখে উত্থাপিত হয় সেগুলোতে কখনো মহিলা আবার কখনো পুরুষের পক্ষ থেকে একটি বিষয় সচরাচরই উত্থাপিত হয়ে থাকে আর তা হলো, আমাদের ভাইবোন বা পিতামাতাকে কেউ একজন মন্দ বলেছে। পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের পক্ষ থেকেই ঠিক একই অভিযোগ উত্থাপন করা হয় যে, আমার পিতামাতার বদনাম করেছে, তাদেরকে এই বলেছে, ঐ বলেছে, তাদের গালমন্দ করেছে। অতএব এই বিষয়গুলো মূলত তাকওয়া পরিপন্থী। পরিশেষে এগুলো ঘরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। শুধু এটাই নয়, কখনো কখনো এমনও হয়ে থাকে যে, এটি কেবল অভিযোগই থাকে না বরং বাস্তবে এমন মানুষও আছে, যারা সন্তানদেরকে দাদা-দাদি বা নানা-নানির বিরুদ্ধে উস্কে দেয়, অর্থাৎ কোন কোন অভিযোগ সত্যও প্রমাণিত হয়। একে অপরের নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে অশোভন শব্দ ব্যবহার করে থাকে। সন্তানদের তাদের থেকে বিমুখ করার চেষ্টা করা হয়।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তাকওয়ার সাথে এর দূরতম কোন সম্পর্ক নেই, এটি তাকওয়া নয়। তোমরা তাকওয়া থেকে দূরে সরে যাচ্ছ। সুতরাং নিজ রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়দের প্রতিও যত্নবান হও। এ আয়াতগুলোর প্রথমটিতেই এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে অর্থাৎ নিজ রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের খেয়াল

রাখ। কেবল পিতামাতাই রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের প্রতি যত্নবান হবে তা নয় বরং নিজ সন্তানদেরকেও রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের মর্যাদা ও সম্মান করা শেখাবে। তবেই একটি পবিত্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। নিজেরাও রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। কেননা পিতামাতার আদর্শ থেকে সন্তানরাও প্রভাব গ্রহণ করে থাকে।

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসার ভাষণ, ২৩ জুলাই ২০১১)

আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ

আত্মীয়ের সাথে সদাচরণের গুরুত্ব' -এ বিষয়ে আহমদী মহিলাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই) বলেন–

"পরবর্তী বিষয়টি হলো, আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করা। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সামান্য কারণে আত্মীয়তার বন্ধনে ফাটল দেখা দেয়। একটি নেক কর্মের (অর্থাৎ আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহারের) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে পুণ্য লাভের কথা অথচ উক্ত পুণ্য থেকে বঞ্চিত থাকে। যদি আত্মীয়দের সাথে সদাচারণমূলক পুণ্যকর্ম অব্যহত থাকে তাহলে বিভিন্ন পরিবারে যেসব সম্পর্ক নষ্ট হয়, যেসব সম্পর্ক ছিন্ন হয়, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক যে বিবাদ হয়, ননদ-ভাবী'র যে ঝগড়া হয়, শাশুড়ী-বৌ'য়ের যে ঝগড়া হয়– একে অপরের সাথে উত্তম আচরণ করলে পরস্পরের বিরুদ্ধে কোন ধরনের ক্ষোভ প্রকাশ তো দূরের কথা এমন সব ঝগড়াবিবাদ সৃষ্টি হতেই পারে না– এটি আমার অভিজ্ঞতা। অতএব যেসকল মু'মিন নারী পুণ্যে অগ্রসর হতে চায়, তাদের উচিত, নিজ আত্মীয়স্বজনের খেয়াল রাখা।"

(লাজনা ইমাইল্লাহর জার্মানির বার্ষিক ইজতেমায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ১৭ সেপ্টম্বর ২০১১)

বিভিন্ন পর্যায়ের আত্মীয়স্বজনের প্রতি যত্নবান হবার বিষয়ে ইসলামী বিধানের ওপর বিস্তারিত আলোকপাত করতে গিয়ে এবং আত্মীয়স্বজনের খেয়াল না রাখার ফলে উদ্ভূত বিষয়াদির মাঝে পারিবারিক সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–

"আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা তোমাদের নিকট আত্মীয়দের প্রতি যত্নবান হও, তাদের সাথেও অনুগ্রহসূলভ আচরণ কর। এই সদাচরণের মাধ্যমে তোমাদের সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে। নিকটাত্মীয়দের মধ্যে রক্ত-সম্পর্কের সকল আত্মীয় অন্তর্ভুক্ত, তোমাদের পিতার দিক থেকেও এবং

তোমাদের মাতার দিক থেকেও। এরপর রয়েছে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়রা। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ওপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয় যে, একে অপরের রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়দের আধিকার প্রদান কর, তাদের সম্মান কর, তাদেরকে শ্রদ্ধা কর, তাদের কল্যাণকামী হও। বস্তুত তোমরা নিকটাত্মীয়দের যেসব অধিকার পাওয়া উচিত বলে মনে কর, বিশেষভাবে সেসব নিকটাত্মীয়ের যাদের সাথে তোমাদের সম্পর্ক ভালো। কেননা নিকটাত্মীয়দের সাথেও সম্পর্কের ক্ষেত্রে তারতম্য থেকে থাকে। অনেক সময় নিকটাত্মীয়দের সম্পর্কেও ফাঁটল দেখা দেয়। এ কারণে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, নিজের নিকটাত্মীয়দের সাথেও সদাচরণ কর। কেবল তাদের সাথে নয় যাদের সাথে তোমাদের সুসম্পর্ক আছে বা যাদেরকে তোমরা পছন্দ করে থাক বরং যাদের তোমরা পছন্দ কর না, যাদের সাথে তোমাদের মতের মিল হয় না, তাদের সাথেও উত্তম আচরণ কর। অতএব প্রত্যেক নিকটাত্মীয়ের সাথে এই সদ্ব্যবহার করতে হবে। যেভাবে আমি বলেছি, যাদের সাথে মতের মিল হয় কেবল তাদের সাথেই নয় বরং প্রত্যেকের সাথে (সদাচরণ করবে)। বরং নির্দেশ হলো, কেবল নিজ নিকটাত্মীয়দের সাথেই নয় বরং স্বামী-স্ত্রী উভয়কে উভয়ের নিকটাত্মীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এমন সদাচরণই আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তার পাশাপাশি সমাজেও শান্তি ও নিরাপত্তার কারণ হবে।"

(জুমুআর খুতবা, ১ জুন ২০০৭, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন)

এ প্রসঙ্গেই তিনি (আই.) ২০০৪ সনের ২ জুলাই আরো বলেন–

"মহানবী (সা.) নিজ স্ত্রীদের আত্মীয়স্বজন এবং তাদের বান্ধবীদের সাথে যে কতটা সদাচরণ করতেন, সে সংক্রান্ত অগণিত দৃষ্টান্তের মাঝে এখানে একটি উল্লেখ করছি। বর্ণনাকারী লেখেন, হযরত খাদিজা (রা.)-এর বোন হালা'র আওয়াজ কর্ণগোচর হতেই মহানবী (সা.) দাঁড়িয়ে তাকে স্বাগত জানাতেন এবং হাস্যবদনে বলতেন, খাদিজার বোন হালা এসেছেন। এছাড়া মহানবী (সা.)-এর এ রীতি ছিল যে, বাড়িতে কোন পশু জবাই করা হলে এর মাংস হযরত খাদিজা (রা.)-এর বান্ধবীদেরকে পাঠানোর বিষয়ে জোর দিতেন।

(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল, বাব মিন ফাযায়েলু খাদিজা)

কিন্তু এখানে বিষয়টি কিছুটা স্পষ্ট করে দেই, কিছু বিষয় সামনে আসে যেগুলোর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়ে। কেননা, সমাজে (এখন) নরনারীর

অবাধ মেলামেশা আরম্ভ হয়ে গেছে। এ থেকে কেউ যেন আবার এ অর্থ না করে যে, মহিলাদের বৈঠকেও বসার অনুমতিও আছে এবং স্ত্রীর বান্ধবীদের সাথে অবাধ মেলামেশার অনুমতি হাতে এসে গেছে। যত্নবান হওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় আর স্ত্রীর বান্ধবীদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে নেয়া পুরোপুরি ভিন্ন বিষয়। এর মাধ্যমে অনেক ধরনের পাপের পথ খুলে যায়। এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যেখানে পরবর্তীতে নিজের স্ত্রী একদিকে থেকে যায় আর স্ত্রীর বান্ধবী স্ত্রীর স্থান দখল করে নেয়। পুরুষ তো তার নিজের জগৎ গড়ে নেয়, কিন্তু সেই হতভাগিনী প্রথম স্ত্রী আহাজারী করতে থাকে আর এমন আচরণ পুরোটাই অন্যায়। ইসলাম কখনো এমন বিষয়ের অনুমতি দেয় না। তারা বলে যে, আমাদের বিয়ে করার অনুমতি রয়েছে।

এখানে, এই সমাজ ব্যবস্থায় বিশেষভাবে সাবধান থাকা উচিত। নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সতেচন হোন আর সেই স্ত্রীর প্রতিও যত্নবান হোন যিনি এক সুদীর্ঘ সময় অভাব অনটনের মাঝে আপনার সঙ্গ দিয়েছেন। আজ এখানে পৌঁছার পর অবস্থা যদি স্বচ্ছল হয়ে গিয়ে থাকে তবে তাকে তাড়িয়ে দেয়া কিছুতেই সুবিচার নয়।"

(জুমুআর খুতবা, ২ জুলাই ২০০৪, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, মিসিসাগা, কানাডা)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) জার্মানিতে ছয়টি বিয়ে পড়িয়েছিলেন। তখন বিয়ের খুতবাতে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–

"সত্যিকার মুসলমান হিসাবে প্রতিটি আহমদীকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, বিয়েশাদি এমন একটি বন্ধন (বা অঙ্গীকার), এমন একটি কাজ যা এক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মীয় দায়িত্বের মর্যাদা পরিগ্রহ করে এবং স্ত্রী ও তার রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়দের অধিকার প্রদান করা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রী এবং উভয় পক্ষের আত্মীয়স্বজনের জন্য এটি একান্ত আবশ্যক। অতএব এই বোধ ও এই উপলব্ধি যদি প্রত্যেক ব্যক্তির মাঝে, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ দম্পতির মাঝে এবং দু'পক্ষের শ্বশুরালয়েও সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে পারিবারিক জীবন প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা ও শান্তির নীড়ে পরিণত হয়।"

(খুতবা নিকাহ্, ১৮ জুন ২০১১, বায়তুস সবুহ, ফ্রাঙ্কফোর্ট, জার্মানি)

পুরুষ নারীদের তত্ত্বাবধায়ক

পুরুষদের 'কাওয়াম' তথা অভিভাবক হওয়া সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনের শিক্ষার

ব্যাখ্যায় হুযূর (আই.) বলেন–

"বর্তমানকালে ছোটখাটো বিষয়ে নারীদের ওপর হাত তোলা হয়, অথচ নারীকে যেখানে শাস্তি দেয়ার অনুমতি রয়েছে সেখানে অনেকগুলো শর্ত নির্ধারিত আছে, মনগড়া অনুমতি নয়। কিছু শর্তসাপেক্ষে এর অনুমতি আছে। যে অবস্থায় উপনীত হলে এই শাস্তি প্রযোজ্য হয় কোন আহমদী মহিলা বিরলই এতটা অধপতিত হবে, যার এ শাস্তি হতে পারে। কাজেই ছুতো না খুঁজে পুরুষের উচিত নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং মহিলাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা, যেভাবে পবিত্র কুরআনে এসেছে–

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۔ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۔ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۔ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۔ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ۔ ۝

অর্থাৎ পুরুষরা নারীদের অভিভাবক, সেই শ্রেষ্ঠত্বের কারণে যা আল্লাহ্ তাদের কতককে কতকের ওপর প্রদান করেছেন আর একারণেও যে তারা তাদের সম্পদ তাদের জন্য ব্যয় করে (যেসব অকর্মন্য ব্যক্তি ঘরে বসে থাকে তারা তো এমনিতেই অভিভাবক হয় না)। অতএব পুণ্যবতী নারী হলো (তারা, যারা) আনুগত্যশীলা এবং (স্বামীর) অগোচরেও সেসব জিনিসের সুরক্ষাকারী যেগুলোর সুরক্ষার জন্য আল্লাহ্ তাগিদ করেছেন। আর যেসব নারীর পক্ষ থেকে তোমরা বিদ্রোহসূলভ আচরণের আশঙ্কা কর তাদেরকে প্রথমে উপদেশ দাও (এতে নির্লজ্জতা অন্তর্ভুক্ত নয় বরং এমন বিষয়াদি যা প্রতিবেশীর মাঝে কোন দুর্নামের কারণ হচ্ছে সেসবের কথা বলা হচ্ছে।) অতএব প্রথমে তাদেরকে উপদেশ দাও, এরপর তাদের বিছানা পৃথক করে দাও আর এরপরও যদি প্রয়োজন পড়ে তবে তাদেরকে শারীরিক শাস্তিও দাও। এরপর বলেছেন, কিন্তু তারা যদি তোমাদের আনুগত্য করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোন অজুহাত বা ছুতো খুঁজে বেড়িও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিব উচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং মহা গৌরবান্বিত। (সূরা আন নিসা 4: 35)

অতএব বলা হয়েছে, এই চরম বিদ্রোহাত্মক আচরণ থেকে স্ত্রী যদি নিজের

সংশোধন করে নেয়, তাহলে অযথা তাকে শাস্তি দেয়ার অজুহাত খুঁজবে না। স্মরণ রেখো! তোমরা যদি তাকওয়া বর্জিত মানুষের মত এমন আচরণ কর এবং নিজেদেরকে অনেক বড় কিছু মনে কর আর তোমাদের নিকট স্ত্রীর কোন মূল্যই না থাকে তবে মনে রেখো আল্লাহ্ তা'লার সত্ত্বাও এমন পরাক্রমশালী যে, তোমাদের এমন আচরণের জন্য তোমাদেরকেও পাকড়াও করতে পারেন। অতএব শাস্তি দেয়ার জন্য যে স্তরগুলো বা শর্তগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে তা মেনে চল। যদি সংশোধনের কোন উপায় খুঁজে না পাও আর স্বভাবগতভাবেই এমন মহিলা এক ও অভিন্ন আচরণ প্রদর্শন করেই চলে, কেবল তবেই শাস্তি দেয়ার নির্দেশ রয়েছে; কথায় কথায় হাত উঠাবে বা বেত্রাঘাত করবে– এর অনুমতি নেই। আর এত বড় অত্যাচারী হয়ো না যে, ছুতো খুঁজে এক ভদ্র মহিলাকে বিদ্রোহপূর্ণ আচরণ প্রদর্শনকারীদের গণ্ডিভুক্ত করবে এবং শাস্তি দেবে।

এমন পুরুষের স্মরণ রাখা উচিত যে, খোদার প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ জামা'তি ব্যবস্থাপনার নিকট যদি এমন সংবাদ পৌঁছে তবে এমন লোককে (জামা'ত) অবশ্যই শাস্তি দিয়ে থাকে। খোদার দোহাই লাগে, পবিত্র কুরআনের দুর্নাম করবেন না আর নিজেদের সংশোধনের চেষ্টা করুন।"

(জুমুআর খুতবা, ২ জুলাই ২০০৪, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, মিসিসাগা, কানাডা)

এ প্রসঙ্গে হুযূর আনোয়ার (আই.) আরেক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশাবলী উপস্থাপন করে বলেন–

"হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) মলফুযাতে বলেন, আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ হেদায়াতদাতা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ অর্থাৎ তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তার পরিবারের সাথে উত্তম আচরণ করে। স্ত্রীর সাথে যার আচারব্যবহার ভালো নয় এবং সুন্দরভাবে জীবন কাটায় না, সে আবার পুণ্যবান কীভাবে হলো? অন্যের সাথে সদ্ব্যবহার তখন হওয়া সম্ভব যখন সে নিজের স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করবে। যেসব মানুষ বাহ্যতঃ পুণ্যবান মনে হয়ে থাকে তাদের মাঝেও অনেক ভুলত্রুটি থাকে। যারা স্ত্রীদের সাথে বা পরিবারের লোকদের সাথে সদ্ব্যবহার করে না, সমাজের মানুষেরও উচিত এমন লোকদের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং বাহ্যিকতায় মুগ্ধ না হওয়া।

তিনি (আ.) বলেছেন, তাকে স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে এবং

উত্তমভাবে জীবনযাপন করতে হবে। এমন নয় যে প্রতিটি তুচ্ছ বিষয়েই হাত উঠাবে। এমন ঘটনাও ঘটে যে, অনেক সময় রাগী স্বভাবের মানুষ স্ত্রীর সাথে অতি সামান্য বিষয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে প্রহার করে এবং স্পর্শকাতর কোন স্থানে আঘাত করে বসে আর স্ত্রী মারা যায়। একারণে তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ (সূরা আন নিসা 4: 20)। হ্যাঁ সে যদি অপকর্ম করে তবে সতর্ক করা আবশ্যক।"

(মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৩-৪০৪)

অনেক সময় বাড়িতে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ছোট ছোট বিষয়ে তিক্ত বাক্য বিনিময় হয়, তিক্ততা হয়েই যায়। আল্লাহ্ তা'লা পুরুষকে বেশি দৃঢ় ও শক্তিশালী বানিয়েছেন। পুরুষ যদি নিরব থাকে তবে হয়তো শতকরা আশি ভাগেরও বেশি বিবাদ সেখানেই মিটে যায়। শুধু মাথায় রাখা দরকার যে, আমাকে উত্তম আচরণ করতে হবে এবং ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

এ বিষয়ে আমাদের মনিব হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) আমাদেরকে কী আদর্শ দেখিয়েছেন। হাদীসে আছে, হযরত আয়েশা (রা.) একদিন মহানবী (সা.)-এর সাথে কিছুটা তীর্যকভাবে ও কর্কশতার সাথে কথা বলছিলেন, এমন সময় তাঁর পিতা হযরত আবু বকর (রা.) সেখানে আসেন আর এ অবস্থা দেখে তিনি সইতে না পেরে নিজের মেয়েকে তিনি মারতে উদ্যত হয়ে বললেন, আল্লাহ্র রসূল (সা.)-এর সাথে এভাবে কথা বলছো! এটি দেখে মহানবী (সা.) বাপ-বেটির মাঝে এসে দাঁড়ালেন আর হযরত আবু বকর (রা.)-এর সম্ভাব্য শাস্তির হাত থেকে হযরত আয়েশা (রা.)-কে রক্ষা করলেন। হযরত আবু বকর (রা.) চলে যাওয়ার পর রসূলে করীম (সা.) রসিকতা করতে গিয়ে হযরত আয়েশা (রা.)-কে বললেন, দেখেছো! আমি তোমাকে তোমার পিতার হাত থেকে কীভাবে বাঁচালাম?

অতএব দেখুন, এটি কত মহান আদর্শ! কেবল নিরব থেকে ঝগড়া মিটানোরই চেষ্টা করেন নি বরং হযরত আয়েশার পিতা হযরত আবু বকর (রা.)-কেও বলেছেন, আয়েশাকে কিছু বলবেন না আর তাৎক্ষণিকভাবে হযরত আয়েশার সাথে রসিকতা করে সাময়িক মানসিক চাপও দূর করে দিয়েছেন। এরপর হাদীসে রয়েছে যে, কিছুদিন পর হযরত আবু বকর (রা.) যখন পুনরায় আসেন তখন মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রা.) হেসে হেসে প্রফুল্লতার

সাথে কথা বলছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, দেখো! তোমরা তোমাদের বিবাদে আমাকে জড়িয়েছিলে, এখন তোমাদের আনন্দেও আমাকে শামিল কর।

(আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব মাজা ফিল মাযাহে)

মহানবী (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর খুনসুটি সহ্য করতেন। একবার তাকে বলেন, হে আয়েশা! তুমি অসন্তুষ্ট নাকি আনন্দিত তা আমি ভালোভাবে বুঝি। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, তা কীভাবে? তিনি (সা.) বলেন, তুমি যখন আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক তখন তোমার কথাবার্তার সময় তুমি রাব্বে মুহাম্মদ (সা.) বা মুহাম্মদের প্রভু বলে কসম খেয়ে থাক আর যখন অসন্তুষ্ট থাক তখন তুমি রাব্বে ইব্রাহীম (আ.) বা ইব্রাহীমের প্রভুর নামে (কসম খেয়ে) কথা বল। (এ কথা শুনে) হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি ঠিক বলেছেন, তবে আমি তো কেবল মুখেই আপনার নাম নেয়া বন্ধ করি (কিন্তু হৃদয় থেকে তো আপনার ভালোবাসা তিরোহিত হতে পারে না)।

(বুখারী কিতাবুন নিকাহ, বাব গায়রাতুন নিসা ওয়া ওজদু হিন্না)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "অশ্লীলতা ছাড়া মহিলাদের বাকি সকল বক্রতা ও তিক্ত কথাবার্তা সহ্য করা উচিত। তিনি আরো বলেন, পুরুষ হয়ে নারীর সাথে বিবাদ করাটা আমার কাছে চরম নির্লজ্জতা মনে হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পুরুষ বানিয়েছেন, সত্যিকার অর্থে এটি আমাদের প্রতি নেয়ামতের পূর্ণতা। এর কৃতজ্ঞতা হলো আমরা যেন মহিলাদের সাথে কোমল ও নম্র আচরণ করি।"

একবার এক বন্ধুর কঠোর স্বভাব ও অশালীন ভাষার উল্লেখ হয় এবং অভিযোগ উঠে যে, তিনি স্ত্রীর সাথে কঠোর আচরণ করেন। এ কথা শুনে হুযূর (আ.) খুবই মর্মাহত, দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, "আমাদের বন্ধুদের এমন হওয়া উচিত নয়।" (এরপর) হুযূর (আ.) অনেকক্ষণ যাবৎ স্ত্রীদের সাথে সুন্দরভাবে জীবন কাটানো সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং সবশেষে বলেন, "আমার অবস্থা দেখুন! একবার আমি আমার স্ত্রীর সাথে (কিছুটা) উচ্চস্বরে কথা বলেছিলাম আর আমার মনে হয়েছিল, সেই উঁচু স্বরের সাথে মনোকষ্টের মিশ্রণ ছিল, যদিও মর্মপীড়াদায়ক ও কঠোর কোন শব্দ মুখ থেকে বের হয় নি। তবুও আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত এস্তেগফারে রত থাকি এবং খুবই বিগলিত চিত্তে কাকুতি-মিনতি করে নফল নামায পড়ি এবং কিছু সদকাও দেই। কেননা স্ত্রীর

প্রতি এমন কঠোরতা; তা হতে পারে আল্লাহ্‌র প্রতি কোন অজানা অবাধ্যতারই ফলাফল।"

(মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৭, রাবওয়াতে মুদ্রিত)

অতএব এই হলো স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের দৃষ্টান্ত যা এযুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কর্মের মাঝে তার মনিব হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর অনুসরণে আমরা দেখতে পাই। এসবের অনুসরণের মাধ্যমেই আমরা আমাদের ঘরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারি।"

(জুমুআর খুতবা, ২৩ জানুয়ারি ২০০৪; খুতবাতে মাসরূর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৪-৬৫, মুদ্রণ, নাযারাতে ইশায়াত, রাবওয়া, সংস্করণ ২০০৫)

২০০৫ সনের ২৪ জুন, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার টরেন্টো-কানাডায় হুযূর আনোয়ার (আই.) তার জুমুআর খুতবায় পুরুষদেরকে নারীদের সাথে সদ্ব্যবহারের উপদেশ দিয়ে বলেন–

"পুরুষকে আল্লাহ্ তা'লা অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়ক বানিয়েছেন, কারণ তার মাঝে সহ্যক্ষমতা বেশি থাকে। তার স্নায়ু অনেক বেশি মজবুত হয়ে থাকে। তাই ছোটখাটো ভুলত্রুটি হয়ে গেলেও তাদেরকে (অর্থাৎ নারীদেরকে) ক্ষমা করে দেয়া উচিত।"

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৮ জুলাই ২০০৫)

নিজ স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করা সম্পর্কে হুযূর আনোয়ার (আই.) আরেক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি বক্তব্য ও এর ব্যাখ্যা এভাবে তুলে ধরেন–

"এটি মনে করো না যে, মহিলারা এমন জিনিস যাদেরকে অত্যন্ত হীন ও তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত। না, না। আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهٖ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করে। স্ত্রীর সাথে যার আচারব্যবহার ও জীবনযাপন সুন্দর নয় সে আবার পুণ্যবান হলো কবে? কেউ অন্যের সাথে পুণ্য ও সদ্ব্যবহার তখন করতে পারে যখন সে নিজ স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করে ও সুন্দরভাবে জীবন কাটায়।"

(মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৩, সংস্করণ ২০০৩, রাবওয়ায় মুদ্রিত)

অতএব এই হলো সেই শিক্ষার একটি ঝলক যা ইসলাম আমাদেরকে দিয়েছে আর এ যুগে আমাদেরকে যার শিক্ষা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পুনরায়

নুতনভাবে দিয়েছেন এবং বুঝিয়েছেন। অনিন্দ্য সুন্দর এই শিক্ষার দৃষ্টান্ত আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রিয় রসূল (সা.)-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন আর এর সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তিনি (সা.) ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তোমাদের মাঝে আমিই স্ত্রীদের সাথে সবচেয়ে বেশি উত্তম ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু কালের প্রবাহে যেভাবে ইসলামের অন্যান্য বিধিনিষেধ ও কর্মে ঘাটতি দেখা দিয়েছে, ঠিক একই অবস্থা ঘটেছে এ নির্দেশের ক্ষেত্রেও। মহিলার প্রতি যত্নবান হওয়া, তাকে সম্মান করা, তাকে মর্যাদা দান করা, তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা প্রভৃতি শিক্ষার কোন গুরুত্বই অবশিষ্ট থাকে নি। কেননা প্রকৃতপক্ষে একজন পুণ্যবতী ও সৎকর্ম পরায়ণা নারীর পদতলে জান্নাত রয়েছে– এটিই তার পদমর্যাদা।

অতএব যেভাবে আমি বলেছি, এ যুগে মহিলা-সংক্রান্ত নিয়মকানুন মেনে চলার ক্ষেত্রে অনেক শিথিলতা দেখা দিয়েছে। এজন্য সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিক ও যুগের ইমামের দৃষ্টি আল্লাহ্ তা'লা এদিকে আকর্ষণ করেন যে, তোমার জামা'তে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা কর। এই অবলা নারীদেরকে মহানবী (সা.) কাঁচের সাথে তুলনা করেছেন যাদের সাথে কঠোরতা প্রদর্শন তাদেরকে ভেঙে খণ্ডবিখণ্ড করতে পারে, টুকরো টুকরো করতে পারে, যাদের দেহের গঠন ও গড়ন দুর্বল, যাদের আবেগ অনুভূতিকেও আল্লাহ্ তা'লা এমন সংবেদনশীল বানিয়েছেন যে, তাদের সাথে কোমল ও অতিব দয়ার্দ্র আচরণ করা উচিত। তারা পাঁজরের হাড় সদৃশ। এর প্রকৃত আকৃতি হতে কল্যাণমণ্ডিত হও। অতএব আপনারা যেখানে এমন ইমামের জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন যাকে আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে আপনাদের অধিকার নিশ্চিৎ করার সরাসরি নির্দেশ প্রদান করেছেন সেখানে আপনাদের সেই খোদার প্রতি কতটা কৃতজ্ঞ হয়ে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার চেষ্টা করা উচিত যেসব আদেশ আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে দিয়েছেন।"

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৯ জুলাই ২০০৬;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৬ জুন ২০১৫)

২০০৪ সনের ৩১ জুলাই যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) স্বীয় বক্তৃতায় পুরুষ ও নারীদেরকে তাদের আবশ্যিক দায়িত্বাবলীর প্রতি খুবই সুন্দরভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন–

"দেখুন! তিনি (আ.) কত স্পষ্টভাবে বলেছেন, অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে উভয়ের অধিকার সমান। তাই আমি যেহেতু কাওয়াম বা অভিভাবক, তাই আমার অধিকার বেশি– একথা বলে পুরুষ কখনো অধিক অধিকার কুক্ষিগত করতে পারে না। মহিলা যেভাবে পুরুষের প্রতি অর্পিত সমস্ত আবশ্যিক দায়িত্ব পালনে দায়বদ্ধ, একইভাবে পুরুষও মহিলার প্রতি অর্পিত সমস্ত আবশ্যিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ।"

এ ধারাবাহিকতায় তিনি আরো বলেন–

"আমাদের সমাজে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, নারীরা পায়ের জুতো। এটি খুবই হীন একটি ধারণা ও ভুল প্রবাদ। এই প্রবাদের অর্থ হলো, এক মহিলা দ্বারা চাহিদা পূর্ণ হওয়ার পর অন্য মহিলা পছন্দ হলো আর তাকে বিয়ে করে একে তাড়িয়ে দিল। প্রথম স্ত্রীর আবেগ ও অনুভূতির প্রতি ভ্রুক্ষেপই করা হয় না। অতএব এটি অত্যন্ত ঘৃণ্য একটি আচরণ। নারী কোন জড়বস্তু নয় বরং আবেগ ও অনুভূতি সম্পন্ন এক সত্তা। পুরুষদেরকে বলা হয়েছে যে সুদীর্ঘ কাল সে তোমাদের পরিবারের শান্তির কারণ হয়েছে অধিকন্তু সে তোমার সন্তানসন্ততির মা আর তাদের জন্য দুঃখকষ্ট সহ্য করেছে; এখন যদি তোমরা তাদেরকে হীন জ্ঞান কর, তাদের সাথে মন্দ আচরণ কর এবং অজুহাত খুঁজে খুঁজে তাদের জীবন অতিষ্ঠ করার চেষ্টা কর তবে এটি হবে পুরোপুরি অন্যায় ও অবৈধ একটি বিষয়। পর্দার অজুহাতে তাদের প্রতি যদি বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে অবৈধ নিষেধাজ্ঞা আরোপ কর আর জামা'তী কাজে মসজিদে আসলে অপবাদ দিয়ে বল যে, অন্য কোথাও যাচ্ছ তাহলে এগুলো খুবই ঘৃণ্য কাজ, যা করতে পুরুষদের বারণ করা হয়েছে। অথচ মহিলাদের সাথে তোমাদের আচরণ এমন হওয়া উচিত, যেমন আচরণ দু'জন সত্যিকার ও প্রকৃত বন্ধুর মাঝে হয়ে থাকে। দু'জন প্রকৃত বন্ধু যেভাবে একে অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝেও সম্পর্ক ঠিক তেমনি থাকা উচিত। কেননা স্বামী-স্ত্রী পরস্পর যে বন্ধনে আবদ্ধ তা সারা জীবনের অঙ্গীকার আর অঙ্গীকার রক্ষা করা হলো ইসলামের একটি মৌলিক নির্দেশ।

অঙ্গীকার রক্ষাকারীরা আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে পছন্দনীয়। যেহেতু এটি এমন একটি বন্ধন যাতে একে অপরের গোপনীয়তা সম্পর্কে অবহিত থাকে, তাই বলেছেন, স্ত্রী স্বামীর বহু বিষয়ের সাক্ষী হয়ে থাকে, অর্থাৎ তার মাঝে কী কী

পুণ্য আছে, কী সব ভালো গুণ আছে, কোন্ কোন্ মন্দ অভ্যাস আছে আর তার চারিত্রিক মান কী? তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার না করে এবং তার সাথে সমঝোতা-মিমাংসার পরিবেশে বসবাস না করে এবং তার প্রাপ্য অধিকার তাকে প্রদান না করে তাহলে সে আল্লাহ্‌র অধিকার কীভাবে প্রদান করবে, তাঁর ইবাদত কীভাবে করবে আর কোন মুখে সে তাঁর কাছে অনুগ্রহ যাচনা করবে, যখন কিনা সে নিজেই তার স্ত্রীর প্রতি অন্যায় ও অবিচার করে! এজন্য মহানবী (সা.) বলেছেন, **তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে তার স্ত্রীর সাথে উত্তম, তার সহধর্মিণীর কাছে ভালো**। অতএব দেখুন! এই হলো নারীর অধিকার সংরক্ষণ যা ইসলাম করেছে। এখন এমন কোন ধর্ম আছে কি, যা নারীর অধিকার এভাবে সংরক্ষণ করছে আর তার অধিকারের প্রতি এতটা যত্নবান?"

এই ভাষণেই হুযূর আনোয়ার (আই.) সূরা আন্ নিসার ৩৫ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন–

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ অর্থাৎ পুরুষদেরকে নারীদের অভিভাবক বানানো হয়েছে আর এরপর بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ (সূরা আন নিসা 4:35) অর্থাৎ সার্বিকভাবে পুরুষকে নারীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে। তফসীরকারীরা এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর খুব সুন্দর একটি তফসীর করেছেন, সেখান থেকে আমি কিছুটা বর্ণনা করছি।

তিনি বলেন, সর্বপ্রথম আমরা **কাওয়াম** শব্দটি দেখি। **কাওয়াম** বলতে এমন সত্তাকে বুঝানো হয়েছে, যে অবস্থা, পরিবেশ ও পরিস্থিতি শুধরে দেয়, যে সংশোধন করে এবং যে বক্রতা দূর করে আর পরিষ্কার ও সোজা করে। যেহেতু সমাজের সংশোধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কাওয়াম বলা হয় তাই কাওয়ামের সঠিক অর্থ হবে, নারীদের সামাজিক সংশোধনের প্রথম দায়িত্ব পুরুষের ওপর ন্যস্ত। নারীসমাজ যদি বিকৃতির শিকার হতে থাকে, তাদের মাঝে যদি বক্রতা দেখা দেয়, তাদের মাঝে যদি এমন স্বাধীনচেতা মনোবৃত্তি মাথাচাড়া দেয় যা তাদের পারিবারিক ব্যবস্থার জন্য ধ্বংসাত্মক, অর্থাৎ পারিবারিক ব্যবস্থাকে বিনষ্টকারী, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টিকারী, তবে নারীকে শাস্তি দেয়ার পূর্বে পুরুষ যেন নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে। কেননা আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে তত্ত্বাবধায়ক বানিয়েছেন। এ থেকে বুঝা যায়, এ ক্ষেত্রে তারা নিজেদের কিছু দায়িত্ব পালন করে নি। আর

بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ (সূরা আন নিসা 4: 35) আয়াতে খোদা তা'লা যা বর্ণনা করেছেন তা হলো, প্রতিটি (মানুষের) সৃষ্টির মাঝে খোদা তা'লা জন্মগত এমন কিছু শ্রেষ্ঠত্ব রেখে দিয়েছেন যা অন্য কোন সৃষ্টির মাঝে নেই এবং কারো কারো ওপর কারো কারো শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। কাওয়াম বা অভিভাবকত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষের একটি শ্রেষ্ঠত্বের কথা এতে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ কোনক্রমেই এটি নয় যে, পুরুষ নারীর ওপর নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্ব রাখে।

[যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর বক্তৃতা, ১ আগষ্ট ১৯৮৭]

অতএব اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ (সূরা আন নিসা 4: 35) -এ আয়াত বলে পুরুষদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে যে সমাজকল্যাণের কাজ অর্পণ করেছেন, তোমরা সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন কর নি। তাই নারীদের মাঝে যদি কোন মন্দ অভ্যাস সৃষ্টি হয় তাহলে তোমাদের অযোগ্যতার কারণেই তা সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া মহিলারা নিজেরা একথা স্বীকার করে অর্থাৎ এখনো এই পশ্চিমা সমাজে একথা স্বীকার করা হয়, এমন কি নারীদের মাঝেও নারীকে স্পর্শকাতর বা অবলা শ্রেণি আখ্যায়িত করা হয়। অতএব তারা নিজেরাই বলে যে, নারীরা দুর্বল। আর নারীরা নিজেরা স্বীকারও করে যে, তাদের কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কিছু শক্তিবৃত্তি পুরুষের তুলনায় দুর্বল আর তারা পুরুষের মুকাবিলা করতে পারে না। এই সমাজেও খেলাধুলায় নারী-পুরুষের পৃথক পৃথক দল গঠন করা হয়। অতএব আল্লাহ্ তা'লা যখন বলে দিয়েছেন, আমি সৃষ্টিকর্তা আর আমি জানি, নারী ও পুরুষকে আমি কী গঠন ও গড়নে বানিয়েছি আর এই পার্থক্যের কারণে আমি বলেছি, নারীর ওপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে তখন তোমরা আপত্তি কর যে, ইসলাম পুরুষকে নারীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে! মহিলাদের তো আনন্দিত হওয়া উচিত, কেননা এটি বলে আল্লাহ্ তা'লা পুরুষদের ওপর অধিক দায়িত্বভার অর্পন করেছেন। পারিবারিক ছোটখাটো বিষয়গুলোতে নারী ও পুরুষের মাঝে তুচ্ছ ঝগড়াবিবাদ হয়, তিক্ততা সৃষ্টি হয়, এ দৃষ্টিকোণ থেকেও পুরুষকে বলা হয়েছে, যেহেতু তোমাদের শক্তিবৃত্তি দৃঢ়, তোমরা কাওয়াম বা অভিভাবক, তোমাদের স্নায়ু দৃঢ় তাই তোমরা বড় মনের পরিচয় দাও এবং এর মাধ্যমে সমস্যাগুলোর এমনভাবে সমাধান কর যেন এই তিক্ততা বৃদ্ধি পেয়ে বড় বিবাদে রূপ না নেয় এবং পরবর্তীতে যেন তা তালাক ও আদালত পর্যন্ত না

গড়ায়। এর পাশাপাশি পরিবারের ব্যয়ভারও পুরুষের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।"

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৩১ জুলাই ২০০৪; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৪ এপ্রিল ২০১৫)

হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর এই বক্তৃতায়ই সূরা আন্ নিসার ২০ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং অনুবাদ করার পর এর ব্যাখ্যায় বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ۔ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۔ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۔ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ۝

(সূরা আন নিসা 4: 20) হে যারা ঈমান এনেছো! বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী বনে যাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আর তোমরা তাদের যা দিয়েছো এর একাংশ ছিনিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে কষ্ট দিও না। তবে তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হলে ভিন্ন কথা। আর তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর। তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ কর সেক্ষেত্রে হয়তো তোমরা এমন কিছু অপছন্দ করছ যার মাঝে আল্লাহ্ প্রভূত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, মহিলাদের সাথে তোমরা উত্তম আচরণ কর। যাদেরকে তোমরা অন্য পরিবার থেকে বিয়ে করে নিয়ে এসেছ, তাদেরকে তাদের আত্মীয়স্বজন, পিতামাতা এবং ভাইবোনদের কাছ থেকে পৃথক করেছ, তাদেরকে অকারণে ত্যক্ত-বিরক্ত করো না, তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান কর এবং তাদের অধিকার প্রদান না করার জন্য তোমরা অজুহাত খুঁজে বেড়িও না।"

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৩১ জুলাই ২০০৪, আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৪ এপ্রিল ২০১৫)

মহিলাদের সাথে উত্তম আচরণ করা প্রসঙ্গে হুযূর (আই.) হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি শুনিয়ে বলেন–

"হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, মনে কষ্ট দেয়া অনেক বড়

পাপের কাজ আর মেয়েদের সাথে সম্পর্কের বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। তাই পুরুষদেরকে যেখানে কঠোর হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে, সেটি দেয়া হয়েছে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে। বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া মারধর করার অনুমতিই নেই আর সেখানেও শুধুমাত্র ধর্মীয় বিষয়াদিতে এবং আল্লাহ্ তা'লার সুস্পষ্ট বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করার ক্ষেত্রে এ অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু যে পুরুষ নিজেই নামায পড়ে না এবং ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে না সে স্ত্রীকে কিছু বলার অধিকার কোথা থেকে পাবে? শর্তসাপেক্ষে পুরুষরা যে অনুমতি পেয়েছে তা পেয়েছে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে। (মহিলারা হয়তো মনে করতে পারেন, এসব কথা তো পুরুষদেরকে বলা উচিত। চিন্তা করবেন না, পাশের তাঁবুতেই পুরুষরা শুনছে বরং আপনাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য সমগ্র পৃথিবী শুনছে।) নিজের স্ত্রীর সাথে এক সাহাবীর কঠোরতা প্রদর্শন ও উত্তম আচরণ না করায় আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এলহাম করে স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে বলেন, এটি সঠিক আচরণ নয়, এ থেকে মুসলমানদের নেতা আব্দুল করীমকে বিরত করা হোক।"

(যামিমা তোহ্ফায়ে গুলড়বিয়া, রূহানী খাযায়েন, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ৭৫)

তিনি (আ.) বলেন–

"এই এলহামে গোটা জামা'তের জন্য শিক্ষা হলো, তারা যেন নিজেদের স্ত্রীর সাথে নম্র ও দয়ার্দ্র আচরণ করে। তারা তাদের কৃতদাসী নয়। মূলত বিয়ে হলো নারী ও পুরুষের মাঝে একটি পারস্পরিক চুক্তি। অতএব চেষ্টা কর যেন স্বীয় অঙ্গীকার পালনের ক্ষেত্রে প্রতারক গণ্য না হও। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ (সূরা আন নিসা 4: 20) অর্থাৎ নিজেদের স্ত্রীর সাথে সদ্ভাবে জীবন অতিবাহিত কর। আর হাদীসে আছে خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهٖ অর্থাৎ **তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার করে।** অএতব আধ্যাত্মিক ও দৈহিকভাবে তোমরা তোমাদের স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের জন্য দোয়া করতে থাক এবং তালাক দেয়া থেকে বিরত থাক। কেননা আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তি অতি নিকৃষ্ট যে তড়িঘড়ি করে তালাক দিয়ে দেয়। যে সম্পর্ককে খোদা তা'লা যুক্ত করেছেন বা জুড়ে দিয়েছেন তাকে একটি নোংরা পাত্রের ন্যায় তাড়াহুড়া করে ভেঙে ফেলো না।"

(যামিমা তোহ্ফায়ে গুলড়বিয়া, রূহানী খাযায়েন, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ৭৫, টীকা)

অতএব দেখুন! এ যুগেও আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর

মাধ্যমে প্রাপ্য অধিকার প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন, সত্যিকার অর্থে এক দিক থেকে পুরুষকে নারীর সেবাদাস বানিয়ে দিয়েছেন। বর্তমানে শিক্ষিত বা সভ্য জগতের কোন আইনও এভাবে নারীর অধিকার প্রদান করে না।

(জলসা সালানা যুক্তরাজ্যে মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৩১ জুলাই ২০০৪;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৪ এপ্রিল ২০১৫)

Joint family system: যৌথ পরিবার ব্যবস্থা

যৌথ পরিবার ব্যবস্থার উপকারিতা ও অপকারিতা বর্ণনা করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) জামা'তের বন্ধুদেরকে এই উপদেশ দিয়েছেন যে–

"এরপর আরেকটি ব্যাধি যার কারণে সংসার ধ্বংস হয়, বাড়িতে সর্বদা ঝগড়বিবাদ এবং অশান্তিকর পরিস্থিতি বিরাজ করে তা হলো সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আর বৈধ কোন কারণ ছাড়াই বিয়ের পরও ছেলের পিতামাতা ও ভাইবোনের সাথে একই বাড়িতে থাকা। পিতামাতা যদি বৃদ্ধ হন, তাদের সেবা শুশ্রূষা করার মত কেউ যদি না থাকে, তারা নিজেরা যদি সচলভাবে কাজ করতে না পারেন আর তাদের কোন সাহায্যকারীও না থাকে তবে এই ছেলের উচিত এবং আবশ্যিক দায়িত্ব হলো তাদেরকে নিজের সাথে রাখা আর তাদের সেবা-শুশ্রূষা করা। কিন্তু যদি ভাইবোনও থাকে, যারা তাদের সাথে বসবাস করছে, তাহলে ঘর পৃথক করাতে কোন অসুবিধা নেই। আজকের যুগে এ কারণে অনেক অপ্রিয় ঘটনাও ঘটে থাকে। একত্রে থেকে যদি আরো বেশি পাপী হতে হয় তাহলে এটি কোন সেবা বা পুণ্যকর্ম নয়।"

সম্প্রতি কোন এক দেশে জামা'তের মাঝেই একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে, যা খুবই হৃদয়বিদারক। সব ভাইবোন এক সাথে এক বাড়িতে বসবাস করছিল অর্থাৎ যৌথ পরিবার ছিল। প্রত্যেকেই দুটি করে কামরা দখল করে রেখেছিল। দুই জা-এর মাঝে তাদের শিশু সন্তানদের কেন্দ্র করে কথা কাটাকাটি হয়। সন্ধ্যায় একজনের স্বামী বাড়ি এলে সে এ কথা বলে তার কান ভারি করে যে, সন্তানদের ঝগড়াবিবাদ নিয়ে তোমার ভাই ও তার স্ত্রী এ ধরনের কথাবার্তা বলেছে (এগুলো বলে)। সেও পূর্বাপর কিছু না দেখে বন্দুক নিয়ে নিজের তিন ভাইকে হত্যা করে এবং পরে নিজেও আত্মহত্যা করে বসে। অতএব শুধু এ কারণেই এক পরিবারের চারজনের জানাযা একই সময় পড়তে হয়েছে।

অতএব প্রেম, প্রীতি ও ভালোবাসার জন্য আমরা একত্রে বসবাস করি। এখন যদি এই প্রেম, প্রীতি ও ভালোবাসাই ঘৃণার প্রসার ঘটাতে থাকে তাহলে মনে রাখতে হবে যে, একত্রে থাকা শরীয়তের কোন আদেশ নয়। এর চেয়ে পৃথক থাকাই উত্তম। তাই প্রতিটি বিষয়ে আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নেয়ার পরিবর্তে সর্বদা বিবেকবুদ্ধি খাটিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই আয়াতের ব্যাখ্যায়ঃ

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ

অর্থাৎ অন্ধের কোন দোষ হবে না, খোঁড়া-খঞ্জেরও কোন দোষ হবে না, রুগ্ন ব্যক্তিরও কোন দোষ হবে না এবং তোমাদেরও (কোন দোষ হবে না) যদি তোমরা সবাই নিজেদের ঘরে বা তোমাদের পিতা-পিতামহের ঘরে বা তোমাদের মাদের ঘরে বা তোমাদের ভাইদের ঘরে বা তোমাদের বোনদের ঘরে খাবার খাও। (সূরা আন নূর 24 : 62) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, ভারতবর্ষে অধিকাংশ মানুষ নিজেদের পরিবারে বিশেষ করে শাশুড়ি বউ-এর ঝগড়া সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করে থাকে। (কিন্তু) যদি পবিত্র কুরআনের অনুসরণ করা হয় তাহলে এমনটি হওয়ার কথা নয়। তিনি বলেন, দেখো! (এই যে খাবার খাওয়া-সংক্রান্ত আয়াতটি রয়েছে) এতে নির্দেশ রয়েছে যে, ঘর যেন পৃথক পৃথক হয়। মায়ের ঘর আলাদা আর বিবাহিত ছেলের ঘর পৃথক হবে, কেবল তবেই তো একজন আরেকজনের গৃহে যাবার এবং খাবার খাওয়ার প্রশ্ন আসবে।"

অতএব দেখো! যেসব লোক মনে করে, আমরা যদি পিতামাতার কাছ থেকে দূরে থাকি তাহলে না জানি কত বড় পাপ করে বসব। কিছু পিতামাতাও ছেলেদেরকে এমনভাবে ভয় দেখিয়ে থাকে বরং ব্ল্যাকমেইল করে থাকে যে, ঘর পৃথক করতেই যেন তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যাবে। অতএব এগুলো হলো চরম পর্যায়ের ভ্রান্ত আচরণ।

কয়েকবার আমি কিছু মেয়েকে জিজ্ঞেস করেছি, তারা শ্বশুর শাশুড়ীর সামনে এটিই বলে যে, আমরা নিজের ইচ্ছায় এক সাথে বসবাস করছি বরং তাদের

সন্তানরাও এটিই বলে। কিন্তু পৃথকভাবে জিজ্ঞেস করলে দু'জনেই বলে, বাধ্য হয়ে বসবাস করছি। অবশেষে ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হলো, বউ শাশুড়ীর ওপর নির্যাতন করে আর অনেক সময় শাশুড়ী বউয়ের ওপর অত্যাচার করে।

(জুমুআর খুতবা, ১০ নভেম্বর ২০০৬, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১ ডিসেম্বর ২০০৬)

এছাড়াও হুযূর আকদাস (আই.) বলেন–

"একটি মেয়ে যখন নিজের পিতামাতার বাড়ি ছেড়ে স্বামীর বাড়ি আসে তখন যদি তার সাথে সদ্ব্যবহার করা না হয় আর শ্বশুরালয় যদি যৌথ পরিবার হয় তাহলে এ ঘরে তার অবস্থা তেমনিই হয় যা এক কারাবন্দির হয়ে থাকে; আর বন্দিও এমন, যার খবরই কেউ রাখে না। মেয়ে নিজে পিতামাতাকে বলে না আর পিতামাতাও ঘর ভাঙার ভয়ে জিজ্ঞেস করে না। অতএব মেয়ে যদি এভাবে ধুকে ধুকে মরতে থাকে তবে এটি একটি মহা অন্যায় কাজ।"

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষন, ৩১ জুলাই ২০০৪;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৪ এপ্রিল ২০১৫)

একইভাবে আরেকবার তিনি বলেন–

"হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তো ভালোবাসার প্রসারের জন্য এসেছিলেন। অতএব আহমদী হয়ে সেই ভালোবাসার আরো বিস্তার ঘটান এবং এজন্য সচেষ্ট হোন আর ঘৃণার প্রসার ঘটাবেন না। অধিকাংশ পরিবারের মানুষ অত্যন্ত প্রীতিঘন পরিবেশে বসবাস করে, কিন্তু যারা থাকতে পারে না তারা যেন আবেগতাড়িত হয়ে সিদ্ধান্ত না নেয় বরং যদি সুযোগ থাকে, সুবিধাও থাকে আর কোন বাধ্যবাধকতা না থাকে তবে পৃথক থাকাই উত্তম। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর এটি একটি খুব সুন্দর গুঢ়-কথা যে, এক সাথে থাকা যদি এতটাই প্রয়োজনীয় হয়ে থাকে তবে পবিত্র কুরআনে কেন পিতামাতার ঘরের পৃথক উল্লেখ করা হলো? তাদের সেবা শুশ্রূষা করার, তাদের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখার, তাদের কোন কথায় মন খারাপ না করার, তাদের সামনে উঁফ শব্দটুকু উচ্চারণ না করার নির্দেশ রয়েছে, এগুলো সঠিকভাবে মেনে চলা আবশ্যক। স্ত্রীকে স্বামীর রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়দের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। এ নির্দেশ পালন করা আবশ্যক আর একইভাবে স্বামীকেও স্ত্রীর রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়দের প্রতি যত্নশীল হতে হবে, এ

নির্দেশের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। বিয়ের ক্ষেত্রে এটি একটি মৌলিক নির্দেশ।"

(জুমুআর খুতবা, ১০ নভেম্বর ২০০৬, বায়তুল ফতুহ, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১ ডিসেম্বর ২০০৬)

কানাডা সফরকালে ২০১২ সনের ১১ জুলাই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) রিশতানাতা কমিটির সাথে মিটিং-এর সময় বলেন–

"এখানে কানাডা, আমেরিকা এবং পশ্চিমা দেশগুলোতে অনেক ছেলে কিছু অসঙ্গত কাজে জড়িয়ে যায় এবং তাদের মাঝে কিছু রোগব্যাধি দেখা দেয়। কোন কোন সময় তরবিয়ত করলে ও বুঝানোর ফলে সংশোধন হয়ে যায় কিন্তু অনেক সময় হয় না। একইভাবে কোন কোন সময় কতক মেয়ের মাঝেও বিভিন্ন ধরনের ভুলত্রুটি থেকে থাকে। মোটকথা আত্মীয়তা করার সময় এসব বিষয় সামনে আসা উচিত এবং উভয়কেই তাকওয়ার সাথে জানানো উচিত, পরে যেন ঝগড়াবিবাদ না হয়।"

হুযূর আনোয়ার (আই.) আরো বলেন–

"অনেক পরিবার এমন আছে যারা বিয়ের পর মেয়েকে এই বলে খোঁটা দেয় যে, যৌতুক নিয়ে আসে নি কেন! বা ছেলে হয় না কেন! এর (শুধু) মেয়ে হয়! ছেলেপক্ষ যদি মেয়েকে এভাবে খোঁটা-খোঁচা দিতে থাকে তাহলে ঘর ভেঙে যায়। অনেক দাদি, নানি পাকিস্তানের গ্রামীণ পরিবেশ থেকে উঠে আসে আর তারা গ্রামীণ প্রভাবে ভীষণভাবে প্রভাবিত থাকে এবং তাদের এই অজ্ঞতাপূর্ণ মনমানসিকতার কারণে কতক সংসার ভেঙে যায়।"

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১২)

পারিবারিক জীবনে সমস্যার বিভিন্ন কারণ

স্ত্রীদের প্রতি দোষারোপ এবং অন্যায় আচরণ

১০ নভেম্বর ২০০৬ সনে মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, লন্ডনে হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর জুমুআর খুতবায় পারিবারিক সমস্যা ও এর সমাধান বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। এই জুমুআর খুতবার কয়েকটি উদ্ধৃতি নিম্নে উপস্থাপিত হলো। তিনি বলেন–

"বর্তমানে আবারও পারিবারিক ঝগড়াবিবাদের অভিযোগ অনেক বেড়ে গেছে। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বিষয়াদি এবং পারস্পরিক ঝগড়াবিবাদে অনেক সময় এমন ঘৃণ্য বিষয়াদি সামনে আসে যাতে পরস্পরের প্রতি দোষারোপও করা হয় অথবা পুরুষের পক্ষ থেকে বা শ্বশুরালয়ের পক্ষ থেকে এমন অন্যায় আচরণ করা হয় যে, আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপা যদি না থাকত আর 'যাক্কির' অর্থাৎ উপদেশ দিতে থাক, নিশ্চয়ই উপদেশ কল্যাণ সাধন করে– আল্লাহ্ তা'লার এই আদেশ যদি দৃষ্টিপটে না থাকত, তাহলে মানুষ এ ভেবে নিরাশ হয়ে বসে যেত যে, এই বিকারগ্রস্ত লোকগুলোকে তাদের অবস্থাতেই ছেড়ে দাও, এরা সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে।"

এমন লোকদের সম্পর্কে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–

"যেহেতু (তারা) তাকওয়ার পথ অনুসরণ করছে না, আল্লাহ্ তা'লার ভয় তাদের হৃদয়ে নেই, এজন্য অনেক সময় অন্যের কথায় বা পরিবেশের প্রভাবে নিজ স্ত্রীর ওপর ঘৃণ্য অপবাদ আরোপ করে অথবা দ্বিতীয় বিয়ের বাসনায়, যা কখনো কখনো অনেকের মনে দানা বাঁধে, অবলীলায় আগের স্ত্রীর ওপর অপবাদ আরোপ করে বসে। কারো যদি বিয়ে করার বাসনা থাকে আর বৈধ প্রয়োজনে বিয়ে করতে হয় তবে করুক কিন্তু বেচারী প্রথম স্ত্রীর দুর্নাম করা উচিত নয়।"

তিনি (আই.) পুনরায় বলেন–

"অনেক সময় অজুহাত-সন্ধানী পুরুষদের পক্ষ থেকে এই অপবাদও দেয়া হয় যে, সে অবাধ্য, কথা শুনে না, আমার পিতামাতার সম্মান করে না, শুধু তা-ই নয় বরং তাদেরকে অসম্মানও করে, আমার ভাইবোনদের সাথে ঝগড়াবিবাদ করে, ছেলেমেয়েদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে উসকে দেয় অথবা বাড়ির বাইরে

নিজের বান্ধবীদেরকে আমাদের ঘরের কথা বলে বেড়ায়, আমাদের দুর্নাম করে– স্মরণ রাখা উচিত, এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধিনিষেধ রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

وَالّٰتِي تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ۔ فَإِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۔ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا۔

(সূরা আন নিসা 4: 35)

আর যেসব স্ত্রীর পক্ষ থেকে তোমরা বিদ্রোহসূলভ আচরণের আশঙ্কা কর প্রথমে তাদের উপদেশ দাও, এরপর বিছানায় তাদেরকে একা ছেড়ে দাও এবং প্রয়োজনে তাদেরকে দৈহিক শাস্তি দাও। অর্থাৎ প্রথম কথা হলো, বুঝাও, যদি না বুঝে এবং চরম মাত্রা ধারণ করে আর আশেপাশে যদি অনেক বেশি দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ে তাহলে কঠোরতার অনুমতি রয়েছে কিন্তু এ বিষয়কে অজুহাত বানিয়ে তুচ্ছ কারণে স্ত্রীর প্রতি নির্যাতন করার বা শাস্তি দেয়ার সময় এমনভাবে আঘাত করার অনুমতি নেই যে, মারতে মারতে আহতও করে ফেলবে। এটি চরম অন্যায় আচরণ।

মহানবী (সা.)-এর এই হাদীসটি সর্বদা সামনে রাখা উচিত; তিনি (সা.) বলেন, কখনো যদি শাস্তি দেয়ার প্রয়োজনও পড়ে তবে শাস্তি এমন হওয়া উচিত যাতে শরীরে কোন দাগ না পড়ে। তুমি আমার সাথে উচ্চ স্বরে কথা বলেছিলে! আমার জন্য কেন রুটি এভাবে বানালে? আমার পিতামাতার সামনে অমুক কথা কেন বলেছিলে? এভাবে কেন কথা বললে? অদ্ভুত সব হীন কথাবার্তা হয়ে থাকে, এসব কারণে প্রহার করার অনুমতি নেই– এগুলো হলো অজুহাত। অতএব আল্লাহ্‌র আদেশের ব্যাখ্যা নিজেদের কামনা বাসনার অধীনে করবেন না আর (একই সাথে) খোদাকে ভয় করুন।

পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমার স্ত্রীর কোন চরম পদক্ষেপের কারণে তাকে তোমার শাস্তি দেয়ার প্রয়োজন পড়েছে কিন্তু তুমি স্মরণ রেখো! এরপর তোমার হৃদয়ে বিদ্বেষ লালন করো না। সে তোমার পূর্ণ অনুগত হয়ে গেলে, তোমার আনুগত্য করলে তার ওপর অত্যাচার করো না।

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔

অতএব তারা যদি তোমাদের আনুগত্য করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করার কোন অধিকার তোমাদের নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতীব উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ও মহা গৌরবান্বিত। (সূরা আন নিসা 4: 35) তোমরা যদি নিজেদেরকে মহিলাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান মনে কর তাহলে স্মরণ রেখো আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের চেয়ে অনেক বড় এবং মহা শক্তিধর ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তোমাদের বিপরীতে মহিলাদের মর্যাদা কিছুটা হলেও রয়েছে, বরং তারা সমমর্যাদা রাখে। কিন্তু খোদা তা'লার বিপরীতে তো তোমাদের কোন গুরুত্বই নেই। তাই আল্লাহকে ভয় কর এবং এমন আচরণ করা থেকে বিরত থাক।

কিছু কিছু পুরুষ এতটা অত্যাচারী ও অনাচারী হয়ে থাকে যে, অত্যন্ত নোংরা অপবাদ আরোপ করে মহিলাদের দুর্নাম করে। অনেক সময় নারীরাও এমনই আচরণ করে। কিন্তু পুরুষদের যেহেতু উপায় উপকরণ বেশি, শক্তি বেশি এবং বাহিরে চলাফেরা বেশি তাই তারা এ থেকে বেশি সুযোগ নেয়। কিন্তু স্মরণ রাখবেন! যারাই লাভবান হওয়ার আত্মপ্রসাদ নিচ্ছে তারা নিজেদের জন্য আগুনের ব্যবস্থা করছে। কাজেই খোদাকে ভয় করুন এবং এ ধরণের কাজ পরিত্যাগ করুন। নির্যাতনের ক্ষেত্রে অনেকে তো এতদূর সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে যে, ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে অন্য দেশে চলেগেছে আবার তারা আহমদী হওয়ার দাবিও করে। হতভাগীনি মা চিৎকার ও আহাজারী করে। মায়ের বিরুদ্ধে অন্যায় অপবাদ আরোপ করে তাকে ছেলেমেয়েদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে। যদিও আমরা দেখেছি পবিত্র কুরআন বলে, হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে অপবাদ আরোপ করো না অথচ এই পুরুষের, এমন পিতার সকল আত্মীয়স্বজন তার সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে। এমন পুরুষ ও তার সহায়তাদাতা আর এমন আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে জামা'তী ব্যবস্থাপনার উচিত তাৎক্ষণিকভাবে পদক্ষেপ নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা।

এখন দেখুন! পবিত্র কুরআনের শিক্ষা কী আর এমন লোকেদের আচার ব্যবহার কেমন? দুঃখ এজন্যে হয় যে, অনেক কর্মকর্তাও অনেক সময় এ

ধরনের পুরুষকে সাহায্য করে থাকে আর কোথাও তাকওয়া অবলম্বন করা হয় না। অতএব এসব অপবাদ, সন্তানদের বিবৃতি এবং ছেলেমেয়েদের সামনে মা সম্পর্কে কটুক্তি যা চরম অসঙ্গত, যা সন্তানদের চরিত্রও ধ্বংস করে থাকে। এমন পুরুষ তার আমিত্বের খাতিরে সন্তানদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করে। এভাবে কতক পুরুষের ধর্মীয় আত্মাভিমান লোপ পায়। এসব ভ্রান্ত কর্মকাণ্ডের জন্য যদি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং জামা'তী ব্যবস্থাপনা থেকে এখরাজ বা বহিষ্কার করা হয় তাহলেও তারা ভ্রুক্ষেপহীন থাকে এবং নিজেদের আমিত্বের পিপাসা নিবারণের জন্য তারা ধর্ম পরিত্যাগ করে।

যাহোক, যেভাবে আমি বলেছিলাম, আসল কাজ হলো অন্যায়ের নিরসন এবং ইনসাফ বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। খিলাফতের আবশ্যিক দায়িত্বাবলীর মাঝে ইনসাফ করা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা একটি গুরুদায়িত্ব। অতএব জামা'তের কর্মকর্তারাও যেন এই দায়িত্ব অনুধাবন করেন। কেননা তারা যে জামা'তী ব্যবস্থাপনার জন্য কাজ করছেন তা যুগ-খলীফার প্রতিনিধিত্বে করছেন। কাজেই ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের সকল দাবি পূর্ণ করা তাদের প্রধান দায়িত্ব। এটি অনেক বড় একটি দায়িত্ব। প্রত্যেকের উচিত আল্লাহ্ তা'লাকে হাযির-নাযির জেনে এই দায়িত্ব পালন করা। সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এবং যুগ-খলীফার কাছে সুপারিশ করার সময় সকল প্রকার সম্পর্কের ঊর্ধ্বে থেকে সুপারিশ করা বাঞ্ছনীয়। কারো আচরণে যদি তাৎক্ষণিকভাবে রাগ হয় তবে দু'দিন অপেক্ষা করে সুপারিশ করা উচিত যেন কোন ধরণের পক্ষপাতমূলক মতামত সামনে না আসে। এছাড়া দুই পক্ষকেও স্মরণ রাখতে হবে যে, অনেক সময় নিজের অধিকার আদায়ের নামে ভুল তথ্য দিয়ে থাকে বরং এভাবে বলা উচিত যে, অবৈধ অধিকার দাবি করে।"

যেভাবে আমি বলেছিলাম, কোন কোন পিতামাতা সন্তানদেরকে অন্য দেশে নিয়ে গিয়েছে অথবা তাদেরকে লুকিয়ে ফেলেছে বা কোর্টে ভুল তথ্য দিয়ে কিংবা ভুল তথ্য প্রদান করিয়ে সন্তানদেরকে ছিনিয়ে নিয়েছে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মাকে যেন তার সন্তানের জন্য কষ্ট দেয়া না হয় আর পিতাকেও যেন তার সন্তানের জন্য কষ্ট দেয়া না হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা যদি তাকওয়ার পথ অনুসরণ না কর আর পরস্পরের প্রাপ্য প্রদান না কর তবে তোমরা স্মরণ রেখো! আল্লাহ্ তা'লা সব বিষয়ে সবিশেষ অবগত আছেন। তিনি জানেনও আর দেখছেনও। আল্লাহ্ অত্যাচারীকে এমনিতেই ছেড়ে দেন

না। অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় করুন এবং সর্বদা যে বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখতে হবে তা হলো আপনার ওপর যেভাবে আপনার মায়ের অধিকার রয়েছে ঠিক একইভাবে আপনার সন্তানদের ওপরও তাদের মায়ের অধিকার রয়েছে। যেভাবে আমি বলেছি এবং বিচার বিশ্লেষণেও উঠে এসেছে, সাধারণত পিতাদের পক্ষ থেকেই এই অন্যায় বেশি হয়ে থাকে। এজন্য আমি পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি যত্নবান হোন। তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করুন। আপনি যদি পুণ্য ও তাকওয়ার পথের পথিক হয়ে থাকেন তবে দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া মোটের ওপর স্ত্রীরা আপনাদের অনুগতই থাকবে। আপনাদের সংসার ভাঙ্গার পরিবর্তে গড়ে উঠবে, যা এর চার পাশের পরিবেশকে সুন্দর দৃশ্য উপহার দেবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার এক সাহাবীকে একটি উপদেশমূলক পত্রে লেখেন যে, "পীড়াদায়ক বিষয় হলো, আপনার কিছু সত্যিকার বন্ধু, যারা সত্যিকার অর্থেই আপনার সাথে আন্তরিকতা ও ভালোবাসা রাখে এবং আপনার প্রতি সুধারণা পোষণ করে, তাদের মুখে শুনেছি যে, পারিবারিক জীবনে স্ত্রী-সন্তানদের সাথে যেমন (আচরণ) করা উচিত (সেই তুলানায়) আপনি কিছুটা কঠোরতা প্রদর্শন করে থাকেন। অর্থাৎ রাগ ও ক্রোধ প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন কোন সময় ভারসাম্য বজায় থাকে না। আমি এই অভিযোগটি বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখি নি। কেননা প্রথমত বর্ণনাকারী আপনার সকল প্রশংসনীয় গুণে বিশ্বাসী এবং আপনার প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা পোষণ করেন আর দ্বিতীয়ত অনাদি অনন্ত বন্টনকারী খোদা নারীর ওপর পুরুষকে একগুণ বেশি ক্ষমতা দিয়ে রাখার কারণে সমান্য সামান্য বিষয়ে শিষ্টাচার শিখানোর উদ্দেশ্যে বা আত্মাভিমানের নামে সে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চায়। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) মহিলাদের সাথে সামাজিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে পরম সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতা প্রদর্শনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন, তাই আমি প্রয়োজন অনুভব করলাম যে, আপনার মত সঠিক পথের পথিক ও পুণ্যবান মানুষকে এই নির্দেশ সম্পর্কে কিছুটা অবগত করি। মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ বলেন–

عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ (সূরা আন নিসা 4:20) অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীর সাথে তোমরা এমনভাবে জীবনযাপন কর যাতে কোন বিষয় ন্যায়সঙ্গত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থি না হয় আর যেন কোন পশুত্ব বা হিংস্রতার বহিঃপ্রকাশ না ঘটে বরং

এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় তাদেরকে তোমরা নিজেদের এক আন্তরিক বন্ধু মনে কর এবং সদ্ভাবে বসবাস কর। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ অর্থাৎ তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তি উত্তম যে স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করে। সুন্দর সামাজিক জীবনযাপনের জন্য এতটা জোর দেয়া হয়েছে যে, আমি এই চিঠিতে তা লিখে শেষ করতে পারব না। হে আমার প্রিয় ভাজন! স্ত্রী এক নিরীহ ও দুর্বল সত্তা যাকে খোদা তা'লা তার হাতে ন্যাস্ত করেছেন আর তিনি দেখেন, প্রতিটি মানুষ তার সাথে কী আচরণ করে। কোমলতা প্রদর্শন করা উচিত আর সব সময় মানসপটে এই ভাবনা ও চেতনা বিরাজমান থাকা উচিত যে, আমার স্ত্রী একজন প্রিয় অতিথিনী, যাকে খোদা আমার হাতে সঁপে দিয়েছেন আর আমি আতিথেয়তার শর্তাবলীর প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল তা তিনি দেখছেন। আমি খোদার একজন দাস এবং সেও খোদার একজন দাসী। তার ওপর আমার কীই-বা প্রাধান্য? মানুষের রক্তপিপাসু হওয়া উচিত নয়। স্ত্রীদের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়া উচিত এবং তাদেরকে ধর্ম শিখানো উচিত। মূলত এটিই আমার বিশ্বাস যে, মানুষের চরিত্র কেমন তা পরীক্ষা করে দেখার প্রথম ক্ষেত্র হলো তার স্ত্রী। যখনই আমি আমার স্ত্রীর সাথে দৈবাৎ সামান্যতম কঠোরতাও করি তখন আমার শরীর এ কথা ভেবে কেঁপে উঠে যে, এক ব্যক্তিকে খোদা শত শত ক্রোশ দূর থেকে আমার হাতে সঁপে দিয়েছেন, আমার পক্ষ থেকে এমন আচরণ হয়ত পাপে পর্যবসিত হবে। তখন আমি তাকে বলি, তুমি তোমার নামাযে আমার জন্য দোয়া কর, এটি যদি খোদা তা'লার সন্তুষ্টির পরিপন্থি হয়ে থাকে তবে তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন; আমার ভয় হয় যে, কোথাও আমরা আবার কোন অন্যায় কাজে না জড়িয়ে পড়ি। সুতরাং আমি আশা করি, আপনিও এমনটি করবেন। আমাদের নেতা ও মনিব রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর স্ত্রীদের সাথে কতইনা নমনীয়তা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করতেন! এর বেশি আর কী লিখব? ওয়াস্সালাম।"

(আল হাকাম, ৯ম খণ্ড, নম্বর-১৩, ১৭ এপ্রিল ১৯০৫, পৃ. ৬)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করে সেই সুন্দর কাজগুলো করার সুযোগ দিন যা তাঁর রসূল (সা.) এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে বলেছেন।

(জুমুআর খুতবা, ১০ নভেম্বর ২০০৬, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টান্যাশনাল, ১ ডিসেম্বর ২০০৬)

এমন সব বিষয় সম্পর্কে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করে হুযূরে আনোয়ার (আই.) বলেছেন–

"কিছু পুরুষ ভ্রান্ত এবং নোংরা অপবাদ দিয়ে স্ত্রীদেরকে ছেড়ে দেয় যা কোন ক্রমেই বৈধ নয়। যারা তাদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করে এমন লোকের মামলা কাযা বা বিচারবিভাগের নেয়াই উচিত নয়। আমীর সাহেবের উচিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এদেরকে সরাসরি এখরাজ বা বহিষ্কারের সুপারিশ করা। বস্তুত কানাডাসহ পশ্চিমা দেশগুলোতে এই নোংরামি মাথাচাড়া দিচ্ছে।"

(জুমুআর খুতবা, ২৪ জুন ২০০৫, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, টরেন্টো, কানাডা; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০৮ জুলাই ২০০৫)

পুরুষদের লোভ-লিপ্সা এবং আত্মসম্মানবোধের অভাব

কোন কোন স্বামীর চারিত্রিক দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করে হুযূর (আই.) জামা'তের সদস্যদের নসীহত করতে গিয়ে বলেন–

"এমন পুরুষও আছেন যাদেরকে আমি বলবো, যাদের মাঝে শিষ্টতার অভাব আছে যারা নিজের স্ত্রীর কাছে বিভিন্ন কিছু দাবি করতে থাকেন অর্থাৎ তুমি পণস্বরূপ যেসব গহনা এনেছ তা আমাকে দিয়ে দাও যেন আমি ব্যবসাবাণিজ্য করতে পারি। অথবা যদি নগদ অর্থ হয়ে থাকে তাহলে বলে, তোমার কাছে যে অর্থ আছে আমাকে দাও যেন আমি ব্যবসাবাণিজ্য করতে পারি। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যদি প্রেম, ভালোবাসা ও মধুর হয়ে থাকে তাহলে পারস্পরিক সমঝোতা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে স্ত্রীরা সচরাচর এগুলো দিয়েও থাকেন। কিন্তু স্ত্রী যদি অবগত থাকে যে, আমার স্বামী অকর্মা তার মাঝে এমন কোন যোগ্যতাই নাই যে, সে ব্যবসাবাণিজ্য করতে পারবে এবং যদি স্ত্রী অনুভব করে যে, কিছুদিন পর আমার নিজের যে মূলধন বা অর্থ ছিল তা-ও চলে যাবে এবং সংসারে এর ফলে অভাব-অনটনের জীবন আরম্ভ হয়ে যাবে এবং সেই আগের অবস্থাতেই ফিরে আসবে। একথা ভেবে যখন স্ত্রী দিতে অস্বীকৃতি জানায় তখনই ঝগড়াবিবাদ বেড়ে যায়। এরপর এও হয় যে, কখনো কখনো অশিষ্টতার সীমাও সামান্য ছাড়িয়ে যায়। একবার যখন মানুষ অসভ্য বা অশোভন হয়ে যায় তখন দাবি করে অর্থাৎ স্ত্রীকে বলা হয়, তোমার বাবা অনেক বিত্তবান, ধনী তাই তার কাছ থেকে আমাকে এত টাকা এনে দাও, যেন আমি ব্যবসাবাণিজ্য করতে পারি। আর এতে ছেলেপক্ষের পরিবার, ভাই,

বোনরাও যোগ দিয়ে তাকে উস্কাতে থাকে যে, তুমি এই টাকা চাও। অতএব এখন মেয়ের শ্বশুরবাড়ির পুরো পরিবারকে লালন-পালন করা যেন মেয়ের দায়িত্ব। এমন লোক যারা এধরনের আচরণ করে তারা সর্বদা তারাই হয়ে থাকে যারা আল্লাহ্ তা'লার সমীপে বিনত হয় না এবং তাঁর ওপর আস্থা রাখে না এবং তাঁর নির্দেশাবলী ও শিক্ষায় আমল করে না। যারা যথাযথভাবে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করে না তাদের মাঝে কখনো তাওয়াক্কুল বা খোদার প্রতি ভরসা সৃষ্টিই হতে পারে না। আর এরপর যেমনটি আমি বলেছি, পারিবারিক জীবনে যখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায় তখন এমন পরিস্থিতেও স্ত্রীদের ওপরই অত্যাচার-নিপিড়ন করা হয় অর্থাৎ পুরুষের দাবি বা চাহিদা যদি পূরণ করা না হয় তাহলে তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়া হয় এবং খুবই কষ্টদায়ক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় আর এমন অবস্থারই উল্লেখ আমি করছি। আল্লাহ্ তা'লা করুণা করুন এবং এমন পরিবারকে সুমতি দান করুন আর বিবেকবুদ্ধি খাটিয়ে জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দিন। প্রতিটি ঘর, প্রত্যেক আহমদী পরিবার প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা ও হৃদ্যতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে এটিই প্রত্যাশা।"

(জুমুআর খুতবা, ১৫ আগস্ট ২০০৩, মসজিদ ফযল, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১০ অক্টোবর ২০০৩)

হুযূর (আই.) অপর এক স্থানে বলেন–

"আমাকে পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে আর এমন ঘটনাবলী শুনে খুবই কষ্ট লাগে, কখনো কখনো মন (একথা ভেবে) অস্থির হয়ে ওঠে যে, আমাদের কিছু লোক কোন্ পথে অগ্রসর হচ্ছে? স্ত্রীর সকল ত্যাগ-তিতিক্ষা ভুলে যায়। এমনকি অনেকে এতটা নীচে নেমে যায় যে, স্ত্রীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে তার ওপর চাপ প্রয়োগ করে তার পিতামাতার কাছ থেকে অর্থ আদায় করে ব্যবসাবাণিজ্য করে অথবা স্ত্রীর অর্থে কেনা বাড়িতে জোরপূর্বক অংশিদার সেজে বসে এবং তাকে লাগাতার হুমকি-ধমকি দিতে থাকে। হতবাক হতে হয় যে, ভালো ভালো সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেরাও কখনো কখনো এমন আচরণ করে। এমন লোকদের উচিত কিছুটা হলেও আল্লাহ্কে ভয় করা এবং নিজেদের সংশোধন করা। অন্যথায় স্পষ্টভাবে জেনে নিন যে, জামা'তের ব্যবস্থাপনার কাছে এমন বিষয় এলে ব্যবস্থাপনা কখনো এমন বাজে লোকদের সমর্থন করে না আর করবেও না।"

তিনি আরো বলেন–

"সেসব পুরুষ, যারা স্ত্রীদের ধনসম্পদের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি রাখে তাদের স্মরণ রাখা উচিত, এই দায়দায়িত্ব (অর্থাৎ ভরণপোষণের দায়িত্ব) তাদের নিজেদের; স্ত্রীর অর্থসম্পদে তাদের কোন অধিকার নেই। স্ত্রী-সন্তানের ব্যয় নির্বাহ করা পুরুষদের নিজেদের দায়িত্ব। তাই অবস্থা যা-ই হোক না কেন দিনমুজরি করে নিজের সংসারের খরচ নির্বাহ করতে হলেও তা করার দায়িত্ব তাদের। তারা যদি পরিশ্রমের পাশাপাশি দোয়াও করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা বরকতও দিয়ে থাকেন এবং স্বচ্ছলতাও দান করেন।"

(জুমুআর খুতবা, ২ জুলাই ২০০৪, কানাডা;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৬ জুলাই ২০০৪)

"এখন আমি কিছু সাধারণ বিষয়ে কথা বলছি। বিচ্ছেদ বা তালাক যদি হয়ে যায় তাহলে কতিপয় লোক এখানকার আইনের আশ্রয় নিয়ে স্ত্রীর অর্থে ক্রয় করা বাড়ির অর্ধেক নিজেদের নামে লিখিয়ে নেয়। আইনের চোখে তারা মালিক হয়ে যায়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে তারা স্পষ্ট পাপাচার করছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা যদি স্ত্রীকে অঢেল সম্পদও দিয়ে থাক তা ফেরত নেবে না– স্ত্রীর সম্পদ হরণ করা তো দূরের কথা।"

(জুমুআর খুতবা, ১০ নভেম্বর ২০০৬, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০১ ডিসেম্বর ২০০৬)

বিবাহের সম্বন্ধ নির্ধারণ করার সময় তাকওয়ার বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) এক জুমুআর খুতবায় বলেন–

"কিছুদিন পূর্বে জনৈক ব্যক্তি আমাকে লিখেছেন, আমার বিবাহ হচ্ছে না, পাকিস্তানের রিশতানাতা বিভাগ কোনো সহযোগিতা করছে না। আমি যখন রিপোর্ট সংগ্রহ করলাম তখন জানতে পারলাম, অনেকগুলো প্রস্তাব তারা দিয়েছেন কিন্তু তার পছন্দ হয় নি। এর কারণ হলো, সে বলেছে, বিবাহ হতে হবে আমার নির্ধারিত শর্তানুযায়ী। এই ব্যক্তি নিজে মেট্রিক পাস, শিক্ষাগত যোগ্যতা সামান্য কিন্তু এ শর্ত দেয় যে, মেয়ে যেন শিক্ষিত হয় অর্থাৎ মেয়েকে মাস্টার্স পাস, চাকরিজীবি ও উপার্জনশীলা হতে হবে। বিয়েতে আমাকে বাড়িও দিতে হবে, দশ-বিশ লাখ নগদ টাকাও আমার হস্তগত হওয়া চাই এবং আমার ব্যয়ভারও বহন করতে হবে। অধিকন্তু শুধু ব্যয়ভারই বহন করবে না বরং আমাকে কাজ করার জন্য শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এবং মেয়ে কিছুই বলতে

পারবে না; আমার যখন ইচ্ছে হবে কাজ করবো, না হলে করবো না। সুতরাং এমন ব্যক্তিকে মানসিক রোগী ছাড়া আর কীই-বা বলা যেতে পারে! এমন প্রস্তাব এবং এমন ছেলেদের প্রতি তো রিশতানাতা বিভাগের ফিরেও তাকানো উচিত ছিল না। (জানিনা তারা কেন তার প্রস্তাব পাঠানো অব্যাহত রেখেছে) কেননা, এমন লোকদের সাথে বোঝাপড়া করতে গিয়ে কোথাও না আবার রিশতানাতা বিভাগের কর্মীরা মানসিক রোগী হয়ে যায়।"

(জুমুআর খুতবা, ১ ডিসেম্বর ২০০৬, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন)

অন্যায় দাবি-দাওয়া

উপরোক্ত খুতবাতেই হুযূর (আই.) উভয়পক্ষের অন্যায় দাবি-দাওয়া সম্পর্কে বলেন–

"আক্ষেপ! মানুষ ভালোর সন্ধান করে অথচ নিজে ভালো কাজ করে না। কোন কোন জায়গায় বাস্তব পরিস্থিতি এমন দেখা যায় যে, বিয়ের সময় কিছুই বলে না এবং কোনশর্তও আরোপ করে না। কিন্তু বিয়ের পর ব্যবহারিক আচরণ এমনই হয়ে যায়, এ মর্মে কারো কারো পক্ষ থেকে অভিযোগ আসে। মেয়ে পক্ষের কাছে তারা অন্যায় চাহিদা বা দাবি-দাওয়া করতে থাকে, মনঃপুত উত্তর না পেলে এবং চাহিদা পূরণ না হলে ঝগড়াবিবাদ ও অশান্তি (সৃষ্টি করে) এবং মেয়েরা খোঁটা-খোঁচা, ইত্যাদির সম্মুখীন হয়।

আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদেরকে কাণ্ডজ্ঞান দান করুন এবং করুণা করুন। অতএব, নিজের প্রাণের প্রতি অবিচারকারী এক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ এমন কথা বলতে পারে না। (কেননা মানুষের বিরুদ্ধে যেভাবে অবিচার করা যায় অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'লার প্রতি কেউ অন্যায় করতে পারে না) অর্থাৎ আল্লাহ্র রবুবিয়্যাতের গুণের কোন জ্ঞানই যে রাখে না, সে জানেই না যে, আমাদের প্রভু আমাদের প্রতি কী কী অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে যেসব নির্দেশনা দিয়েছেন তাতে আমল করে সেসব দোয়া থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে পারি যা আমাদের প্রভু আমাদেরকে শিখিয়েছেন, তাছাড়া নয়। সূরা শোআরার তিন আয়াত সম্বলিত একটি দোয়া আছে, যেখানে শিখানো হয়েছে–

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ۔ وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي
الْاٰخِرِيْنَ ۔ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ۝

অর্থাৎ হে আমার প্রভু! আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে পুণ্যবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে আমার সুখ্যাতি সুনিশ্চিৎ করে দাও এবং আমাকে নেয়ামতসমৃদ্ধ জান্নাতের উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। (সূরা আশ শোআরা 26 : 84-86)

সুতরাং এমন লোক যারা নিজেদের প্রভুকে চিনে না এবং বিবেকবুদ্ধিহীন তাদের কথাবার্তা শুনে সে দোয়াই করি যা আমাদের জন্য হযরত ইব্রাহীম (আ.) করেছিলেন। অতএব আমাদেরকে সর্বদা আমাদের প্রভুর কাছে জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং সঠিক বিষয় অবলম্বনের এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য দোয়া করা উচিত। একই সাথে সৎকর্ম করার প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত, যা করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বারবার নসীহত করেছেন।"

(জুমুআর খুতবা, ০১ ডিসেম্বর ২০০৬, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন)

২০০৪ সনে যুক্তরাজ্য জামা'তের সালানা জলসায় হুযূর আনোয়ার (আই.) মহিলাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিতে গিয়ে সূরা নিসার ২০ নম্বর আয়াত পাঠ করেন এবং অনুবাদ করার পর এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন–

"আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিচ্ছেন যে, মহিলাদের সাথে সদাচরণ কর; যাদেরকে তোমরা অন্য পরিবার থেকে বিয়ে করে এনেছ। তাদেরকে আত্মীয়স্বজন, মা-বাবা এবং ভাইবোন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছ, তাদেরকে অযথা নির্যাতন করো না, তাদের অধিকার প্রদান কর এবং তাদের প্রাপ্য না দেয়ার অজুহাত খুঁজো না। অপবাদ আরোপের সুযোগ সন্ধান করো না। এই অপচেষ্টায়ও লেগে থেকো না যে, স্ত্রীর সম্পদ থাকলে কীভাবে তা থেকে সুবিধা ভোগ করা যায়। এই সুবিধাও কয়েকভাবে ভোগ করা যায়। একটি হলো বাহ্যিক ধনসম্পদ, যা দৃশ্যমান। কোন কোন পুরুষ স্ত্রীকে এতটাই জ্বালাতন বা নির্যাতন করে যে, এর ফলে কোন কোন সময় স্ত্রী এমন কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে যায় যার কারণে তার কোন চেতনাই থাকে না আর এই সুযোগে স্ত্রীর সম্পদ থেকে স্বামী সুবিধা ভোগ করতে থাকে। আবার কখনো কখনো স্বামী-স্ত্রীর বনিবনা হয় না; তখন স্বামী এই চেষ্টায় থাকে যে, স্ত্রী যেন 'খোলা' নিয়ে নেয় আর স্বামীকে যেন তালাকও দিতে না হয় এবং 'মোহরানা'ও পরিশোধ করতে না হয়। এটাও আর্থিক সুবিধা ভোগের একটি পন্থা। এরপর বিবাহিত অসহায় নারীদের ওপর দীর্ঘদিন যাবৎ নির্যাতন

চালাতে থাকে, অথচ মোহরানা স্ত্রীর অধিকার। আল্লাহ তা'লা বলেন, এমন আচরণ কোনভাবেই বৈধ নয়। আবার কখনো কখনো জোরপূর্বক বা প্রতারণামূলকভাবে স্ত্রীর সম্পত্তি কুক্ষিগত করে। যেমন, স্ত্রীর অর্থ দ্বারা বাড়ি ক্রয় করে এবং কোনভাবে স্ত্রীকে মানিয়ে নেয় যে, এটি আমার নামে দিয়ে দাও বা এর কিছু অংশ আমার নামে লিখে দাও। এভাবে অর্ধেকাংশের মালিক বনে বসে আর মালিকানা স্বত্ব লাভের পর আবার নির্যাতন করা আরম্ভ করে দেয়। আবার এটিও হয় যে, কখনো কখনো পৃথক হয়ে বা তালাক দিয়ে বাড়ির অংশ নিয়ে নেয়। অথবা কেউ কেউ ঘরে বসে থাকে আর স্ত্রীর উপার্জনে চলে। তিনি বলেন, এমন সব পুরুষই অবৈধ কাজ করছে। কখনো কখনো এমনও হয় যে, স্বামী মারা গেলে তার আত্মীয়স্বজন বা শ্বশুড় বাড়ির লোকেরা সম্পত্তি দখল করে নেয় এবং অসহায় স্ত্রী কোন কিছুই পায় না আর তাকে ধাক্কা দিয়ে মা-বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। মোটকথা এগুলো সবই জঘন্য অন্যায় কাজ, অবৈধ কাজ। ইসলাম আমাদেরকে বলছে যে, স্ত্রীর সাথে এমন আচরণ করো না। এখন বলুন, নারীর অধিকারের প্রতি এত গভীরে গিয়ে যত্নবান হওয়ার বিষয়টি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম থেকে প্রমাণিত হয় কি? ইসলামই সেই ধর্ম যা নারীর অধিকার প্রদান করিয়েছে।"

(যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৩১ জুলাই ২০০৪;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৪ এপ্রিল ২০১৫)

এ বিষয়ে হুযূর (আই.) বলেন–

"প্রত্যেক বিবাহিত পুরুষ নিজ পরিবার পরিজনের তত্ত্বাবধায়ক। তাদের চাহিদার প্রতি যত্নবান থাকা তার কর্তব্য। পুরুষদেরকে 'কাওয়াম' তথা অভিভাবক বানানো হয়েছে। সংসারের ব্যয়ভার বহন করা, সন্তানাদির শিক্ষাদীক্ষার প্রতি খেয়াল রাখা, তাদের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল চাহিদা এবং ব্যয় নির্বাহ করা– এর সবই পুরুষের দায়িত্ব। কিন্তু আক্ষেপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, এই জামা'তেও কিছু এমন লোক আছে যারা সংসারের ব্যয়ভার বহন বা উপার্জন করা তো দূরের কথা উপরন্তু স্ত্রীর কাছে হাত পাতে আর বলে, আমাদের খরচ নির্বাহ কর; অথচ স্ত্রীর উপার্জনে তার কোন অধিকার নেই। কোন কোন ব্যয়ভার স্ত্রী যদি নির্বাহ করে থাকে তবে তা হলো পুরুষের প্রতি স্ত্রীর অনুগ্রহ।"

(জুমুআর খুতবা, ৫ মার্চ ২০০৪, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৯ মার্চ ২০০৪)

স্ত্রীর সম্পদ ও সম্পত্তির প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি

কতক পুরুষের লোভ করা সম্পর্কে হুযূর (আই.) তাঁর এক খুতবায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন–

"আমাকে অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, কানাডায় বিয়ে-শাদির পর খুব স্বল্প সময়ের ভেতর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে তিক্ততার ঘটনা ঘটছে অথবা এজন্যও বিয়ে ভেঙ্গে যায় যে, পাকিস্তান থেকে আগত কোন ছেলে বিদেশে আসার জন্য বিয়েতে সম্মতি দেয় আর এখানে এসে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায়। এমন লোকদের কি সামান্য ভয়ও হয় না? এসব ছেলের কিছুটা হলেও খোদাকে ভয় করা উচিত। যাদের সাথে আপনাদের বিয়ে ঠিক হয়েছে তারা আপনার প্রতি অনুগ্রহ করেছে অর্থাৎ আপনাদেরকে বিদেশে আসার সুযোগ করে দিয়েছে। আপনাদের শিক্ষাগত কোন যোগ্যতা ছিল না। কোন এজেন্ট বা দালালের মাধ্যমে এলে পনেরো বা বিশ লক্ষ টাকা খরচ হতো। বিনা খরচে এখানে এসে গেছেন। কেননা এখানে আগত অধিকাংশ ছেলে টিকিটের টাকাও মেয়েপক্ষের কাছ থেকে আদায় করে থাকে; কিন্তু এখানে এসে এ ধরনের চতুরতা প্রদর্শন করে! এখানে এসে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নিজের পছন্দের কোন সম্বন্ধ খুঁজে নেয় বা কোন কোন সম্বন্ধ পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়ে যায় এবং কেউ কেউ অন্যান্য বাজে কাজে জড়িয়ে যায়; অধিকন্তু এমন ছেলেদের পিতামাতারাও তাদের অপকর্মের অংশীদার হয়ে থাকে। তারা এখানে বসবাসকারীই হোন বা পাকিস্তানে বসবাসকারী পিতামাতাই হোন না কেন।"

তিনি (আই.) আরো বলেন–

"এ ছাড়া কোন কোন ছেলের চোখ স্ত্রীদের সম্পত্তির ওপর থাকে। সন্তানসন্ততিও হয়ে যায়, কোথায় বাচ্চাদের খাতিরে ত্যাগ স্বীকার করবে! কিন্তু তা না করে আইনের সুযোগ নিয়ে স্ত্রীদের তালাক দিয়ে সম্পত্তি আত্মসাৎ করে আর নির্বুদ্ধিতা বশত স্ত্রী যদি সম্পত্তি দুজনের নামে করে দেয়, তাহলে সম্পত্তির সুবিধা ভোগ করে এবং এরপর স্ত্রী-সন্তানদেরকে ছেড়ে চলে যায়।"

(জুমুআর খুতবা, ২৪ জুন ২০০৫, কানাডা;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৮ জুলাই ২০০৫)

একই প্রসঙ্গে অপর এক স্থানে হুযূর (আই.) বলেন–

বিবাহিত পুরুষদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা রয়েছে যারা পাকিস্তান, ভারত প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বিয়ে করে এসব দেশে আসে এবং এখানে এসে

কাগজপত্র যখন পাকাপোক্ত হয়ে যায় তখন স্ত্রীদের সাথে না থাকার বা স্ত্রীকে ছেড়ে দেয়ার বিভিন্ন অজুহাত সন্ধান করা আরম্ভ করে এবং তার ওপর নির্যাতন ও নিপীড়ন শুরু করে দেয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

অর্থাৎ তাদের সাথে সদাচরণপূর্ণ জীবনযাপন কর। তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ করে থাক, তাহলে হতে পারে তোমরা একটি জিনিসকে অপছন্দ করছ আর আল্লাহ্ তাতে তোমাদের জন্য প্রভূত কল্যাণ রেখে দিয়েছেন। (সূরা আন্ নিসা 4 :20) অতএব, বিয়ে যখন হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে ভদ্রতার দাবি হলো, একে অপরকে সহ্য করুন, ব্যবহার ভালো করুন, পরস্পরকে বুঝার চেষ্টা করুন এবং আল্লাহ্ তা'লার তাকওয়া অবলম্বন করুন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আল্লাহ্র নির্দেশ মেনে তোমরা যদি একে অন্যের সাথে ভালো ব্যবহার কর তাহলে বাহ্যিক অপছন্দ পছন্দে পরিবর্তিত হতে পারে এবং তোমরা এই স ম্পর্কের মাধ্যমে অনেক কল্যাণ ও মঙ্গলের ভাগীদার হতে পার। কেননা তোমরা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখ না, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন এবং তিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। তিনি তোমাদের জন্য এতে মঙ্গল ও কল্যাণ রেখে দেবেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন–
একবার আমি এক ছেলে সম্পর্কে জানতে পারলাম, স্ত্রীর সাথে তার ব্যবহার ভালো নয় বরং সে খুবই দুর্ব্যবহার করে। তিনি বলেন, একদিন তার সাথে আমার পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হয়ে গেল আর আমি তাকে এই আয়াতের আলোকে বুঝালাম। সে সেখান থেকে সোজা তার ঘরে গেল এবং তার স্ত্রীকে বলল, তুমি কি জান, আমি তোমার সাথে শত্রুর মত আচরণ করেছি? কিন্তু হযরত মওলানা নূরুদ্দীন সাহেব (রা.) আজ আমার চোখ খুলে দিয়েছেন, এখন থেকে আমি তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করব।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) আরো বলেন–
এরপর থেকে আল্লাহ্ তা'লা তাকে কল্যাণের পর কল্যাণে ভূষিত করেছেন এবং তার ঘরে সুদর্শন চার পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে এবং তারা সুখে-

শান্তিতে জীবন কাটিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টায় যদি তাঁর নির্দেশ মেনে চল তাহলে আল্লাহ্ তা'লা এসব কল্যাণ দান করেন।

অতএব যেসব ছেলে পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে এখানে এসে কিছুদিন পর এই বলে নিজেদের স্ত্রীদের ছেড়ে দেয় যে, আমাদের পছন্দ হয় নি বা কোন কোন ছেলে পাকিস্তান থেকে পিতামাতার কথা অনুযায়ী মেয়ে নিয়ে আসে এবং পরে বলে দেয় যে, আমাদের পছন্দ হয় নি, পিতামাতার কথায় বাধ্য হয়ে বিয়ে করেছিলাম; তাদের উচিত একটু আত্মবিশ্লেষণ করা। যেমনটি আমি বলেছি, যেসব ছেলের কারণে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয় তারা দুই ধরনের। প্রথমত এখানে বসবাসকারী ছেলেরা, যারা মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে আসে এবং ভাবে যে, কিছুদিন দেখি মন-মতের মিল হয় কি-না। কেননা এখানকার পরিবেশে এই চিন্তাধারাই সৃষ্টি হয়ে গেছে যে, প্রথমে দেখি দু'জনের মতের মিল হয় কিনা। যদি মিল না হয় তাহলে ধাক্কা মেরে ঘর থেকে বের করে দাও। অধিকন্তু এসব লোক যথাসময়ে নিজেদের বিয়ের নিবন্ধনও করায় না পাছে মেয়ের আইনানুগ নিরাপত্তা লাভ হয়ে যায় আর যেন এখানে থেকে তাদের বিরুদ্ধে কোন আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারে। এসব ক্ষেত্রে পিতামাতারাও সমভাবে দোষী। যাহোক, এরপর জামা'ত এমন মেয়েদের দেখাশোনার চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের এহেন কর্ম এটিই প্রকাশ করে যে, এরা কোনভাবেই জামা'তভুক্ত থাকার অধিকার রাখে না।

দ্বিতীয় ধরনের ছেলে হচ্ছে তারা, যারা বহির্বিশ্ব থেকে এসে এখানকার মেয়েদেরকে বিয়ে করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে বিয়ে নিবন্ধনের চেষ্টা করে এবং যখন বিয়ের নিবন্ধন সম্পন্ন হয়ে যায় এবং তাদের ভিসা প্রভৃতি সম্পন্ন হয়ে যায় তখন তাদের চোখে মেয়েদের বিভিন্ন দোষত্রুটি ধরা পড়তে থাকে আর এরপর পৃথক হয়ে নিজেদের পছন্দ অনুসারে আবার বিয়ে করে নেয়।

অতএব এই দুই ধরনের লোকই তাকওয়া থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছে। আপনারা নিজেদের প্রাণের প্রতি অবিচার করবেন না, জামা'তকে দুর্নাম করার চেষ্টা করবেন না আর তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকুন, তাকওয়ার পথে চলুন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এমন দুরাচারীদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তাদের ওপরও এক পরাক্রমশালী সত্তা রয়েছেন, যিনি অনেক ক্ষমতাবান।

(জুমুআর খুতুবা, ১০ নভেম্বর ২০০৬, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০১ ডিসেম্বর ২০০৬)

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর বাণী

"বিবাহিত প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ পরিবার পরিজনের তত্ত্বাবধায়ক। তাদের চাহিদার প্রতি যত্নবান থাকা তার কর্তব্য। স্বামীদেরকে 'কাওয়াম' তথা অভিভাবক বানানো হয়েছে। সংসারের ব্যয়ভার বহন করা, সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি খেয়াল রাখা, তাদের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল চাহিদা এবং ব্যয়ভার ইত্যাদি নির্বাহ করা পুরুষের দায়িত্ব।"

(জুমুআর খুতবা, ৫ মার্চ ২০০৪, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৯ মার্চ ২০০৪)

মোহরানার গুরুত্ব

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা এবং মোহরানা আদায়

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার বিষয়ে ইসলামী যে শিক্ষা, তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে হুযূর আনোয়ার (আই.) জুমুআর এক খুতবায় বলেন–

"দৈনন্দিন সাধারণ বিষয়েও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হয়ে থাকে আর কোন কোন সময় তা ভয়াবহ ঝগড়াবিবাদে পর্যবসিত হয়। কলহ-বিবাদের পর যদি মীমাংসার কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তখন উভয়পক্ষের মাঝে চুক্তি সম্পাদিত হয় আর মীমাংসাকারী প্রতিষ্ঠান যখন উভয়পক্ষের মাঝে সমঝোতা করিয়ে দেন তখন সেখানে মীমাংসা হয়ে যায়। উভয়পক্ষ অঙ্গীকার করে যে, সবকিছু ঠিক থাকবে, কখনো কখনো লিখিত চুক্তিও হয়ে যায়। কিন্তু কোন কোন সময় এমনও হয় যে, সমঝোতা করে অফিস বা আদালত থেকে বাইরে বের হতেই আবার মাথা ফাটা-ফাটি শুরু হয়ে যায়, অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য বা সম্মানই থাকে না। বিয়ে এবং দ্বিপাক্ষিক বিষয়াদীর ক্ষেত্রেও অঙ্গীকার রক্ষা করা হয় না।

পারস্পরিক এই অঙ্গীকার আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে তাকওয়ার শর্তসমূহে প্রতিষ্ঠিত থাকার শর্তে জনসমক্ষে করা হয় কিন্তু কিছু এমন স্বভাবের লোকও আছে যারা এরও পরোয়া করে না। স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার দেয় না আর তাদের ওপর নির্যাতন ও নিপীড়ন করতে থাকে। স্বচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও সংসার-খরচ মেটাতে কৃপনতা করে। স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ করে না। অথচ বিয়ের সময় অত্যন্ত গর্বের সাথে দাঁড়িয়ে সবার সামনে ঘোষণা দেয় যে, হ্যাঁ! আমি এই মোহরানায় বিয়েতে সম্মত আছি।

এখন জানি না এমন লোকেরা লোক দেখানোর জন্য মোহরানায় সম্মতি প্রকাশ করে নাকি পূর্ব হতেই মনে এই দুরভিসন্ধি থাকে যে, মোহরানা যা-ই নির্ধারণ করা হচ্ছে লিখিয়ে নাও, তা তো আর দিচ্ছি না। এ ধরনের লোকদের এই হাদীস দৃষ্টিপটে রাখা উচিত, অর্থাৎ মহানবী (সা.) বলেছেন, **যারা এমন মনোবৃত্তি বা দুরভিসন্ধি নিয়ে মোহরানা ধার্য করে তারা ব্যভিচারী।**

আল্লাহ্ কৃপা করুন, আমাদের মাঝে শতকরা একভাগের নীচেও যদি এমন

লোক থেকে থাকে, হাজারে একজনও যদি এমন থেকে থাকে তাহলেও আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত। কেননা, পুরনো আহমদীদের শিক্ষাদীক্ষার মান যদি উন্নত হয় তাহলে নতুন আহমদীদেরও সঠিক তরবিয়তের সম্ভাবনা থাকে। তাই এসব বিষয়ে গভীর দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

(জুমুআর খুতবা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১২ মার্চ ২০০৪)

অপর এক স্থানে হুযূর (আই.) মোহরানা আদায়ের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন–

"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিয়ে করার জন্য মোহরানা ধার্য করে কিন্তু অভিসন্ধি থাকে যে পরিশোধ করবে না তাহলে সে ব্যভিচারী এবং যে ব্যক্তি পরিশোধ না করার মনমানসিকতা নিয়ে ঋণ করে– আমি তাকে চোর গণ্য করি।"

(মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩১)

এখন চিন্তা করে দেখুন, "মোহরানা পরিশোধ করা একজন পুরুষের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। নিয়্যতেই যদি ত্রুটি থাকে তাহলে এটি খিয়ানত বা চুরি।"

(জুমুআর খুতবা, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৪, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন)
(খুতবাতে মাসরূর, দ্বিতীয় খন্ড,পৃঃ ১১১, এডিশন-২০০৫, নাযারত এশায়াত রাবওয়া)

হুযূর (আই.) মোহরানা আদায় করা প্রসঙ্গে আরো বলেন–

"কখনো কখনো অন্যের কথায় প্রভাবিত হয়ে বা দ্বিতীয় বিয়ের আকাঙ্খায়, যা কারো কারো মনে সৃষ্টি হয়, অনায়াশে প্রথম স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আরোপ করতে থাকে। কারো যদি বিয়ে করার ইচ্ছা থাকে আর বৈধ প্রয়োজন থাকে তাহলে সে বিয়ে করবে কিন্তু অসহায় প্রথম স্ত্রীর দুর্নাম করা উচিত নয়। স্ত্রীকে এড়ানোর জন্য যদি (এমনটি) করে থাকে (অর্থাৎ মনে মনে ভাবে) আমি যদি এ ধরণের কথা বলি তাহলে সে নিজে থেকেই 'খোলা' নিয়ে চলে যাবে (অর্থাৎ মোহরানা যদি পরিশোধ না করে থাকে) আর আমি মোহরানা না দিয়েই পার পেয়ে যাবো! এটিও খুবই হীন বা জঘন্য কাজ। প্রথমত এমন পরিস্থিতিতে খোলা হলে কাযা (বা বিচার বিভাগের) অধিকার রয়েছে মোহরানা পরিশোধের সিদ্ধান্ত দেয়ার। দ্বিতীয়ত এখানকার আইনানুযায়ীও কোন কোন খরচ বহন করার বিধান রয়েছে।"

(জুমুআর খুতবা, ১০ নভেম্বর ২০০৬, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১ ডিসেম্বর ২০০৬)

মোহরানা-সংশ্লিষ্ট স্ত্রীর অধিকার

২০১১ সনে হুযূর আনোয়ার (আই.) জলসা সালানা জার্মানিতে মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন–

"আমরা তো আর মোহরানা নিচ্ছি না! আমরা মোহরানা ছেড়ে দিয়েছি! -এ ধরণের মন-মানসিকতা নিয়ে কোন কোন ছেলের কাছ থেকে বড় অঙ্কের মোহরানা লেখানো হয়। যদি মোহরানা গ্রহণ না করা হয় তবে সেটিও মিথ্যাচার। মোহরানা এজন্যই নির্ধারণ করা হয়, যেন স্ত্রী তা গ্রহণ করে এবং এটি নারীর অধিকার, এটি তার নেয়া উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এক সাহাবী একবার বললেন–

আমার স্ত্রী মোহরানা ফেরত দিয়ে দিয়েছে, ক্ষমা করে দিয়েছে। তিনি (আ.) বললেন, তুমি গিয়ে তোমার স্ত্রীর হাতে মোহরানার অর্থ দাও। এরপর যদি সে তা ফিরিয়ে দেয় তাহলে মোহরানা মাফ হবে, নইলে নয়। বেচারার দুই স্ত্রী ছিল। যাহোক ঋণ নিয়ে তিনি যখন উভয় স্ত্রীর হাতে সমপরিমাণ মোহরানার অর্থ তুলে দেন এবং বললেন যে, এখন ফেরত দাও তোমরা তো পূর্বেই মাফ করে দিয়েছ। তখন তারা বলল, আমরা তো এজন্য মাফ করে দিয়েছিলাম যে, আমাদের ধারণা ছিল, তোমার দেয়ার ক্ষমতা নেই আর তুমি কখনো দিবেও না। এখন যেহেতু দিয়ে দিয়েছ তাই এখন যাও। অতঃপর তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আসলেন, সব শুনে তিনি অনেক হাসলেন এবং বললেন, ঠিক হয়েছে, এমনই হওয়া উচিত ছিল।"

(জুমুআর খুতবা, ২৪ জুলাই ১৯২৫; খুতবাতে মাহমুদ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২১৭)

মোহরানার গুরুত্ব সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন–

"অতএব 'মোহরানা নির্ধারণ' হয়ে থাকে গ্রহণ করার জন্যই মাফ করে দেয়ার জন্য নয়, এটি গ্রহণ করাটাই নারীর অধিকার। যারা একান্তই মাফ করতে চান তারা প্রথমে বলুন যে, মোহরানার টাকা আমাদের হাতে দাও আর এরপর যদি মন এত বড় হয়, এতই যদি উদার হয়ে থাকেন, তাহলে ফেরত দিয়ে দিন।

যাহোক, মোহরানার পরিমাণ যদি বেশি ধার্য করা হয় আর এরপর যখন 'খোলা' বা তালাকের সিদ্ধান্ত হয় তখন কাযা বা বিচার বিভাগের মোহরানা পুনঃনির্ধারণ করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে, অর্থাৎ যদি কারো সামর্থ্য না থাকে আর অন্যায়ভাবে মোহরানা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে তাহলে; আর এমন ঘটনা ঘটেও থাকে। অনেকে এমনও আছে যারা আদালতের আশ্রয় নিয়ে নিজেদের

স্বার্থসিদ্ধি করে নেয় আর ছেলেমেয়ে উভয়ই এতে জড়িত আর পরবর্তীতে তারা বলে, শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের এই অধিকার ছিল; এরপর তারা আবার জামা'তেরও শরণাপন্ন হয়। যদি শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেই অধিকার থেকে থাকে তাহলে আইনী অধিকার নেয়ার পরিবর্তে শরীয়তসম্মত অধিকার নাও। প্রাপ্য অধিকার কখনো কখনো দেশীয় আইনে শরীয়তসম্পন্ন অধিকারের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। তাই অধিকার যেকোন এক দিক থেকেই গ্রহণ করা উচিত। অন্যায় করা উচিত নয়। কোন এক পক্ষের ওপর অবিচার করা উচিত নয়। ছেলের প্রতিও নয় আর মেয়ের প্রতিও নয়। পরিতাপ! এজন্য মিথ্যার আশ্রয়ও নেয়া হয়ে থাকে। সুতরাং এগুলো এমন অপছন্দনীয় কাজ যা দেখে একজন ভদ্র ও সভ্য মানুষ এটিকে ঘৃণা না করে পারে না।"

(জলসা সালানা জার্মানি, মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৫ জুন ২০১১;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৩ এপ্রিল ২০১২)

তালাকের ক্ষেত্রে সৃষ্ট ঝগড়াবিবাদের পরিস্থিতিতে মোহরানা পরিশোধ করা সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন–

"এমনও কোন কোন দাম্পত্য কলহ সামনে আসে, যেক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে যে, আমি তোমাকে ছাড়বোও না, তালাকও দিবো না আর তোমার সাথে সংসারও করবো না। কাযা বা বিচারিক আদালতে যদি এমন মোকদ্দমা থাকে তাহলে অযথাই মোকদ্দমাকে প্রলম্বিত করা হয়। এমন সব অজুহাত ও বাহানা খুঁজা হয় যার ফলে মামলা দিনের পর দিন ঝুলে থাকে। আমি এর আগেও অনেকবার একথা বলেছি, অনেককে এ কারণে তালাক দেয়া হয় না, যাতে স্ত্রী নিজ থেকেই 'খোলা' নিয়ে নেয় আর যাতে মোহরানা আদায় করা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় অর্থাৎ যাতে মোহরানা আদায় করতে না হয়। সুতরাং এসব এমনই বিষয়, যা মানুষকে তাকওয়া থেকে দূরে ঠেলে দেয়ার কারণ হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, নিজেদের সংশোধন কর, তোমরা যদি নিজেদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার করুণা ও ক্ষমার আকাঙ্খী হয়ে থাক তাহলে নিজেরাও করুণা প্রদর্শন কর এবং স্ত্রীকে তার প্রাপ্য অধিকার দিয়ে ঘরেই তাকে সুখ শান্তিতে রাখ। আল্লাহ্ তা'লার ব্যাপক করুণা থেকে যদি অংশ লাভ করতে চাও তাহলে নিজের মায়ামমতার গণ্ডিকেও সম্প্রসারিত কর।"

তিনি আরো বলেন–

"আমি এখনই তালাকের কথা বলছিলাম যে, অনেক পুরুষ তালাকের

মামলাকে ঝুলিয়ে রাখে এবং দীর্ঘসূত্রিতার মাঝে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করতে থাকে। প্রথম কথা হলো, বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর কিছুদিন স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করে, আর কখনো কখনো সন্তানাদিও হয়ে যায় এরপর তালাকের পালা এসে যায়। স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার কী তা স্পষ্ট আর তা প্রদান করা পুরুষের আবশ্যিক কর্তব্য। এছাড়া সন্তানদের খরচাদি, মোহরানা ইত্যাদিও রয়েছে। অনেক সময় এমন পরিস্থিতিরও উদ্ভব হয় যে, মেয়ে স্বামীর বাড়ি যায় নি বা মোহরানাও নির্ধারিত হয় নি; সেক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'লা বলেন, নারীর অধিকার আদায় কর। সূরা বাকারায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ۝

অর্থাৎ তোমাদের কোন পাপ হবে না যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও অথবা এমন অবস্থায় যখন তাদের জন্য দেনমোহর ধার্য কর নি। আর তোমরা তাদের কিছুটা উপকার সাধন কর, বিত্তবানের ওপরও তার সামর্থ অনুযায়ী আবশ্যক এবং বিত্তহীণের ওপর তার সাধ্যানুযায়ী অর্থাৎ ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের উপকার সাধন করা আবশ্যিক। সৎকর্মশীলদের জন্য এটি অবশ্য কর্তব্য। (সূরা আল বাকারা 2 : 237)

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, স্বামীর পক্ষ থেকে যদি সম্বন্ধ না রাখার প্রশ্ন উঠে, এর কারণ যা-ই হোক না কেন, পুরুষের কর্তব্য হচ্ছে, এই বিবাহ বন্ধনের ইতি টানার সময় স্ত্রীর প্রতি দয়ার্দ্র আচরণ করা এবং নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীকে প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা। আল্লাহ্ তা'লা যদি স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে থাকেন তাহলে পুরুষের প্রতি নির্দেশ হলো, সেই ঐশ্বর্য্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটাও। যদি ঐশ্বর্য্যের বহিঃপ্রকাশ না কর তাহলে যে আল্লাহ্ তোমাকে স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছেন তিনি তা প্রত্যাহার করারও ক্ষমতা রাখেন। স্বচ্ছলতা তিনিই দান করেছেন, যদি প্রাপ্য অধিকার প্রদান না কর এবং সুন্দর ব্যবহার না কর তাহলে তিনি স্বচ্ছলতাকে অস্বচ্ছলাতায় পরিবর্তনের ক্ষমতাও রাখেন। তাই যদি আল্লাহ্ তা'লার কৃপাভাজন হতে চাও তাহলে স্ত্রীর সাথে সদয় আচরণ করে নিজের স্বচ্ছলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাও। আর যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা কারো

প্রতি তার শক্তি ও সামর্থ্যের ঊর্ধ্বে বোঝা অর্পণ করেন না তাই তিনি বলেছেন, দরিদ্র ব্যক্তি যদি বেশি দেয়ার সামর্থ্য না রাখে তাহলে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী যতটুকু প্রাপ্য প্রদান করতে পারে করবে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা যদি সৎকর্ম-পরায়ন ও তাকওয়াশীল হয়ে থাক তাহলে এই অনুগ্রহ করা তোমাদের জন্য অবশ্যকর্তব্য।

এ বিষয়ে মহানবী (সা.) কতটা কড়াকড়ি আরোপ করেছেন তা স্পষ্ট হয় একটি হাদীস হতে। একবার এক আনসারী বিয়ে করেন এবং এরপর সেই নারীকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দিয়ে দেন এবং তার দেনমোহরও ধার্য করা হয় নি। এই বিষয়টি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উত্থাপিত হলে তিনি (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তাকে অনুগ্রহ করে কিছু দিয়েছ? উত্তরে সেই সাহাবী নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার কাছে তো তাকে দেয়ার মত কিছুই নেই। তখন তিনি (সা.) বললেন, তোমার কাছে যদি দেয়ার মত কিছুই না থাকে তাহলে তোমার পড়ে থাকা টুপিটিই তাকে দিয়ে দাও।

(রূহুল মাআনী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪৫-৭৪৬, তফসীর সূরা বাকারা, আয়াত নম্বর ২৩৭)

এ থেকে স্পষ্ট হয়, মহানবী (সা.) নারীর অধিকারের বিষয়ে কত জোর দিয়েছেন আর কতবেশি যত্নবান ছিলেন! এঘটনায় (তিনি বলেন) দেনমোহর ধার্য না হলেও কিছু না কিছু অবশ্যই দাও। কিন্তু দেনমোহর যদি পূর্বেই ধার্য করা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কী করতে হবে? পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়েরও স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে অর্থাৎ দেনমোহর যদি ধার্য করা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এর অর্ধেকাংশ পরিশোধ কর।"

(জুমুআর খুতবা, ১৫ মে ২০০৯; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৫ জুন ২০০৯)

সম্পর্ক-বন্ধনে তিক্ততা সৃষ্টির কতিপয় কারণ

অপছন্দের বা অসম্মতির বিয়ে

যেসব বিয়ে বাধ্য হয়ে করা হয়, পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে এর কোন কোনটি তিক্ততায় পর্যবসিত হয়। এ প্রসঙ্গে হুযূর (আই.) বলেন–

"অনেক মেয়ে পিতামাতার কথায় বিয়ে করে ফেলে। প্রথমে সত্য বা ন্যায়সঙ্গত কথা বলার সাহস পায় না। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর এমন কিছু আচরণ সামনে আসে যার ফলে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে আস্থা কমে যায় আর ঝগড়াবিবাদ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কখনো কখনো বিয়ে করে পাকিস্তান থেকে চলে আসে, জামা'তী ব্যবস্থাপনার অধীনে খোঁজখবর নেয়া হয় না বা রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয় না; কিন্তু পরে বলা হয় যে, জামা'ত আমাদের সাথে কোন সহযোগিতা করে নি। এখানে বসবাসকারী কিছু ছেলে বিয়ে করে মেয়েদেরকে আনিয়ে নেয় এবং তাদের ওপর নির্যাতন নিপীড়ন করে আর এরপর সম্পর্কটি বিচ্ছেদ বা তালাকের পর্যায়ে গড়ায়। সুতরাং উভয় পক্ষ থেকেই এমন এক ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটছে যে বিষয়ে জামা'তের চিন্তা করা উচিত।

বিয়ের পর মেয়েরা অনেক সময় বলে বসে, আমার এই সম্বন্ধ পছন্দ নয়। পিতামাতা বলেছিলেন তাই বাধ্য হয়েছিলাম। কোন কোন ছেলেও বিয়ের পর এমন কথা বলে। ছেলেদের মধ্যেও এতটুকু সৎসাহস নেই। অনেক সময় পরে জানা যায় যে, ছেলে বা মেয়ে অন্য কারো সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে গিয়েছিল বা অন্য কাউকে পছন্দ করে।

প্রথমেই যদি এরা নিজেদের পছন্দের কথা জানিয়ে দিত তাহলে এভাবে দুটি পরিবারের শান্তি বিনষ্ট হতো না। অধিকন্তু এমন ঘটনাও রয়েছে যেখানে পিতামাতা পূর্ব থেকেই পরিস্থিতি অবগত থাকেন, তবুও এ ধারণায় বিয়ে করিয়ে দেন যে, বিয়ের পরে সব ঠিক হয়ে যাবে– অথচ এমনটি হয় না। ছেলে হোক বা মেয়ে, তারা শুধরায় না, কিন্তু দু'জনের মাঝে একজনের জীবন তো অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যায়।"

(জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৫ জুন ২০১১;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৩ এপ্রিল ২০১২)

এই একই প্রসঙ্গে অপর এক উপলক্ষে হুযূর (আই.) বলেন–

"উপরন্তু কিছু মেয়ে এমন জায়গায় বিয়ে করতে চায় যেখানে পিতামাতার মত থাকে না। যেমন, ছেলে আহমদী নয় বা ধর্মের সাথে ছেলের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু মেয়ে গোঁ ধরে বসে যে, আমি সেখানেই বিয়ে করবো। অপরদিকে ছেলেদের বেলায় কোন কোন ছেলে এমন কিছু আচরণ বা কর্মে লিপ্ত হয়ে যায় যা গোটা পরিবারের দুর্নামের কারণ হয়। এজন্যই এই দোয়া শিখানো হয়েছে যে, হে আল্লাহ্! আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদেরকে কোন ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন করো না বরং তাদের মাঝে আমাদের জন্য কল্যাণ রেখে দাও। আর এই দোয়া সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই বরং সন্তান গর্ভে আসার প্রাথমিক অবস্থা থেকেই করা উচিত।"

(জুমুআর খুতবা, ১২ ডিসেম্বর ২০০৩, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৪)

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) তাঁর এক ভাষণে আহমদী নারীদের মর্মস্পর্শী নসীহত করে বলেছেন–

"ধর্ম সম্পর্কে সর্বদা একজন আহমদী মেয়ের এই চেতনাবোধ থাকা উচিত যে, আমি আহমদী এবং আমি যদি জামা'তের বাইরে কোথাও বিয়ে করি তাহলে পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা দিতে পারে এবং আমার বিশ্বাসেও বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। কেননা অন্য ঘরে গিয়ে, ভিন্ন মতাবলম্বীর ঘরে গিয়ে তাদের প্রভাবে আমিও প্রভাবিত হতে পারি।"

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৮ জুলাই ২০০৭;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৩ নভেম্বর ২০১৫)

অপর এক উপলক্ষে হুযূর (আই.) বলেন–

"এমন মামলাও এখন সামনে আসছে যাতে দেখা যায় যে, বিয়ে হতে না হতেই ঘৃণা-বিদ্বেষও দেখা দেয়, এমনকি বিয়ের সময়ই ঘৃণার সৃষ্টি হয়ে যায়। বিয়ে তাহলে করলে কেন? দুর্ভাগ্যবশত এখানে অর্থাৎ এসব দেশে এমন ঘটনা অনেক বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আহমদীরাও হয়তো অন্যদের রঙ ধারণ করছে। অথচ আহমদীদেরকে আল্লাহ্ তা'লা সম্পূর্ণভাবে নিজ ধর্মের রঙে রঙিন করার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হবার সুযোগ দিয়েছিলেন। অতএব যদি পছন্দসই বিয়ে না-ও হয়ে থাকে তবুও উচিত ছিল একসাথে বসবাস করা, একে অপরকে বুঝা এবং সেই উপদেশে অভিনিবেশ

করা যার ভিত্তিতে তোমরা বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছ, অর্থাৎ তাকওয়ার বিষয়ে চিন্তা করা উচিত ছিল। সব কিছু করার পরও যদি তোমাদের মধ্যকার ঘৃণা বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে কোন চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ কর আর এর জন্যও প্রথমে নির্দেশ হলো, দু'জন মীমাংসাকারী নির্ধারণ কর, আত্মীয়স্বজন নিয়ে বস, চিন্তা কর এবং গভীরভাবে ভেবে দেখ; উভয় পক্ষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশনা রয়েছে। পরিতাপের বিষয় হলো, বিরল ঘটনা হলেও কোন কোন মেয়ের পক্ষ থেকে প্রথম দিনই এই দাবি উত্থাপিত হয় যে, আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু এর সাথে থাকবো না। খতিয়ে দেখলে জানা যায় যে, ছেলে বা মেয়ে পিতামাতার চাপের মুখে বিয়ে করেছিল কিন্তু আসলে তাদের অন্য কোথাও বিয়ে করার ইচ্ছা ছিল। সুতরাং পিতামাতারও ভাবা উচিত এবং দু'টি জীবনকে এভাবে নষ্ট করা উচিত নয়।"

(জুমুআর খুতবা, ১০ নভেম্বর ২০০৬, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১ ডিসেম্বর ২০০৬)

অহমিকা সমস্যার এক পাহাড়

দুই পক্ষের মাঝে সমস্যার সূচনা হওয়ার একটি কারণ তাদের ব্যক্তিগত অহমিকাও বটে। এই দুর্বলতার প্রতি আলোকপাত করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–

"আজকাল চিঠিপত্র পাঠে বা কোন কোন সাক্ষাৎকারীর কাছে শুনে মন অস্থির হয়ে যায় যে, আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কত মহান আর আমরা আমাদের অহমিকাকে সমস্যার পাহাড় বানিয়ে কত তুচ্ছ অনর্থক সমস্যায় জড়িয়ে নিজেদের পরিবারের ছোট্ট জান্নাতকে জাহান্নাম বানিয়ে দিয়ে, সমষ্টিগত বা জামা'তি উন্নতিতে দৃঢ় ভূমিকা রাখার পরিবর্তে নেতিবাচক ভূমিকা রাখছি। এসব সমস্যা দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে আমিত্বের জালে যে পক্ষই নিজেকে বা দ্বিতীয় পক্ষকে এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনাকে আর চূড়ান্ত পর্যায়ে কখনো কখনো আমাকেও জড়ানোর চেষ্টা করে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে কাণ্ডজ্ঞান দান করুন এবং যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন তারা যেন তা অনুধাবনে সক্ষম হয়। তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লা আমাকে যে কাজের জন্য প্রত্যাদিষ্ট করেছেন তা হলো, খোদা এবং তাঁর বান্দার সম্পর্কের মাঝে যে পঙ্কিলতা দেখা দিয়েছে তা ঘুচিয়ে আমি যেন ভালোবাসা ও আন্তরিকতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করি।

অতএব এই মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য একজন আহমদীর চেষ্টা-সাধনা করা উচিত এবং এটি বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষাও তার থাকা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোন আহমদী ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করতে সক্ষম হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের আমিত্বের শৃঙ্খল থেকে নিজেকে মুক্ত না করবে এবং সেসব পবিত্র নির্দেশনায় আমল না করবে যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে দিয়েছেন। সুতরাং প্রত্যেক আহমদীর উচিত আত্মবিশ্লেষণ করা, নিজের ঘরের খবর নেয়া যে, আমরা কুরআনের শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়ে যাই নি তো? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষা থেকে অবচেতন মনে দূরে চলে যাই নি তো? নিজেদের আমিত্বের জালে ফেঁসে যাই নি তো? এ বিষয়ে ছেলে এবং মেয়ে উভয়কেই আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে। নারী বা পুরুষ উভয়কেই আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে। উভয়পক্ষের শ্বশুরবাড়ির লোকদেরও আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে। কেননা অভিযোগ কখনো মেয়ের পক্ষ থেকে আবার কখনো ছেলের পক্ষ থেকে আসে। কখনো কখনো ছেলেপক্ষ বাড়াবাড়ি করে আবার কখনো মেয়েপক্ষ বাড়াবাড়ি করে। কিন্তু অধিকাংশ সীমালঙ্ঘন ছেলেপক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। এখানে কিছুদিন পূর্বে আমি আমীর সাহেবকে বলেছি, পারস্পরিক কলহ-বিবাদের এত যে মামলা আসছে, এ বিষয়ে খোঁজ নিয়ে দেখুন যে, ছেলেরা কতটুকু দোষী আর মেয়েরা কতটুকু দায়ী আর সমস্যাকে জটিল করে তোলার ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের পিতামাতা কতটুকু দায়ী। তদন্ত অনুযায়ী, একটি মামলায় মেয়ের দোষ সাব্যস্ত হলে প্রায় তিনটি মামলায় ছেলেরা দোষী সাব্যস্ত হয় অর্থাৎ বেশিরভাগ সমস্যা ছেলেদের বাড়াবাড়ির কারণেই সৃষ্টি হচ্ছে আর প্রায় শতকরা প্রায় ৩০-৪০ ভাগ মামলাকে উভয়পক্ষের শ্বশুরবাড়ি জটিল করে তুলে; এক্ষেত্রেও মেয়ের পিতামাতা তুলনামূলকভাবে কম দায়ী থাকে।"

হুযূর (আই.) আরো বলেন–

"আমাদের পারিবারিক সম্পর্ককে দৃঢ় রাখা এবং প্রেম, প্রীতি ও ভালোবাসার পরিবেশ গড়ার লক্ষ্যে ইসলাম কত সুন্দর শিক্ষা দিয়েছে। এমন ব্যক্তিদের দেখে বিস্ময় জাগে আর আক্ষেপ হয় যারা এরপরও নিজেদের আমিত্বের জালে ফেঁসে দু'টি সংসার অধিকাংশ সময় এর ফলশ্রুতিতে দু'টি পরিবার এবং বহু ভবিষ্যত প্রজন্মকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। আল্লাহ্ এদের প্রতি করুণা করুন। ইসলামী নিকাহ বা বিবাহের ঘোষণার পেছনে প্রজ্ঞা হলো, নারী-পুরুষ, যারা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুসারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক-বন্ধনে আবদ্ধ

হচ্ছেন, তারা বিবাহের সময় এই অঙ্গীকার করেন যে, আমরা আল্লাহ্‌র এসব নির্দেশনা মেনে চলার চেষ্টা করবো যা আমাদের সামনে পাঠ করে শোনানো হয়েছে। পবিত্র কুরআনের এসব আয়াতে বর্ণিত শিক্ষায় আমল করার চেষ্টা করবো যা আমাদের বিয়ের সময় এ উদ্দেশ্যেই পাঠ করা হয়েছিল যেন আমরা এই শিক্ষানুযায়ী নিজেদের জীবন গড়ি। এসব শিক্ষার মাঝে সর্ব প্রথম নসীহত হলো, তাকওয়ার পথে পদচারণা কর, তাকওয়া অবলম্বন কর। অতএব বিবাহের সময় এই উপদেশের ভিত্তিতেই সম্মতি দিয়ে থাকে অর্থাৎ নিকাহর সম্মতি এ মর্মেই দিয়ে থাকে যে, আমরা এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হবো। তোমাদের মাঝে যদি সত্যিই তোমাদের প্রিয় প্রভুর ভালোবাসা ও ভয় থেকে থাকে যিনি জন্মের সময় থেকে নিয়ে বরং এরও পূর্ব থেকে তোমাদের সকল চাহিদা পূরণে যত্নবান ছিলেন এবং সকল চাহিদা মিটিয়েছেন তাহলে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ হয় এমন কাজই তোমরা সর্বদা করবে আর এর ফলে তোমরা সেসব প্রতিশ্রুত পুরস্কারেরও ভাগিদার আখ্যায়িত হবে।

স্বামী-স্ত্রী যখন একটি অঙ্গীকার বা চুক্তির ভিত্তিতে একে অপরের সাথে সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং একে অপরের প্রতি যত্নবান থাকার অঙ্গীকার করে সেখানে উভয়েরই দায়িত্ব বর্তায় যে, এই সম্পর্ক-বন্ধনে আরো দৃঢ়তা সৃষ্টির জন্য পরস্পরের আত্মীয়স্বজনের প্রতিও যত্নবান হওয়া। স্মরণ রাখবেন! আপনারা যখন একে অপরের প্রতি যত্নবান হবেন, একে অপরের আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন, প্রিয়জন ও আত্মীয়স্বজনদের খেয়াল রাখবেন, তাদের সম্মান করবেন এবং মর্যাদা দিবেন তখন সম্পর্ক-বন্ধনে ছেদ বা ফাটল সৃষ্টির জন্য কুমন্ত্রণাদাতাদের আক্রমণ সব সময় ব্যর্থ হবে। কেননা বাইরের পরিবেশেরও একটি প্রভাব পড়ে। কিন্তু আপনাদের ভিত্তি তাকওয়ার ওপর থাকার কারণে আপনারা রক্ষা পাবেন। কেননা শয়তানের কুমন্ত্রণার সকল আক্রমণ থেকে আল্লাহ্ তা'লা তাকওয়াশীলদের সর্বদা রক্ষা করেন।

(জুমুআর খুতবা, ১০ নভেম্বর ২০০৬, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১ ডিসেম্বর ২০০৬)

সহ্য ও ধৈর্যের অভাব

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেছেন, পারিবারিক ঝগড়াবিবাদের অন্যতম কারণ সহ্য ও ধৈর্যের অভাব। আর এ প্রসঙ্গে জামা'তের সদস্যদেরকে নসীহত করতে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন–

"বর্তমানে এখানকার এবং বিশ্বের সকল জায়গার স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াবিবাদের বিষয়াদি আমার সামনে আসে, যাতে পুরুষেরও দোষ থাকে আর নারীরও। পুরুষের মাঝেও সেই সহ্যগুণ অবশিষ্ট নেই যা একজন মু'মিনের মাঝে থাকা বাঞ্ছনীয় আর মহিলার মাঝেও ধৈর্য নেই। আমি এর আগেও বেশ কয়েকবার এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছি যে, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণত পুরুষেরই দোষ থাকে কিন্তু কোন কোন বিষয় এমনও থাকে যেখানে মহিলা বা মেয়ে পুরোপুরি দোষী হয়ে থাকে। অপরাধ উভয়পক্ষই করে যার ফলে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয় আর সংসার ধ্বংস হয়ে যায়। সুতরাং উভয়পক্ষের লোকেরা যদি নিজেদের আবেগ-অনুভূতিকে সংযত রাখেন এবং হৃদয়ে তাকওয়াকে স্থান দেন তাহলে এসব বিবাদ-বিষম্বাদ কখনো সৃষ্টিই হতো না। এমন লোকদেরকে নসীহত করতে গিয়ে মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা যদি একে অপরের মাঝে দোষত্রুটি দেখতে পাও তাহলে তার মাঝে অনেক এমন গুণও থাকবে যা পছন্দনীয়। কারো মাঝে শুধু দোষ আর দোষই থাকবে এমন নয়। তোমরা যদি সেসব ভালো গুণ সামনে রাখ এবং আত্মত্যাগের পথ অবলম্বন কর তাহলে তোমাদের মাঝে প্রেম, প্রীতি ও সমঝোতা-সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। মহানবী (সা.)-এর সহধর্মীণীদের সাক্ষ্য রয়েছে যে, মহানবী (সা.) যেরূপ উন্নত নৈতিক ও চারিত্রিক আদর্শে সজ্জিত হয়ে স্ত্রীদের সাথে ব্যবহার করতেন এমন মানুষ আর দ্বিতীয়টি হতে পারে না। অতএব তিনি (সা.) যে নসীহত করতেন তা শুধু নসীহত করার জন্যই করতেন না বরং তিনি (সা.) নিজের আদর্শে তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন।"

(জুমুআর খুতবা, ২২ আগস্ট ২০০৮, জার্মানি;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৮)

৩১ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে লন্ডনস্থ ফযল মসজিদে সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) দু'টি বিয়ের ঘোষণা দেন। এ উপলক্ষ্যে হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) মসনূন বা নির্ধারিত খুতবা পাঠ করার পর তাঁর বক্তব্যে বলেন–

"বিবাহ এমন একটি বন্ধন যা ছেলে ও মেয়ের মাঝে আল্লাহ্ তা'লাকে সাক্ষী রেখে এই অঙ্গিকারের সাথে স্থাপন করা হয় যে, আমরা তাকওয়ার পথে প্রতিষ্ঠিত থেকে সর্বদা এই সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করবো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্বের প্রভাব বা পশ্চিমা শিক্ষার প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। সহ্যের বৈশিষ্ট না থাকার কারণে অতি শীঘ্রই এসব

বিবাহবন্ধনে ফাটল দেখা দেয়া আরম্ভ হয়ে যায়। অথচ পবিত্র কুরআনের যেসব আয়াত পাঠ করা হয় সেগুলোতে আল্লাহ্ তা'লা তাকওয়ার পথে চলার কথা উল্লেখ করেছেন বরং আদেশ দিয়েছেন।

আর মহানবী (সা.) এসব আয়াত নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লার ইঙ্গিতেই এই খুতবার জন্য নির্ধারণ করে থাকবেন। অতএব এই বিষয়টি সর্বদা উভয় পক্ষের আত্মীয়স্বজন এবং ছেলে ও মেয়ে সবাইকে দৃষ্টিপটে রাখতে হবে আর এ বিষয়ে যত্নবান হতে হবে যে, বিয়ে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র বন্ধন। যেমনটি আমি অনেকবারই বলেছি, তুচ্ছ কারণে ছেলে ও মেয়ের পরিবারের বিয়ে ভেঙ্গে ফেলা, ঝগড়া আরম্ভ করা এবং এতে তিক্ততা সৃষ্টি করা হতে বিরত থাকা উচিত।"

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১ জুন ২০১২)

মিথ্যার কারণে আস্থাহীনতা

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অবিশ্বাস সৃষ্টি হওয়ার অনেক বড় একটি কারণ হলো, কোন এক পক্ষের বা উভয় পক্ষের মিথ্যা বলার বদ-অভ্যাস। এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন–

"স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অনেক ঝগড়াবিবাদ শুধুমাত্র আস্থাহীনতার কারণে হয়ে থাকে। স্ত্রীর অভিযোগ থাকে, স্বামী সত্য কথা বলে না। আবার স্বামী অভিযোগ করেন, স্ত্রী সত্য কথা বলে না আর তার সত্য কথা বলার অভ্যাসই নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা একে অপরের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করে যে, আমার সাথে মিথ্যা কথা বলা হয়েছে বা প্রতিটি কথায় সে মিথ্যা বলে। সত্য কথা না বলার কারণে বাচ্চাদের ওপরও বিরূপ প্রভাব পড়ে আর সন্তানরা মিথ্যায় অভ্যস্ত হয়ে যায়।"

তিনি (আই.) আরো বলেন–

"আরেকটি উপদেশ হলো, তোমরা যদি এভাবে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক এবং নিজেদের দায়-দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে সচেষ্ট থাক তাহলে খোদা তা'লা তোমাদের এসব চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলে তোমাদেরকে সংশোধন করতে থাকবেন এবং তোমাদেরকে পুণ্যের পথে চলার সুযোগ দিতে থাকবেন। তোমাদের পাপসমূহ এবং তোমাদের ভুলভ্রান্তিগুলোকে উপেক্ষা করে তোমাদের ঘরকে জান্নাতপ্রতিম বানিয়ে দিবেন।

সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সম্পর্কে তিনি (আই.) বলেন, সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে পারস্পরিক আস্থা জন্মে আর সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেই পারস্পরিক সম্পর্ককে সুচারুরূপে রক্ষা করা যায়। সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেই নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সঠিক তরবিয়্যত করা সম্ভব এবং তাদেরকে সমাজের জন্য কল্যাণকর ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।"

(জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২১ আগস্ট ২০০৪;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১ মে ২০১৫)

৭ অক্টোবর ২০১১ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) মাগরিব ও এশার নামাযের পর জার্মানির হামবুর্গস্থ বাইতুর রশীদ মসজিদে চারটি বিয়ের ঘোষণা করেন। মসনূন বা বিয়ের নির্ধারিত খুতবা ও কুরআনের আয়াতসমূহ পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন–

"সুতরাং এ আয়াতগুলোতে যেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তা হলো, তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করে সে মানের সত্য কথা বলার বিষয়ে যত্নবান হও যাতে সামান্যতম অস্বচ্ছতাও থাকবে না। এই সত্যবাদীতাই ছেলেমেয়ে এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে বিশ্বস্ততার আবহ সৃষ্টি করে আর এই আস্থাই পরবর্তীতে শান্তি ও প্রেম-প্রীতির নিশ্চয়তা প্রদান করে। অতএব নবদম্পতিরা এ বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান থাকুন। যারা বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন তারা যেন এর প্রতি যত্নবান হন। আল্লাহ্‌র সমীপে এ দোয়াই থাকবে। কখনো কোন ধরনের অস্বচ্ছতা, মিথ্যা বা সত্যের মাঝে কোন ভুল কথার অনুপ্রবেশও যেন পারস্পরিক সম্পর্ক বন্ধনে সৃষ্টি না হয় এবং সর্বদা যেন বিশ্বস্ততার পরিবেশ বজায় থাকে।"

(সাপ্তাহিক আলফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩০ ডিসেম্বর ২০১১)

মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান

আহমদী নারীদের সম্বোধন করে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–

"অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যারা ঈমান আনার দাবি করে, তওবা করার দাবি করে এবং হেদায়েতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দাবি করে তাদের জন্য একটি টেস্ট বা পরীক্ষা রয়েছে। আর সেই পরীক্ষা হলো, لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ (সূরা ফুরকান 25:73) অর্থাৎ তারা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে না। সাক্ষ্য প্রদান করা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা এক স্থানে বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ

অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ্‌র জন্য সাক্ষী হিসাবে ন্যায়ের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও। তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে হলেও বা পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে হলেও দাও। (সূরা আন্ নিসা 4: 136)

অতএব দেখুন! এই সুন্দর শিক্ষাই আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দিয়েছেন। বিশ্ববাসীকে বলার মানসে আমরা এই দাবি করে থাকি বটে অর্থাৎ (আমরা বলি) ইসলামে এই সুন্দর শিক্ষা, সেই সুন্দর শিক্ষা রয়েছে আর আহমদীয়া জামা'ত বিশ্বে ন্যায়নিষ্ঠা ও ভালোবাসার প্রচারও করে। কিন্তু আমাদের ব্যবহারিক আচরণ যদি আমাদের দাবির পরিপন্থী হয় তাহলে আমরা নিজেদের আত্মার সাথেও প্রতারণা করছি আর বিশ্ববাসীকেও প্রতারিত করছি। মানুষ নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে– এটি খুবই কঠিন একটি কাজ। মিমাংসাও করলেন, তওবাও করলেন, সৎকাজও করলেন, কিন্তু কিছুদিন পর **যদি এমন কোন উপলক্ষ্য আসে যেখানে সত্য কথা বলে নিজের বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য দিতে হয়, তখন আত্মবিশ্লেষণ করে দেখুন, আমার অবস্থা কি সত্যিই এমন যে, আমি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারি?**

সাধারণত দেখা যায়, মানুষ মিথ্যা কথা বলে নিজেকে রক্ষা করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা যদি নিজেদের ঘরে বা পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাও বা নিজ সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাও তাহলে কখনো মিথ্যার আশ্রয় নেবে না; এমনকি নিজের বিরুদ্ধেও যদি সাক্ষ্য দিতে হয় দেবে। নিজের ভুল স্বীকার কর। নিজ পিতামাতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে হলেও দাও। নিজের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে হলেও দাও। যদি এ কথাটি প্রত্যেক আহমদী নারী-পুরুষ হৃদয়ে গেঁথে নেয় তাহলে পরিবারগুলোতে অশান্তির অবসান ঘটবে। বিচার বিভাগের কাছে বিভিন্ন মামলা আসে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বিষয়কে দীর্ঘায়িত বা জটিল করার নিমিত্তেও নিজের পক্ষে সিদ্ধান্ত করানোর জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হয়। নিজের কেসকে জোরালো করার জন্য কখনো কখনো মহিলার পক্ষ থেকেও

মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হয় এবং পুরুষের পক্ষ থেকেও মামলার ভিত দৃঢ় করার জন্য মিথ্যা কথা বলা হয়ে থাকে। এছাড়া উকিল বা অন্যান্য উপদেষ্টা একাজে নিযুক্ত করা হয় (তাদের নিযুক্তি) সোনায় সোহাগা হয়ে থাকে। তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব এমর্মে প্রমাণ করার জন্য যে, আমরা অনেক ভালো কেস লড়েছি- মিথ্যায় প্ররোচিত করে বা মিথ্যা মামলা সাজায় কিংবা নিজের পক্ষ থেকেও কিছু না কিছু যোগ করে। উকিল এটিকে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব মনে করার কারণ হলো– সে মনে করে আমি যদি এই মামলাটি জিতে যাই তাহলে আমি অনেক বাহবা পাবো, আমার ব্যবসা ভালো চলবে। এক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, সে এখানে শিরক করা আরম্ভ করে দিয়েছে আর মিথ্যাকে নিজের রিজ্কদাতা বানিয়ে নিয়েছে। মানুষ বলবে, এ তো খুবই ভালো উকিল! আল্লাহ্ তা'লার ভয়ভীতি যদি হৃদয়ে না থাকে তাহলে ক্রমশ পাপের বিস্তার ঘটতে থাকে।"

(জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৫ জুন ২০১১;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৩ এপ্রিল ২০১২)

স্বল্পতুষ্টি এবং আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থার অভাব

সংসার ভেঙে যাবার বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করে হুযূর (আই.) এক জুমুআর খুতবায় বলেন–

"সংসার ভেঙে যাবার একটি কারণ হলো, মহিলাদের মাঝে স্বল্পে তুষ্ট থাকার বৈশিষ্ট্য কম থাকে। সে নিজের স্বামীর আয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খরচ করার পরিবর্তে নিজের সেসব বন্ধু, বান্ধবী বা প্রতিবেশীর ওপর চোখ রাখে যাদের অবস্থা তার চেয়ে স্বচ্ছল এবং সে অনুযায়ী খরচ করে ফেলে আর এরপর স্বামীর কাছে আবার চায় যে, আমাকে আরো দাও। ধীরে ধীরে অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। এক পর্যায়ে এমন অসহনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, অনেক সময় দুই বা তিনটি সন্তান হওয়ার পরও অধৈর্যের কারণে বা স্বল্পে তুষ্ট না থাকার কারণে, সর্বোপরি আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় ভরসা না থাকার কারণে নিজেদের সংসারকে ধ্বংস করে দেয়। কেননা এরা কেবল জাগতিক চিন্তাধারা দিয়েই নিজেদের মন-মস্তিষ্ক ভরে রাখে, যার ফলে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি এদের বিশ্বাসে ঘাটতি দেখা দেয়। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পূর্ণ আস্থা না থাকার কারণে তাঁর সকাশে বিনতও হয় না এবং তাঁর কাছে দোয়াও করে না। অতএব এই সমস্যার এক ধারার সমান্তরালে পরবর্তী ধারাও বইতে থাকে। যারা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিনত নয় তারা তাঁর প্রতি ভরসা কীভাবে রাখতে পারে? অতএব

এরপর এমন নারীরা সংসার ধ্বংস করে দেয় এবং স্বামীর কাছে তালাক বা বিচ্ছেদের দাবি জানানো আরম্ভ হয়ে যায়। অবশেষে আমি যেমনটি বলেছি, একটি পাপ থেকে ক্রমান্বয়ে অন্যান্য পাপও জন্ম নিতে থাকে।"

(জুমুআর খুতবা, ১৫ আগস্ট ২০০৩, মসজিদ ফযল, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১০ অক্টোবর ২০০৩)

মহিলাদের অন্যায় আকাঙ্খা ও দাবি-দাওয়া

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) ১৫ এপ্রিল ২০০৬ সনে জলসা সালানা অস্ট্রেলিয়ায় মহিলাদেরকে সম্বোধন করে বিশেষ নসীহত করে বলেন, **"মহানবী (সা.) বলেছেন, স্ত্রীরা হলো স্বামীর গৃহের নিগরান**, যেখানে তারা খেয়াল রাখবেন, স্বামীর ঘরে যেন কোন ধরনের ক্ষতি সাধিত না হয়। কোন ধরনের জাগতিক ক্ষতিও যেন না হয় আর আধ্যাত্মিক ক্ষতিও যেন সাধিত না হয়। তার টাকা-পয়সা যেন অযথা ব্যয় না হয়, কেননা অযথা অর্থ খরচ তথা অপব্যয়ই পরিবারে অস্থিরতা বা অশান্তি সৃষ্টি করে। অনেক সময় মহিলাদের চাহিদা বেড়ে যায়। স্বামী যদি দুর্বল মন-মানসিকতার অধিকারী হয়ে থাকে তাহলে ঋণ নিয়ে নিজ স্ত্রীর বিভিন্ন চাহিদা পূর্ণ করে। কখনো কখনো ঋণগ্রস্ততার কারণে যখন অশান্তি ও অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায় তখন গৃহকর্তা বিভিন্ন দুশ্চিন্তায় নিপতিত হয় এবং ধৈর্যশীল স্বভাবের হলেও সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কেউ ডায়েবেটিসের রোগী হয়ে যায়, কেউবা উচ্চ রক্তচাপে ভোগে আর স্বামী যদি তার কথা না শোনে তাহলে কোন কোন স্ত্রীও স্বামীর এই আচরণে ডায়েবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপের শিকার হয়ে যায়। কিন্তু আপনি যদি যথাযথভাবে নিগরানী বা তত্ত্বাবধান করেন তাহলে আপনিও কোন ধরনের রোগে আক্রান্ত হবেন না আর আপনার স্বামীও কোন ধরনের রোগে আক্রান্ত হবে না। স্বামী যদি অধৈর্যশীল হয় তাহলে ঘরে সারাক্ষণই তুইতোকারি চলতে থাকে, এ আচরণও অসুস্থতার কারণ হয়। সেই ঘর, যা শান্তির নীড় হবার কথা, জান্নাতসদৃশ হবার কথা তা এসব ঝগড়াবিবাদের কারণে জাহান্নামের দৃশ্যের অবতারণা করে। শুধু তাই নয়, বাচ্চাদের মন-মস্তিষ্কে এর কারণে বিরূপ প্রভাব পড়ে। তাদের শিক্ষাদীক্ষা এর ফলে প্রভাবিত হয়।

এই (পাশ্চাত্য) সমাজে সত্য বলার অভ্যাস গড়ে তোলা হয় আর এই সমাজ যেহেতু সম্পূর্ণ স্বাধীন, তাই কতিপয় শিশু-কিশোর পিতামাতার মুখের ওপর

বলে দেয়, আমাদের সংশোধন না করে প্রথমে নিজেদের সংশোধন কর। অতএব এভাবে যে মহিলাকে স্বামীর ঘরের, তার ধনসম্পদের ও সন্তানসন্ততির নিগরান বানানো হয়েছে সে নিজের কামনা-বাসনার দাসত্বে ঘরের তত্ত্বাবধান করার পরিবর্তে এটিকে ধ্বংস করে দেয়ার ব্যবস্থা করে।

অতএব প্রত্যেক আহমদী নারীকে এটি মন-মস্তিষ্কে গেঁথে নিতে হবে যে, সে নিজের জাগতিক কামনা-বাসনা পূর্ণ করার জন্য নয় বরং তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র ইবাদত এবং তাঁর বিধিনিষেধ মেনে চলার জন্য এ পৃথিবীতে এসেছে।"

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১২ জুন ২০১৫)

একবার মহিলাদের উদ্দেশ্যে হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বলেন–

"পুরুষ চাহিদা পূরণ করতে না পারার কারণে কতক পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। ডিমান্ড বা চাহিদা অনেক বেড়ে যায়। এমন পরিবার ধ্বংস না হলেও অশান্তিকর অবস্থা অবশ্যই বিরাজ করে। কিন্তু যারা প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ্ তা'লাকে ভালোবাসে, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাদের তত্ত্বাবধান করেন এবং তাদের চাহিদা পূর্ণ করে থাকেন। সে মহিলাই বুদ্ধিমতি, যে এই চিন্তা করে যে, আমি আমার পারিবারিক সুখশান্তি কীভাবে পেতে পারি? আমার সংসারকে জান্নাত-প্রতীম কীভাবে বানাতে পারি? কিন্তু যদি জাগতিক-মোহ থাকে তাহলে এই শান্তি কখনো লাভ হতে পারে না। খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমেই সত্যিকার প্রশান্তি লাভ হতে পারে। জাগতিক চাহিদা তো বাড়তেই থাকে। কামনা-বাসনা ক্রমাগতভাবে ভিড় করতেই থাকে যা অশান্তি সৃষ্টির কারণ হয়।

তিনি (আই.) আরো বলেন–

"আপনারা যদি খতিয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন যে, নিশ্চিতভাবে যারা খোদা তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পুণ্যকর্ম করে তাদের জীবনে যে সুখ এবং প্রশান্তি দেখা যায় তা জগৎপূজারি মহিলাদের মাঝে নেই। সেই সকল মহিলাদের ঘরে অশান্তি বিরাজ করে যারা জাগতিকতার মোহে আচ্ছন্ন। কিন্তু যারা ধর্মকে প্রাধান্য দেয় এবং ধর্মের উদ্দেশ্যে ত্যাগ স্বীকার করে– তাদের ঘরে প্রশান্তি বিরাজ করে আর তাদের পারিবারিক জীবন সুখী ও আনন্দঘন হয়ে থাকে।

তাদের সন্তানরা পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং জামা'তের সাথেও সম্পৃক্ত থাকে।

(জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২ জুন ২০১২;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৬ অক্টোবর ২০১২)

২০০৭ সালের যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দানকালে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) হযরত ফাতেমাতুয যাহরা (রা.)-এর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন–

"একবার হযরত আলী মুরতাযা (রা.) ঘরে ফিরলেন আর কিছু খেতে চাইলেন তথা হযরত ফাতেমা (রা.)-কে বললেন, 'কিছু খেতে দাও'। তখন তিনি (রা.) বললেন, আজ তৃতীয় দিন, ঘরে যবের একটি দানাও নেই। হযরত আলী (রা.) বললেন, হে ফাতেমা! তুমি পূর্বে আমাকে কেন বলো নি তাহলে আমি কোন একটা ব্যবস্থা করতাম? তিনি (রা.) উত্তরে বললেন, 'আমার পিতা (সা.) আমাকে বিদায় দেয়ার প্রাক্কালে উপদেশস্বরূপ বলেছিলেন, 'আমি যেন কিছু চেয়ে আপনাকে লজ্জিত না করি। এমন যেন না হয় যে, আমি আপনার কাছে কিছু চেয়ে বসলাম আর আপনার অবস্থা আমার আকাঙ্খা পূর্ণ করার মত হবে না যার ফলে আপনার ওপর বোঝা চাপবে অথবা আপনি ঋণ করে আমার চাহিদা পূর্ণ করবেন বা আপনার হৃদয়ে এমন এক দুশ্চিন্তা সৃষ্টি হবে যে, আমি তো আমার স্ত্রীর চাহিদা পূরণ করতে পারলাম না।

অতএব এটি এমন একটি কথা যা প্রত্যেক গৃহিণীর জন্য আলোকবর্তিকা। বিশেষ করে সেসব নারী যারা নিজেদের স্বামীর কাছে অন্যায় দাবি-দাওয়া উপস্থাপন করে থাকে।

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৮ জুলাই ২০০৭;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৩ নভেম্বর ২০১৫)

২০১০ সালের সালানা জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) মহিলাদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন–

"প্রত্যেক মহিলা যদি এ বিষয়টি বুঝে যায় যে, তার দায়-দায়িত্ব কী এবং উক্ত দায়িত্ব সে এ কারণে পালন করবে না যে, (দায়িত্বে অবহেলার ফলে) স্বামী, পিতা অথবা ভাইয়ের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধী বলে বিবেচিত হবে, বরং এই দায়িত্বাবলী পালনের চেতনা সর্বদা হৃদয়ে লালন করতে হবে এবং তা সুদৃঢ় করতে হবে এ জন্য যে, একজন খোদা আছেন যিনি অদৃশ্যের

পরিজ্ঞাতা, অদৃশ্যের জ্ঞান যিনি রাখেন, যিনি আমাদের প্রতিটি গতিবিধি লক্ষ্য করছেন এবং সর্বদা স্বীয় সৃষ্টির ওপর তাঁর দৃষ্টি রয়েছে। প্রত্যেকের কৃতকর্ম তাঁর সম্মুখে একটি খোলা পুস্তকের ন্যায়। অতএব হৃদয়ে যদি এ চেতনা থাকে তাহলে কোন মহিলা এমন কাজ করতে পারে না যা তাকে তাকওয়া থেকে দূরে ঠেলে দেবে। একজন স্ত্রী হিসেবে সে তার স্বামীর সাথে পূর্ণ বিশ্বস্ততা রক্ষাকারী হবে, স্বামী-গৃহের দেখাশুনা করবে এবং তার সম্পদের অপচয় করার পরিবর্তে এর সঠিক ব্যবহার করবে। এমন অনেক মহিলা আছেন যারা মুত্তাকী বরং তাকওয়ার পাশাপাশি তারা বিবেকবুদ্ধিকেও কাজে লাগিয়ে থাকেন। তারা যৎসামান্য আয় সত্ত্বেও নিজেদের স্বামীর কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ থেকে কিছু না কিছু সাশ্রয় করেন এবং সঞ্চয় করতে থাকেন আর কোন কোন সময় স্বামীর দুঃসময়ে তার হাতে সেই টাকা তুলে দেন। তারা স্বামীর সম্পদ এমনভাবে অগোচরে সঞ্চয় করেন যে, স্বামী জানেনও না, কত টাকা সঞ্চয় হচ্ছে? অথবা যদি তাদের নিজেদের প্রয়োজন হয় তাহলে স্বামীর অনুমতি নিয়ে তা ব্যয় করে থাকেন। নিজ সন্তানের সঠিক তত্ত্বাবধান করেন। কেবল স্বামীর সন্তান বলেই সন্তানের দেখাশুনা করা হয়– এমন নয়, বরং এর একটি বড় কারণ হলো, তারা জাতীয় আমানত, তারা জামা'তের আমানত। এছাড়া তারা (অর্থাৎ স্ত্রীরা) বন্ধু অথবা বান্ধবী হিসেবে এমন মহিলাদেরকেই বেছে নেন যারা উত্তম আদর্শের অধিকারী। **স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত একজন স্ত্রী কখনো মন্দ প্রকৃতির বান্ধবী গ্রহণ করতে পারে না, যারা ফুসলিয়ে তাকে ভুল পথে পরিচালিত করবে অর্থাৎ (তারা বলবে যে,) স্বামীর ওপর চাপ সৃষ্টি করে যতটা পার টাকা আদায় কর।** স্বামী ছাড়াই ভ্রমণের জন্য স্বাধীনভাবে যাও, কেননা তোমারও তো স্বাধীনতা ভোগের অধিকার আছে। যার সাথে চাও, যেমন চাও, সম্পর্ক রাখো– এমন কুপরামর্শদাতা মহিলারা আদৌ (স্বামীর ব্যক্তিগত বিষয়ের) গোপনীয়তা রক্ষাকারী বলে বিবেচিত হতে পারে না আর না এমন মহিলাদের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষাকারী এবং তাদের কথা মান্যকারী মহিলারা গোপনীয়তা রক্ষাকারী সাব্যস্ত হতে পারে।

(যুক্তরাজ্য সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৩১ জুলাই২০১০;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১১ মার্চ ২০১১)

১৯ মে ২০১২ সনে হল্যান্ড সফরের সময় হুযূর আনোয়ার (আই.) একটি বিবাহের এলান করেছিলেন। সেই বিবাহের খুতবায় হুযূর (আই.) বলেন–

"সাধারণত আমি দেখেছি, সম্পর্ক অনেক সময় এ কারণে ভেঙে যায় এবং ঘরে এ জন্য ঝগড়াবিবাদ দেখা দেয় যে, মেয়েদের ডিমান্ড বা চাহিদা বেশি হয়ে থাকে আর অনেক সময় মেয়েদের সাথে তাদের পরিবারের লোকেরাও যুক্ত হয়ে যায় আর যখন স্বামী তাদের সেই চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হয় তখন ঝগড়ার ভিত্তি রচিত হয়। এমনিভাবে অনেক ছেলেও মেয়েদের সাথে অন্যায় বাড়াবাড়ি করে থাকে, তাদেরও এদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

অতএব শুরুতেই যেভাবে আমি বলেছি, প্রকৃত বিষয় হলো, আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ রেখে, তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে এসব সম্পর্ক রক্ষা করা উচিত এবং এজন্য চেষ্টা করা উচিত। যদি এ কথা দৃষ্টিপটে থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আপনাদের সম্পর্কও বজায় থাকবে। নতুন যে সকল আত্মীয়তার বন্ধন রচিত হয় তাও অটুট থাকবে আর পরবর্তী বংশধরও পুণ্যের পথযাত্রী হবে। এই যে নতুন সম্পর্ক বা বৈবাহিক বন্ধন রচিত হচ্ছে, তা সকল দিক থেকে কল্যাণকর হোক আর এই উভয় পরিবার বা বংশের সকল ঐতিহ্যের ধারকবাহক হোক তথা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্যদাতা হোক– আল্লাহর কাছে এ দোয়াই থাকবে।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৯ জুন ২০১২)

১ সেপ্টেম্বর ২০০৭ সনে জার্মানির সালানা জলসায় সৈয়্যেদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) তাঁর বক্তৃতায় **একজন আহমদী নারীর ওপর ন্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বাবলীর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ** করে পারিবারিক জীবনের বরাতে বলেন–

"একজন মহিলার দায়িত্ব কেবল জাগতিক বিষয়াদিতে নিজ ঘর অথবা নিজ সন্তানদের দেখাশুনা করা এবং তাদের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখাই নয় বরং একজন আহমদী মহিলার দায়িত্ব আরো ব্যাপক। আহমদী নারী ইসলাম প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুযায়ী নিজ ঘর এবং স্বামীর ঘরের তত্ত্বাবধান করবে আর নিজের সন্তানদের জাগতিক শিক্ষাদীক্ষার প্রতিও দৃষ্টি রাখবে। সন্তানের শিক্ষা দিতে হবে ইসলামী চারিত্রিক মান অনুযায়ী। নিজ সন্তানের আধ্যাত্মিক তরবিয়্যতও করতে হবে আর সেসকল তরবিয়তী বিষয় নিজ সন্তানের মাঝে সৃষ্টির জন্য, তাদের মস্তিষ্কে গেঁথে দেয়ার জন্য উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। নিজেদের জীবন আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশিত শিক্ষা অনুসারে পরিবর্তন করে

ইবাদত ও অন্যান্য পুণ্যকর্ম সম্পাদন করার দৃষ্টান্ত নিজেদের সন্তানের সম্মুখে উপস্থাপন করতে হবে। তখনই আহমদী মহিলা নিজ স্বামী-গৃহের আদর্শ তত্ত্বাবধায়িকা বলে বিবেচিত হতে পারে। তবেই এক আহমদী মা নিজের সন্তানের তরবিয়ত বা সুশিক্ষার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে, অন্যথায় তার কথা ও কাজে বৈপরীত্য থাকার কারণে কখনো তার সন্তান সঠিক তরবিয়ত পেতে পারে না।

(জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ১ সেপ্টেম্বর ২০০৭;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০২ ডিসেম্বর ২০১৬)

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর একটি উপদেশ

"বিবাহ এমন একটি বন্ধন যা স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মাঝে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে এই অঙ্গীকারের সাথে গড়া হয় যে, তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সর্বদা আমরা নিজেদের এই সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করব। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বর্তমানে পশ্চিমা প্রভাব অথবা পশ্চিমা শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব ও ধৈর্য্যের উপাদান না থাকার কারণে অতি দ্রুত সেই সম্পর্কে ফাটল ধরা শুরু হয়ে যায়। অথচ (বিবাহের এলানে) কুরআনের সেসব আয়াত পাঠ করা হয়, যেগুলোতে আল্লাহ্ তা'লা তাকওয়ার পথে চলার কথা বলেছেন এবং আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার ইশারাতেই এই আয়াতগুলোকে (বিবাহের) খুতবার জন্য নির্ধারণ করে থাকবেন। অতএব এ বিষয়টি সর্বদা উভয় পক্ষের আত্মীয়স্বজন এবং স্বামী ও স্ত্রীর মানসপটে রাখা উচিত আর একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, (বৈবাহিক) সম্পর্ক একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং পবিত্র বন্ধন।"

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১ জুন ২০১২)

শান্তিপূর্ণ পারিবারিক জীবনের জন্য প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা

ধৈর্য্য এবং স্থৈর্য্য

২০০৪ সনের ৪ সেপ্টেম্বর সুইজারল্যান্ডের জলসা সালানায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) তাঁর বক্তৃতায় পুরুষ এবং মহিলাদের মনোযোগ তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি আকর্ষণ করেন। এ প্রসঙ্গে পারিবারিক সমস্যা সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–

"এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মু'মিনের উচিত ধৈর্য্য প্রদর্শন করা। জীবনে এমন অনেক সময় আসে যেমন, ব্যবসাবাণিজ্যে লোকসান হলো, চুরি হয়ে গেল, ডাকাতি হলো ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে স্বামীর আর্থিক অবস্থা ভালো থাকে না। মহিলার চাহিদা অনুযায়ী যদি অর্থ সরবরাহ না হয় তাহলে মহিলা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে, অনেক মহিলা বিলাপ করতে আরম্ভ করে এবং স্বামীদের সাথে ঝগড়াবিবাদ শুরু করে। নিজের চাহিদার বহর অনেক সময় এতটা বিস্তৃত করে যে, স্বামীর জন্য ঘরের ব্যয়ভার নির্বাহ করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। আমি এ কথা বলছি না যে, সর্বক্ষেত্রে স্বামীরা সঠিক বা নিরাপরাধ এবং মহিলারা ভুল বা অপরাধী, অনেক ক্ষেত্রে মহিলারাও নিরাপরাধ হয়ে থাকে। কিন্তু আমি সেসকল মহিলাদের কথা বলছি যাদের চাহিদা অনেক বেশি হয়ে থাকে। এর ফলে ঘরে সর্বদা ঝগড়াবিবাদ, মারামারি ও তুইতোকারি চলতে থাকে। অথবা এমন হয় যে, স্বামী তাদের অন্যায় আবদারের কারণে পথচ্যুত হয়, এমতাবস্থায় যখন ঝগড়াবিবাদ হয়, তুইতোকারি হয়, তখন এমন স্বামীরাও আছে যারা স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করা শুরু করে দেয়। অথবা স্বামীরা স্ত্রীদের সেসব অন্যায় আবদার মেনে নিয়ে তা পূর্ণ করতে গিয়ে ঋণ করা শুরু করে দেয়, যে কারণে গোটা পরিবার এক প্রকার বিপদে নিপতিত হয়ে যায়। স্বামীর কাছে ঋণদাতা যখন অর্থ ফেরত চায় তখন সে টালবাহানা শুরু করে দেয়। এরপর আরেকটি মিথ্যার পসরা শুরু হয়ে যায়। ঋণ পরিশোধ করতে না পারার কারণে তার মাঝে একধরণের খিটখিটে স্বভাব সৃষ্টি হয় এবং স্বামী তখন সন্তানদের সাথে কঠোর ব্যবহার করা আরম্ভ করে আর বাচ্চারা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতএব এ হলো এক ধরনের শয়তানি চক্র যা কতক অন্যায় আবদারের কারণে, ধৈর্য্যের আঁচল

ছেড়ে দেয়ার কারণে সূচীত হয়ে যায় আর এর ফলে বয়সের এক সীমায় পৌঁছে সন্তানরা এসব ঘর ছেড়ে বাইরে শান্তি অন্বেষণ করে এবং মা-বাবার তরবিয়্যত বা সুশিক্ষা হতে বঞ্চিত হয়ে যায়। এরপর বিভিন্ন ধরনের অপরাধ দেখা দিতে থাকে আর পরে মা-বাবা যখন সম্বিত ফিরে পায় তখন আর শুধরানোর সময় থাকে না। তাই বলেছেন যে, ঈমানে তখন দৃঢ়তা আসবে যখন ধৈর্য্যের অভ্যাস সৃষ্টি হবে।

(সুইজারল্যান্ডের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৪; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৭ জানুয়ারি ২০০৫)

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

১৭ সেপ্টেম্বর ২০১১ সনে লাজনা ইমাইল্লাহ্ জার্মানির বার্ষিক ইজতেমায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলেন–

"এরপর হলো, কৃতজ্ঞতার অভ্যাস। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে আরো বেশি দিবেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর কল্যাণরাজি ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি করতে থাকবেন। তাই নিজ পারিবারিক জীবনেও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। নিজ স্বামীর উপার্জন কতটা তা দেখুন আর এর মাঝেই ব্যয় নির্বাহ করুন ও সংসার চালান। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। বিশেষভাবে সদ্য বিবাহিত অনেক মেয়ের কিছু সমস্যা আমার কাছে আসে। জানিনা তা কতদূর সঠিক বা ভুল, কিন্তু স্বামী দোষ দেয় স্ত্রীর আর স্ত্রী দেয় স্বামীর। স্বামীর অভিযোগ হলো, স্ত্রীর চাহিদা অনেক বেশি আর অনেক ক্ষেত্রে তা সত্য প্রতীয়মান হয় আর স্ত্রী বলে, ও আমার এই চাহিদাগুলো পূরণ করে না। প্রতি মাসে বা প্রতি সপ্তাহে সে আমাকে বিউটি পার্লারে নিয়ে যায় না। বিউটি পার্লারে যাওয়া তো এক আহমদী মহিলা বা আহমদী মেয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। যদি কারো সাধ্য না থাকে তাহলে কীভাবে নিয়ে যাবে? নিজ সাধ্যের মাঝে থেকে জীবনযাপন করলেই কেবল সম্পর্ক টিকে থাকতে পারে।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তাহলে আমি তোমাদেরকে অধিক দানে ধন্য করব। প্রত্যেক নবদম্পত্তি, যারা নতুন জীবন শুরু করে, তাদের শুরু সামান্য দিয়েই হয় আর এরপর আল্লাহ্ তা'লা

কৃপা করেন আর ধীরে ধীরে জীবন যতই কাটতে থাকে, অভিজ্ঞতা লাভ হয়, পুরুষের আয়ও বৃদ্ধি পায় আর উপায়-উপকরণও সৃষ্টি হতে থাকে। তাই যুবতী মেয়েদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, ধৈর্য ও স্থৈর্য এবং কৃতজ্ঞতার অভ্যাস সৃষ্টি করলে ইনশাআল্লাহ তা'লা আপনাদের সম্পর্কও দৃঢ় থাকবে এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজিরও উত্তরাধিকারী হতে থাকবেন আর তাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হবেন যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখেন, এর (পাশাপাশি) নিজ অঙ্গীকার রক্ষাকারিনীও হবেন।

(লাজনা ইমাইল্লাহ্, জার্মানির বার্ষিক ইজতেমায় প্রদত্ত ভাষণ, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১১;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৬ নভেম্বর ২০১২)

এ বিষয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) অপর এক স্থলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিও উপস্থাপন করেন এবং এর ব্যাখ্যাও করেন যে, "স্বামীদের কাছ থেকে সেই জিনিস চাইবে না যা তাদের সাধ্যাতীত। চেষ্টা করো যেন তোমরা নিষ্পাপ এবং পবিত্র অবস্থায় কবরে প্রবেশ করতে পারো। খোদা নির্ধারিত আবশ্যিক ইবাদত নামায, যাকাত ইত্যাদিতে আলস্য দেখাবে না।"

এখন প্রত্যেকের জন্য নামায ফরয। প্রত্যেকের জন্য নামায পড়া আবশ্যিক আর একথা আমি পূর্বেও বলেছি যে, যদি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয় তাহলে সন্তানরা তা দেখে এদিকে মনোযোগী হবে। এরপর হলো যাকাতের বিষয়টি, প্রত্যেক মহিলার কাছে গহনা থাকে এবং তা হিসাব করে শর্ত অনুযায়ী যাকাত দেয়ার চেষ্টা করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "মনেপ্রাণে স্বামীর অনুগত হও। তাদের আনুগত্য করতে থাকো। তাদের সম্মানের একটি বড় অংশ তোমাদের হাতে অর্থাৎ স্বামীদের সম্মানের বড় অংশ তোমাদের হাতে রয়েছে। অতএব তোমরা এই দায়িত্ব এতটা উত্তমভাবে পালন করো যেন খোদা তা'লার কাছে 'সালেহাত' তথা পুণ্যবতী, 'কানেতাত' তথা স্বল্পে তুষ্ট বলে গণ্য হও।"

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮০-৮১)
(হল্যাণ্ডে সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৩ জুন ২০০৪;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২২ জুলাই ২০০৫)

স্বামীর সাথে পূর্ণ বিশ্বস্ততা প্রদর্শন এবং ইস্তেগফারের অনুপ্রেরণা

২০০৩ সালে জলসা সালানা জার্মানি'তে মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দানকালে হুযূর (আই.) বলেন–

"অনেক সময় (আর্থিক) অবস্থার অবনতি ঘটে, স্বামীর চাকুরি থাকে না অথবা ব্যবসায় লোকসান হয়, অবস্থা পূর্বের মত থাকে না এবং অস্বচ্ছলতা দেখা দেয়। অনেক মহিলার অভ্যাস হলো, তখন পরিস্থিতির কারণে স্বামীর সাথে চিৎকার চেচামেচি, ঝগড়াবিবাদ, গালমন্দ, চাহিদা উপস্থাপন ইত্যাদি করা শুরু করে– এমন কাজের ফলাফল ভালো হয় না। স্বামী যদি কিছুটা দূর্বল চিত্তের মানুষ হয় তাহলে দ্রুত ঋণ নেয়া শুরু করে অর্থাৎ স্ত্রীর চাহিদা কোনমতে পূর্ণ হয়ে যাক আর ঋণের চোরাবালি এমন ভয়ংকর যে, মানুষ এতে ডুবে যেতে থাকে। এমতাবস্থায় পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে স্বামীর সাহায্যকারী হওয়া উচিত এবং পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে জীবন কাটানো উচিত।"

তিনি (আই.) আরো বলেন–

"সামান্য সামান্য কথায় যেসব মহিলা চিৎকার-চেঁচামেচি করে তাদের এ হাদীসটিও মাথায় রেখে **ইস্তেগফার** করতে থাকা উচিত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়েছে আর আমি দেখলাম, এর অধিবাসীদের অধিকাংশ হলো মহিলা। এর কারণ হলো, তারা কুফর তথা অস্বীকার করে। নিবেদন করা হলো, তারা কি আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে? তিনি (সা.) বললেন– না, তারা অনুগ্রহ ভুলে যায়। তুমি যদি তাদের কারো প্রতি সারাটি জীবনও অনুগ্রহ কর আর এরপর তোমার পক্ষ থেকে কোন বিষয় নিজ স্বভাব বিরোধী দেখলেই বলে বসে, আমি তোমার কাছ থেকে কখনো ভালো কিছু দেখি নি।"

(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ঈমান,বাবু কুফরানিল আসীর ওয়া কুফরিন দুনা কুফরিন ফিহে)

দোয়া, সদকা এবং তওবা-ইস্তেগফারের মাধ্যমে কঠিন সময়ের মোকাবিলা করা

পারিবারিক সমস্যাদির বিষয়ে আহমদী মহিলাদেরকে উপদেশ দিয়ে হুযূর (আই.) বলেন–

"কতক মহিলার হৃদয়ে নিজ ঘর বা শ্বশুরবাড়ির অবস্থার কারণে অভিযোগ দানা বাধে। তারা অধৈর্য্যের বহিঃপ্রকাশ করে থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে কষ্ট

বাড়ার সাথে সাথে প্রতিক্রিয়াও এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, আল্লাহ্ তা'লাকেও তারা দোষারোপ করতে থাকে। তাই অভিযোগ বৃদ্ধি করার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা উচিত। ঠিক আছে, আমিও জানি যে, অনেক সময় স্বামীদের পক্ষ থেকে এতটা বাড়াবাড়ি করা হয় যে তা সহ্যের বাইরে চলে যায়। এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষের কাছে যেতে হয় বা আইনের আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু অভিযোগ করার পরিবর্তে বেশি বেশি দোয়া, সদকা এবং আচরণে পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করার জন্য তাঁর প্রতি আরো বেশি বিনয়াবনত হওয়া উচিত। মহানবী (সা.) একবার বলেন, হে মহিলাদের দল! সদকা করো এবং অধিক ইস্তেগফার করো।"

(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান,বাবু বয়ানে নুকসানেল ঈমানে বি নাকসে-তা'আত)

(জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৩ আগষ্ট ২০০৩; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৮ নভেম্বর ২০০৫)

২৫ জুন ২০১১ সালে জলসা সালানা জার্মানি'তে মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন–

"অতএব তওবা ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে আমাদের স্ব স্ব কর্মের মান উন্নততর করা আবশ্যক। এ বিষয়ের দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝

অর্থাৎ আর যে ব্যক্তি তওবা করে আর পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে, সে-ই প্রকৃত মু'মিন। (সূরা আল ফুরকান 25: 72)

অতএব মৌখিক তওবাই প্রকৃত তওবা নয় বরং পুণ্যকর্ম দ্বারা তা সুসজ্জিত করা আবশ্যক। অতএব যে ব্যক্তি প্রকৃত তওবা করে, সে সর্বদা নিজ ভুলভ্রান্তি এবং দোষত্রুটি দৃষ্টিতে রাখবে। কেননা এটি সেই কর্ম সম্পর্কে তার হৃদয়ে ঘৃণা সৃষ্টি করবে আর সেই কর্মকে কুৎসিত করে তুলে ধরবে। আর পাপের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হলে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সদকা এবং দান-খয়রাত করার দিকেও তার মনোযোগ নিবদ্ধ হবে। যে কর্ম আল্লাহ্ তা'লার কাছে অপছন্দনীয় তা আদৌ না করার অঙ্গীকারও সে করবে। এছাড়া এমন কতক পুরুষ ও নারী রয়েছে যাদের অভ্যাস হলো কোন মনোমালিন্যের কারণে তারা অন্যের ক্ষতি

করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকে আর হৃদয়ে তাদের হিংসা-বিদ্বেষ লালিত হতে থাকে। প্রকৃত তওবা হলো যাদের সাথে মনোমালিন্য থাকে তাদের সাথে না কেবল আপোষ করবে বরং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও করবে আর এই ক্ষতিপূরণ যখন তওবার সাথে হবে তখন সেটিই হবে পুণ্যকর্ম, সেটিই হবে সৎকর্ম।

কোন কোন স্বামী, স্ত্রী, শাশুড়ি, ননদ ও ভাই আমাকে পত্রযোগে লিখে থাকে যে, আমরা ভুল করেছি, ভবিষ্যতে আমরা এমন ভুল আর করব না। কিন্তু যার ক্ষতি করা হয় অথবা যাকে ক্ষতি করার চেষ্টা করা হয়, তার কাছে ক্ষমাও চায় না আর তার কাছে অনুতাপও প্রকাশ করে না। মোটকথা, এদিকে নারীদেরও মনোযোগ দেয়া আবশ্যক এবং পুরুষদেরও, কেননা পুরুষদেরও একই অবস্থা। জাগতিক লোভ-লালসা এতই প্রবল যে, আল্লাহ্‌র ভয় একেবারে শূন্যের কোঠায় চলে যায়। অনেক সময় অনেকে বাহ্যিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করে কিন্তু হিংসা আর বিদ্বেষ যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, ভিতরে ভিতরে লালিত হতে থাকে আর সুযোগ পেতেই ক্ষতি করার চেষ্টা করা হয়।

প্রকৃত তওবাকে আল্লাহ্ তা'লা পুণ্যকর্মের সাথে শর্তযুক্ত করে দিয়েছেন তথা যদি পুণ্যকর্ম করা হয় তবে তাই হবে প্রকৃতই তওবা। যদি কোন অন্যায়ের সূরাহা ও বিমোচন হয়, তবেই সেই তওবা কবুল হবে আর যখন এমনটি হবে তখন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এমন লোক প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্‌র প্রতি বিনত। এ বিষয়ে অপর এক স্থলেও আল্লাহ্ তা'লা (এমনি) বলেছেন। অতএব সর্বদা আমাদেরকে এমন তওবা এবং ইস্তেগফারের সন্ধানে থাকা উচিত যা হবে প্রকৃত তওবা। যেভাবে আমি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা এক স্থলে বলেন–

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ۝

অর্থাৎ আর নিশ্চয় আমি তাকে বেশি ক্ষমা করবো যে তওবা করে আর ঈমান আনে এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে আর হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। (সূরা তাহা 20: 83)

অতএব এখানে এটিও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তারা হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। অতএব স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তওবার সাথে সাথে পুণ্যকর্ম করা আবশ্যক। এখানে পুণ্যকর্ম অব্যাহত রাখার ওপর জোর দিয়েছেন এবং বলছেন এমন কোন ধারণা যেন মাথায় না থাকে যে, আমি নিজে প্রথমে মিমাংসার হাত বাড়িয়েছি বরং বলেছেন যে, তুমি এই যে হেদায়াতের কাজ

করেছ তা যদি তোমার মতে এটি পুণ্যকর্ম হয়ে থাকে তাহলে তা একবার করার বিষয় নয় যে, তওবা করলাম আর আমি আপোষ করলাম আর ক্ষমা চেয়ে নিলাম, বরং এর ওপর সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে আর হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা তোমাদেরকে খোদা তা'লার নৈকট্য দান করবে।

অতএব মন পরিষ্কার হওয়ার দাবি কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা হবে আর হেদায়াতের ওপর না কেবল প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে বরং পুণ্যকর্ম যেন প্রত্যেক নরনারী তথা প্রত্যেক আহমদীর এক পরিচিতিতে রূপ নেয় আর এই পরিচয় যেন অন্যদের জন্যও শিক্ষণীয় ও আদর্শ-স্থানীয় হয়। এখন প্রত্যেকেই নিজ হৃদয়কে খতিয়ে দেখতে পারে। কেননা হৃদয়কে যদি সত্যিকার অর্থেই পরখ করা হয় তাহলে বিবেকের সিদ্ধান্তই সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে। তবে শর্ত হলো, হৃদয় পবিত্র হওয়া আর এই মর্মে খোদাভীতি থাকা যে, আমার তওবা সত্যি তো?

আমার পুণ্যকর্ম কি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে? আর যদি তাই হয় তাহলে আমি কি কেবল আল্লাহ্‌র জন্য পুণ্যকর্ম অবলম্বন এবং মন্দকর্ম পরিত্যাগ করার ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত? কিছুকাল পর পর মানুষ যখন আত্মবিশ্লেষণ করে তখন বুঝতে পারে যে, আমি প্রতিষ্ঠিত আছি কিনা।"

(জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৫ জুন ২০১১;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৩ এপ্রিল ২০১২)

পারিবারিক জীবনে মুখ, কান এবং চোখের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–

"পারিবারিক বিবাদে দেখা গেছে যে, মুখ, কান এবং চোখ অনেক বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। পুরুষরাও এগুলোর যথাযথ ব্যবহার করে না। মহিলারাও এগুলোর সঠিক ব্যবহার করছে না। আমি পূর্বেও বলেছি যে, অধিকাংশ দম্পতি যারা আমাকে নসিহত করতে বলে, তাদেরকে আমি একথাই বলি যে, একে অপরের জন্য নিজের মুখ, কান এবং চোখের যথাযথ ব্যবহার করলে তোমাদের মাঝে কখনো কোন সমস্যা সৃষ্টি হবে না। ভাষার ব্যবহার যদি বিনম্র এবং সুমধুর হয় তাহলে কখনো সমস্যা সৃষ্টি হবে না। এমনিভাবে দেখা গেছে, পুরুষ হোক বা নারী, যখন কোন মোকদ্দমা আসে, ঝগড়া আসে তখন দেখা যায় পুরুষ বা নারীর মুখের ভাষাই উক্ত বিবাদ দীর্ঘায়িত করতে থাকে

আর এমন এক মুহূর্ত আসে যখন তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় অথবা এ সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হয় যে, আমাদের পক্ষে একত্রে থাকা সম্ভব নয়। এমনিভাবে উভয় পক্ষের রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়স্বজন সম্পর্কে কোন কথা শোনা বা এমন কথা যা শুনলে কোন ধরনের তিক্ততার আশংকা থাকে তবে তা শোনা থেকে নিজের কান বন্ধ রাখুন। অনেক সময় যদি কোন এক ব্যক্তি অথবা কোন এক দল কোন অন্যায় কথা বলে সেক্ষেত্রে অপর পক্ষও তাকে ঠিক তেমনি ঢিলের বদলে পাটকেল ছোঁড়ে। যদি বিবাদ মিটানোর জন্য কিছু সময়ের জন্য কান বন্ধ করে রাখা যায় তাহলে অনেক সমস্যা সেখানেই মিটে যেতে পারে, যদি না সেই পুরুষ বা মহিলা ঝগড়ায় অভ্যস্ত হয়। অতএব কান বন্ধ রাখো তাহলে নিরাপদ থাকবে।

আমি প্রায়শই একটি ঘটনা বলে থাকি আর ঘটনাটি সত্যও বটে। এক দম্পতি ঝগড়া করছিল আর একটি ছোট মেয়ে তাদেরকে দেখছিল এবং খুব অবাক হয়ে দেখছিল। কিছুক্ষণ পর তাদের খেয়াল হলো যে, আমরা তো অন্যায় করছি। নিজেদের লজ্জা ঢাকার জন্য তৎক্ষণাৎ তারা সেই মেয়েকে জিজ্ঞেস করল, তোমার বাবা-মা কি ঝগড়া করে না, তোমার আম্মু-আব্বু কি কথা কাটা-কাটি করে না অথবা একজন অন্যজনের সাথে কঠোর ভাষায় কথা বলে না অথবা রাগান্বিত হয় না? সে বলল, হ্যাঁ হয়। আমার আব্বা যদি রেগে যায় তখন আমার আম্মা চুপ হয়ে যায় আর আম্মা রেগে গেলে আব্বা চুপ হয়ে যান আর এভাবে আমাদের ঘরে ঝগড়া দীর্ঘায়িত হয় না। অতএব এর দ্বারা সন্তানের ওপরও ভালো প্রভাব পড়ে। একে অপরের দোষত্রুটি দেখার বদলে চোখ বন্ধ রাখুন আর একে অপরের উত্তম গুণাবলী দেখার জন্য নিজের চোখ খুলে রাখুন।

মোটকথা নারী-পুরুষ যেই হোক প্রত্যেকের মাঝেই ভালো গুণাবলীও থাকে আর খারাপ দিকও থাকে। আমি দেখেছি, সাধারণত শুরুটা পুরুষই করে অর্থাৎ তারা মহিলাদের খারাপ দিকগুলো দেখা আরম্ভ করে আর পাল্টা যখন মহিলারাও দোষত্রুটি সন্ধান করা আরম্ভ করে তখন তা এতটা দূরে চলে যায় যে, প্রত্যাবর্তনের আর কোন পথ থাকে না। অতএব এমন অবৈধ জিনিসের দিকে চোখ তুলে দেখাও উচিত না যার কারণে তোমাদের তাকওয়ার ওপর আঁচ আসতে পারে। এরপর রয়েছে ঘরের সমস্যাদি যার ফলে পারস্পরিক আস্থা হারিয়ে যায়, সেক্ষেত্রে যদি চোখের পবিত্রতা রক্ষা করা হয় তাহলে

আস্থা হারায় না আর সমস্যা শেষ হয়ে যায়। তাই নিজেদের হৃদয়কে অবৈধ কথার ঘাঁটি বা কেন্দ্রস্থল হতে দিও না এবং তা খোদাভীতিতে পরিপূর্ণ রাখো তাহলে কখনোই কোন সমস্যা সৃষ্টি হয় না। শয়তান কখনো পিছন-দরজা দিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করে ঘরে বিশৃঙ্খলা করে না। শয়তান এমন কোন ব্যক্তি নয় যার সম্পর্কে জানা যেতে পারে যে, সে কীভাবে এলো? প্রত্যেক অসৎ সঙ্গ, প্রত্যেক অসৎ বন্ধু যে তোমাদের ঘর ধ্বংস করার অপচেষ্টা করবে, যে স্বামীর বিরুদ্ধে অথবা শাশুড়ির বিরুদ্ধে অথবা ননদের বিরুদ্ধে অথবা স্বামীকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টা করবে অথবা এমন কোন একটি ছোট কথা বলে বসবে যার ফলে হৃদয়ে অস্বস্তি সৃষ্টি হয়। সুতরাং সে হলো শয়তান। অতএব এমন শয়তানের বিষয়ে সচেতন থাকা প্রত্যেক মু'মিন নরনারীর জন্য আবশ্যক। এই আস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেই সেই বন্ধনের যে ভিত্তি তা সুদৃঢ় হয়ে যায়। যদি এই আস্থা হারিয়ে যায় তবে সেই প্রাসাদ যা প্রেম ও ভালোবাসার চুক্তিতে নির্মিত হয়েছিল তা ধসে পড়ে বরং ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়।"

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় প্রদত্ত ভাষণ, ২৩ জুলাই ২০১১;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৪ মে ২০১২)

অনুগত স্ত্রী এবং মুত্তাকী স্বামী

পরিবারকে জান্নাতপ্রতীম বানানোর বিষয়ে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন–

"মহানবী (সা.) বলেছেন, দুনিয়া হলো জীবনোপকরণ অর্থাৎ দুনিয়া হলো এই জীবনের উপকরণ আর পুণ্যবতী স্ত্রীর চেয়ে অধিক মুল্যবান কোন জীবনোপকরণ নেই। যদি কোন মহিলা পুণ্যবতী হয় তবে এ জগতের কোন জিনিস তার চেয়ে উত্তম নয়। তাই পুরুষের মনোযোগ যেখানে এদিকে আকর্ষণ করেছেন যে, পুণ্যবতী মহিলাকে বিবাহ করো, সেখানে মহিলাদেরও এত চিন্তার খোরাক আছে যে, নিজেদের জীবনকে এমনভাবে গড়ার চেষ্টা করতে হবে যেভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) চেয়েছেন। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) সর্বোত্তম স্ত্রীর কী কী গুণাগুণ উল্লেখ করেছেন? বলেছেন, যে মহিলা নিজ স্বামীর কাজ স্বাচ্ছন্দ্যে সম্পাদন করে আর স্বামী যা নিষেধ করে তা থেকে সে বিরত থাকে। স্বামীর মাঝে যদি তাকওয়া তথা খোদা ভীতি না থাকে তাহলে এ বিষয়টি খুব কঠিন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও পরিবার রক্ষার্থে এবং

পারিবারিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার জন্য যতদূর সম্ভব চেষ্টা করতে থাকা উচিত। যথাসাধ্য বিবাদ দূর করার জন্য এই প্রচেষ্টা করা দরকার। মহানবী (সা.) তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে পরিবারের প্রশংসা করেছেন সেই পরিবারের জন্য কৃপাবারি লাভের দোয়াও করেছেন।

সেই পরিবারটি এমন হবে, যেখানে স্বামী নফল আদায় করার জন্য জাগ্রত হবে আর নিজ স্ত্রীকেও জাগাবে, স্ত্রী যদি গভীর ঘুমেও থাকে সেক্ষেত্রে পানির হালকা ছিটা দিবে। একইভাবে মহিলা যদি পূর্বে জাগ্রত হয় তাহলে একই পদ্ধতিতে স্বামীকে জাগ্রত করার ব্যবস্থা নিবে। এমন পরিবারে স্বামী-স্ত্রী যখন নফলের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে রাতে জাগ্রত থাকবে, সে পরিবার প্রকৃত অর্থে জান্নাতপ্রতীম হয়ে ওঠবে। আমার কাছে একটি বিবাদ এসেছিল। যেখানে স্বামীর অত্যাচারে বিচ্ছেদ ঘটতে যাচ্ছিল। সেই মহিলার চার-পাঁচটি সন্তানও ছিল। আমি বুঝিয়েছি, কিছুটা সংশোধনও হয়েছিল কিন্তু স্বামী পুনরায় অত্যাচার শুরু করে। পরবর্তীতে স্ত্রী 'খোলা' চেয়ে আবেদন করে। পরিশেষে দোয়া আর বুঝানোর ফলে আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেছেন আর তাদের উভয়ের মাঝে সমঝোতা হয়ে গেছে আর এখন ফজরের নামায যখন মসজিদে পড়তে আসে আর আমি যখন তাদের যেতে দেখি তখন খুব ভালো লাগে যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের কাণ্ডজ্ঞান দিয়েছেন আর তারা নিজ সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেদের সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করেছেন। অতএব স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, কেবল নিজেদের আবেগের বশে চললে হবে না বরং সন্তানদের আবেগেরও গুরুত্ব দিতে হবে। তাদের প্রতিও যত্নবান হতে হবে।"

(লাজনা ইমাইল্লাহ্, যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমায় প্রদত্ত ভাষণ, ৪ অক্টোবর ২০০৯; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৮ ডিসেম্বর ২০০৯)

পুরুষের দায়-দায়িত্ব

পরিবার-পরিজনের সাথে উত্তম আচরণ

হযরত আমীরুল মু'মিনীন (আই.) তার এক জুমুআর খুতবায় ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিভিন্ন উদ্ধৃতির বরাতে আলোকপাত করেছেন। এ প্রসঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার যথাযথভাবে প্রদান করা সম্পর্কে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–

"একটি হাদিস রয়েছে, হযরত যুহায়ের (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেন, ন্যায়বিচারক ব্যক্তি দয়ালু খোদার দক্ষিণ হস্তে নূরের মিম্বরে উপবিষ্ট থাকবে, (আল্লাহ্ তা'লার দুই হাতই তো দক্ষিণ হস্ত বলে গণ্য হয়)। তারা নিজেদের সিদ্ধান্তে, নিজেদের পরিবার পরিজনের ক্ষেত্রে আর যাদের জন্যই তত্ত্বাবধায়ক বানানো হয় তাদের সাথে সুবিচার করেন।"

(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল এমারাহ)

আরো বলেন–

"এই হাদীস অনুযায়ী পুরুষদেরকে সর্বদা এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'লার দয়ার অংশীদার যদি হতে হয়, আল্লাহ্ তা'লার জ্যোতি লাভের যোগ্য যদি হতে হয় তাহলে ন্যায়বিচারের দাবি পূরণ করার মাধ্যমে নিজের দায়িত্বও কর্তব্য পালন করতে হবে আর সন্তানদের তরবিয়তের দায়িত্ব পালন করতে হবে, তাদের বিষয়াবলীকে গুরুত্ব দিতে হবে বা তাদের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াবলীতে সাগ্রহে দৃষ্টি দিতে হবে অধিকন্তু তাদেরকে সমাজে একটা যোগ্য অংশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এমনটি যদি না হয় তাহলে তোমরা অন্যায় করছো এবং ন্যায়সংগত কোন কিছুই তোমাদের মাঝে অবশিষ্ট নেই।

কতক লোক এখানে অর্থাৎ ইংল্যান্ডে, জার্মানিতে এবং ইউরোপের কিছু দেশে অকর্মণ্য বসে কাটায়। সমাজে, বন্ধুমহলে বরং জামা'তের কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতেও বাহ্যত তারা অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং পূণ্যবান সাজে। কিন্তু স্ত্রী-সন্তানদেরকে তারা পাকিস্তানে রেখে এসেছেন অথচ খবরই নেই যে, এই অসহায়দের জীবন-জীবিকা কীভাবে চলছে? আবার এখানেও কিছু লোক নিজ পরিবারকে পৃথক করে রেখেছে। তাদের পরিবারগুলো কী করে দিনাতিপাত

করছে তার কোনই খবর নেই। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তারা বলে, স্ত্রীর ভেতর বাজে কথা বলার অভ্যাস ছিল, অমুক দোষ, তমুক দোষ ছিল। যদি মেনেও নেয়া হয় যে, এই লোকদের কথা সঠিক, তারপরও ইনসাফ ও ন্যায়নীতির দাবি হলো যতক্ষণ সে তোমার প্রতি আরোপিত হয় ততক্ষণ তার চাহিদা পূর্ণ করা তোমার দায়িত্ব। সন্তানদের চাহিদা পূর্ণ করা তো সর্বাবস্থায়ই পুরুষের দায়িত্ব। স্ত্রীদেরকে যদি শাস্তি দিয়েও থাক, তাহলে প্রশ্ন হলো সন্তানদেরকে শাস্তি দিচ্ছো কোন কারণে যে, তারাও দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছে? এমন লোকদের খোদা তা'লাকে ভয় করা উচিত। আহমদী হওয়ার পর এমন কাজ শোভা পায় না আর এটি আমি স্পষ্ট করে দিতে চাই যে জামা'তের ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিতে আসলে এমন কার্যকলাপ মোটেই সহ্য করার মত নয়। ইসলাম যে শিক্ষা দিয়েছে সেই শিক্ষার ওপর সর্বাবস্থায় আমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে আর এই যুগে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের সামনে তা আবারো পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন।

একটি হাদীস রয়েছে যাতে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেন, মু'মিনদের মাঝে তিনিই সবচেয়ে পূর্ণ ঈমানের অধিকারী, যিনি তাদের মাঝে সবচেয়ে উন্নত চরিত্রের অধিকারী আর তোমাদের মাঝে তারাই সর্বোত্তম, যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার করে থাকে।"

(তিরমিযী, কিতাবুর রিযা, বাব মা জাআ ফি হাক্কিল মারআতি আলা যাওজিহা)

পুরুষদের উদ্দেশ্যে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন–
"মনে কষ্ট দেয়া মহাপাপ আর মেয়েদের সাথে সম্পর্কের বিষয়গুলো বেশ সংবেদনশীল হয়ে থাকে। পিতামাতা যখন তাদেরকে নিজেদের থেকে পৃথক করে অন্যের কাছে হস্তান্তর করেন তখন ভেবে দেখ যে, হৃদয়ে তারা কত আশাভরসা লালন করেন আর মানুষ عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ নির্দেশ থেকেই এটি অনুমান করতে পারে"।

[আল বদর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬, ৮ জুলাই ১৯০৪, তফসীরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৬] (জুমুআর খুতবা, ৫ মার্চ ২০০৪, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৯ মার্চ ২০০৪)

একাধিক বিয়ের শর্ত এবং পূর্বের স্ত্রীদের অধিকার

পুরুষকে একের অধিক বিয়ের অনুমতি দিয়ে মহিলাদের ওপর অন্যায় করেছে বলে ইসলামের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ রয়েছে এর উত্তরে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) ৩১ জুলাই ২০০৪ যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বলেন–

"ইসলাম চারটি পর্যন্ত বিয়ে করার যে অনুমতি দিয়েছে, তা কিছু শর্তসাপেক্ষেই দিয়েছে। ঢালাওভাবে বিয়ে করে বেড়ানোর অনুমতি প্রত্যেকের জন্য নেই। প্রথম কথা হলো, তুমি তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হও এবং আত্মজিজ্ঞাসা কর যে, যে কারণে তুমি বিয়ে করছো তা বৈধ প্রয়োজন কিনা? অতঃপর এটিও দেখতে হবে যে, বিয়ে করার পর স্ত্রীর সাথে ন্যায়বিচার করতে পারবে কিনা আর যদি তা না করতে পার তাহলে তোমার বিয়ে করার কোন অধিকার নেই। তুমি যদি প্রথম স্ত্রীর প্রতি দায়-দায়িত্ব পালন না করে এবং তার অধিকার প্রদান নিশ্চিত না করে দ্বিতীয় বিয়ের চিন্তা কর সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিয়ে করার কোন অধিকার তোমার নেই।... হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, প্রথম স্ত্রীর এতটা খেয়াল রাখা উচিত এবং এতটাই তার মন রক্ষা করা উচিত যে, কোন পুরুষ যদি একাধিক বিয়ের প্রয়োজন অনুভব করে কিন্তু সে উপলব্ধি করে যে, দ্বিতীয় বিয়ে করার ফলে তার প্রথম স্ত্রী মর্মযাতনায় ভুগবে এবং চরমভাবে কষ্ট পাবে, এটি ভেবে যদি সে ধৈর্য ধারণ করে আর কোন প্রকার পাপে লিপ্ত না হয় অর্থাৎ কোন ধরনের পাপকর্মে না জড়ায় আর শরীয়তের কোন দাবিও পদদলিত না হয় এমন পরিস্থিতিতেও সে যদি প্রথম স্ত্রীর মন রক্ষায় নিজের চাহিদাকে জলাঞ্জলী দিয়ে একজন স্ত্রী নিয়েই জীবন কাটায় তাহলে কোন অসুবিধা নেই আর তার জন্য যুক্তিযুক্ত হবে দ্বিতীয় বিয়ে না করা।"

(মলফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৬৪-৬৫, লন্ডনে মুদ্রিত)

তিনি (আ.) আরো বলেন–

"এই একাধিক বিয়ে যেন কেবল বিয়ে করার শখ পূরণের জন্য না হয়। কতক পুরুষের বিয়ে করার আকাঙ্খা হয়ে থাকে, তাদেরকেও উত্তর দিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ যারা বলে, ইসলাম আমাদেরকে চারটি বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে।"

তিনি (আ.) বলেন–

"প্রথম বিষয় হলো তোমার যে প্রথম স্ত্রী রয়েছে তার অনুভূতির সম্মানার্থে যদি

ধৈর্য ধারণ করতে পার তাহলে তাই কর। হ্যাঁ, যদি শরীয়তের দিক থেকে আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে সে ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিয়ে কর। আর এমন অবস্থায় সচরাচর প্রথম স্ত্রীও অনুমতি দিয়ে দেয়। যাহোক সারকথা হলো, প্রথম স্ত্রীর আবেগকে সম্মান করে পুরুষের ত্যাগ স্বীকার করা উচিত আর একান্তই বাধ্যবাধকতা না থাকলে কেবল কামনা-বাসনার বসবর্তী হয়ে বিয়ে করা উচিত নয়।"

তিনি (আ.) বলেন–

"খোদা তা'লার কাছ থেকে যা কিছু আমরা অবগত হয়েছি তাতে আমরা কোন ধরনের ছাড় না দিয়ে হুবহু তা বর্ণনা করি। কুরআন শরীফ যে একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়েছে তার কারণ হলো, নিজেদেরকে তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত রেখে এবং অন্যান্য উদ্দেশ্য, যেমন পুণ্যবান সন্তানসন্ততি লাভ, আত্মীয়স্বজনের দেখাশোনা এবং তাদের অধিকার প্রদানের মাধ্যমে যেন তোমাদের পুণ্য অর্জন হয়। আর নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বা প্রয়োজনের নিরিখে, এক, দুই, তিন বা চারটি পর্যন্ত বিয়ে করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের মাঝে যদি ন্যায়বিচার করতে না পার তাহলে এটি পাপ হবে আর পুণ্যের পরিবর্তে শাস্তি পাবে অর্থাৎ একটি পাপকে ঘৃণা করে অন্যান্য পাপে সম্মত হয়ে গেলে।"

তিনি (আ.) আরো বলেন–

"খোদা তা'লার আইনকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনভাবে প্রয়োগ করা উচিত নয় আর তা এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত নয় যা তাকে শুধুমাত্র প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার এক ঢাল বা মাধ্যম প্রমাণ করে। স্মরণ রেখো! এমনটি করা পাপ। খোদা তা'লা বারংবার বলেন, রিপুর তাড়না যেন তোমাদের ওপর প্রভুত্ব করতে না পারে বরং তোমাদের প্রত্যেক কর্মের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তাকওয়া।"

(মলফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৬৩-৬৫)

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ, ৩১ জুলাই ২০০৪;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৪ এপ্রিল ২০১৫)

একাধিক বিয়ের বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) তাঁর ১৫ মে ২০০৯ সনের জুমুআর খুতবায় বলেন–

"পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়ে থাকলে বিভিন্ন শর্ত আরোপ করেই তা দিয়েছেন। ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে এই আপত্তিও করা হয়ে থাকে যে, একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়ে নারী জাতির ওপর অন্যায় করা হয়েছে অথবা পুরুষের আবেগ অনুভূতিকেই কেবল প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এটি বাছবিচারহীন কোন আদেশ নয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

وَ اِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تُقۡسِطُوۡا فِی الۡیَتٰمٰی فَانۡکِحُوۡا مَا طَابَ لَکُمۡ مِّنَ النِّسَآءِ مَثۡنٰی وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تَعۡدِلُوۡا فَوَاحِدَۃً اَوۡ مَا مَلَکَتۡ اَیۡمَانُکُمۡ ؕ ذٰلِکَ اَدۡنٰۤی اَلَّا تَعُوۡلُوۡا ۝

অর্থাৎ, তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, এতীমদের ব্যাপারে তোমরা ন্যায়বিচার করতে পারবে না, তবে তোমরা অন্য নারীদের মধ্য থেকে পছন্দমত দু'জন, তিনজন বা চারজনকে বিয়ে কর; কিন্তু তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তোমরা ন্যায়বিচার করতে পারবে না, তবে একজনই যথেষ্ট অথবা তোমাদের ডান হাত যাদের মালিক হয়েছে তাদেরকে বিয়ে কর। তোমাদের জন্য এটি অন্যায় এড়ানোর নিকটবর্তী ব্যবস্থা। (সূরা আন্ নিসা 4: 4) এই আয়াতে প্রথমত এতীম মেয়েদের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে।

এতীমদেরকেও বিয়ে কর কিন্তু তা যেন অন্যায়ের বশবর্তী হয়ে না হয় বরং তাদের পুরো প্রাপ্য প্রদান করে বিয়ে কর আর বিয়ের পর তাদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকো এবং কখনো এটি মনে করো না বা এই চিন্তা যেন কখনো মাথায় না আসে যে, এদের খোঁজ-খবর নেয়ার যেহেতু কেউ নেই, তাই তাদের সাথে যাচ্ছে-তাই ব্যবহার করা যাবে। আর নিজের স্বভাব সম্পর্কে যদি আশঙ্কা কর, যদি সন্দেহ থাকে যে, সুবিচার করতে পারবে না তাহলে স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে কর। ন্যায়বিচারের দাবি পূরণ সাপেক্ষে দুই, তিন এবং চারজন পর্যন্ত বিয়ে করার অনুমতি আছে কিন্তু ইনসাফ যদি করতে না পার তাহলে একের অধিক বিয়ে করো না। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন–

"যেসব এতীম মেয়েদেরকে তোমরা লালনপালন কর, তাদেরকে বিয়ে করতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে আত্মীয়স্বজন না থাকার

কারণে প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে তাদের ওপর অত্যাচার করবে তাহলে এমন নারীদেরকে বিয়ে কর যাদের পিতামাতা ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠি আছে, যারা তোমাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে আর তোমরাও তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকবে। ন্যায়বিচারের শর্তসাপেক্ষে এক, দুই, তিন ও চারটি পর্যন্ত বিয়ে করতে পার। কিন্তু সুবিচার যদি করতে না পার তাহলে প্রয়োজন থাকলেও একটিতেই সীমাবদ্ধ থাকো।"

(ইসলামী উসুল কি ফিলোসফি, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৭)

'প্রয়োজন থাকলেও', এটি খুবই অর্থবহ একটি বাক্য। এখন দেখুন! বর্তমান যুগের হাকাম-আদাল (মিমাংসাকারী ও ন্যায়বিচারক) এ কথার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন যে, প্রয়োজনের অজুহাতে তোমরা যে বিয়ে করতে চাও, তা আসলে মূল বিষয় নয়। বরং সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করাই মুখ্য বিষয়। আজকাল কোন না কোন স্থান থেকে এই অভিযোগ আসতে থাকে যে, সন্তানসন্ততি থাকা সত্ত্বেও স্বামী বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে বিয়ে করতে চায়।

প্রথম কথা যা বলেছেন তা হলো, সুবিচার যদি করতে না পার তাহলে বিয়ে করবে না আর ন্যায়বিচার বলতে সকল প্রকার অধিকার প্রদান করা বুঝায়। যদি সংসার চালানোর মত আয়-উপার্জনই না থাকে তাহলে আরেকটি বিয়ের বোঝা কাঁধে নেয়া মানে প্রথম স্ত্রী এবং সন্তানদের অধিকার হরণ করা বৈ-কী। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন, একান্ত বাধ্যবাধকতার কারণে যদি দ্বিতীয় বিয়ে করতেই হয় তাহলে এমতাবস্থায় প্রথম স্ত্রীর পূর্বের তুলনায় অধিক যত্ন নিবে।

(মলফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৩০, রাবওয়া থেকে মুদ্রিত)

কিন্তু বাস্তবে সমাজে আজকাল আমরা যা প্রত্যক্ষ করি তা হলো প্রথম স্ত্রী এবং সন্তানদের অধিকার প্রদানে মানুষ ক্রমশ উদাসীন হয়ে পড়ে আর আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশের পরিপন্থী কাজ করে থাকে। অতএব এটি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন যে, আর্থিক চাহিদা পুরণ এবং অন্যান্য অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে অবিচার তো হবে না? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আমাদের দৃষ্টিতে নিজকে পরীক্ষায় না ফেলাই মানুষের জন্য শ্রেয়।"

[আল্ হাকাম, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ৬ মার্চ, ১৮৯৮, পৃ. ২,
তফসীর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), সূরা আন্ নিসা, আয়াত-৪, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১১]

অর্থাৎ এখানে দ্বিতীয় বিয়ে করে পরীক্ষায় পড়ার কথা বলা হয়েছে। অতএব স্ত্রীর অধিকার প্রদান করা এমন একটি গুরু দায়িত্ব যে, তা প্রদান না করে মানুষ পরীক্ষায় নিপতিত হয় অথবা খোদা তা'লার অসন্তুষ্টির কারণও হতে পারে। মহানবী (সা.)-এর একটি দোয়ার কথা আমি উল্লেখ করেছিলাম। আল্লাহ্ তা'লার কাছে তিনি (সা.) এই দোয়া করতেন যে, (হে আল্লাহ্) বাহ্যতঃ আমি প্রত্যেক স্ত্রীর অধিকার প্রদানের চেষ্টা করি, কিন্তু কোন স্ত্রীর কোন গুণের কারণে যদি এমন কতক বিষয় প্রকাশ পায় যা আমার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত, তাহলে এমতাবস্থায় আমাকে ক্ষমা করো। আর এটি এমন এক বিষয়, যা সম্পূর্ণভাবে মানবপ্রকৃতি সম্মত। খোদা তা'লা, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং একাধিক বিয়ের অনুমতিও দিয়েছেন আর যিনি বান্দার হৃদয় এবং অন্তরের অন্তঃস্থল সম্পর্কেও সবিশেষ অবহিত এবং অদৃশ্য সম্পর্কেও জ্ঞাত। এ সম্পর্কে তিনি পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে বা কোন কোন পরিস্থিতিতে তোমরা কারো প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়তে পার। এমতাবস্থায় আবশ্যকীয় বিষয় হলো– তার আপাতঃ ও জাগতিক প্রাপ্য অধিকার পুরোপুরি প্রদান কর, যেমনটি সূরা নিসাতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۭ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

অর্থাৎ আর তোমাদের সর্বোত্তম সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তোমরা স্ত্রীদের মাঝে পূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবে না। অতএব তোমরা কোন একজনের প্রতি সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে যেয়ো না, যার ফলে অন্যজন অবহেলিত ও উপেক্ষিত হয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়ে যায়। আর তোমরা যদি নিজেদের শুধরে নাও এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও বার বার কৃপাকারী। (সূরা আন্ নিসা 4 : 130) অতএব এমন বিষয়, যা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে, সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ন্যায়বিচার করা সম্ভব নয়। কিন্তু যা মানুষের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সেক্ষেত্রে সুবিদিত ইনসাফ করা একান্ত আবশ্যক, যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি যে, পানাহার, পোশাক, বাসস্থান এবং সময় ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। কেবলমাত্র যদি খরচপত্র দাও কিন্তু সময় না দাও তাহলে এটিও

যথার্থ নয়। আর যদি শুধু বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দাও, সংসারের খরচাদি না দিয়ে মহিলাকে মানুষের কাছে হাত পাততে বাধ্য করা হয়, তবে এটিও সঙ্গত নয়। সুতরাং বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে সংসারের পূর্ণ দায়িত্ব পালন করা পুরুষের দায়িত্ব।

একটি হাদিসে রয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তির দুজন স্ত্রী রয়েছে আর সে যদি কেবলমাত্র একজনের প্রতি আকর্ষণ রাখে এবং অপর জনকে উপেক্ষা করে, সে ক্ষেত্রে কিয়ামত দিবসে শরীরের একটি অংশ কর্তিত অথবা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তাকে পুনরুত্থিত করা হবে।

(সুনান নেসাঈ, কিতাব আশরাতিন নিসা,
বাব মায়লুির রাজুল, হাদীস নম্বর ৩৯৪২)

অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তাকওয়া হচ্ছে উভয় স্ত্রীকে তাদের মৌলিক বা সুবিদিত প্রাপ্য প্রদান কর আর কোন স্ত্রীকেই এভাবে ছেড়ে দিও না, যার ফলে স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও সে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবে। তাকে ছাড়ছোও না আবার তার অধিকারও যথাযথভাবে প্রদান করা হচ্ছে না– একজন মু'মিন বা বিশ্বাসীর রীতি এমনটি হওয়া উচিত নয়। অতএব মু'মিনের কর্তব্য হলো, আল্লাহ্ তা'লা যা নিষেধ করেছেন তা করা থেকে বিরত থাকা ও আত্মসংশোধন করা।"

(জুমুআর খুতবা, ১৫ মে ২০০৯;
আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৫ জুন ২০০৯)

স্ত্রীর অধিকার প্রদান করা স্বামীর দায়িত্ব

হযরত আমীরুল মু'মিনীন (আই.) তাঁর একটি জুমু'আর খুতবায় নারীর অধিকার সম্পর্কে জগতের অনিহা-সংক্রান্ত বিভিন্ন দৃষ্টান্ত তুলে ধরে 'যোহদ' (যগৎ-বিমুখতা) শব্দের প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করেন। স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কের বরাতে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–

"হযরত ওয়াহাব (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হযরত সালমান (রা.) ও হযরত আবু দারদা (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন রচনা করেন। হযরত সালমান (রা.) হযরত আবু দারদা (রা.)-এর সাথে **স্বাক্ষাৎ** করতে এসে

দেখেন যে, হযরত আবু দারদা'র স্ত্রী আলুথালু বেশে গৃহস্থালি কাজের কাপড়চোপড় পরিধান করে আছেন এবং নিজের চেহারা অদ্ভূত ধরনের বানিয়ে রেখেছেন। সালমান (রা.) জিজ্ঞেস করেন, তোমার অবস্থা এমন কেন? উত্তরে সেই মহিলা বলেন, 'তোমার ভাই আবু দারদা (রা.)-র এ জগতের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই, তিনি জগৎ বিমুখ মানুষ।' ইতোমধ্যে আবু দারদা (রা.)-ও এসে পড়েন। তিনি হযরত সালমান (রা.)-এর জন্য খাবার প্রস্তুত করান আর তাকে বলেন, আপনি খাবার খেয়ে নিন, আমি রোযা রেখেছি। সালমান (রা.) বলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি না খাবেন আমিও খাবো না'। অতএব তিনি রোযা ভেঙ্গে ফেলেন (অর্থাৎ নফল রোযা রেখেছিলেন)। রাতের বেলা আবু দারদা (রা.) নামাযের জন্য উঠতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় সালমান (রা.) তাকে বলেন, এখন ঘুমিয়ে থাকুন, অতএব তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর তিনি নামাযের জন্য আবার উঠতে উদ্যত হলে সালমান (রা.) তাকে পুনরায় শুয়ে পড়তে বলেন। রাতের শেষ প্রহর সমাগত হলে সালমান (রা.) তাকে বলেন, এখন উঠুন।

সুতরাং তারা দু'জনেই উঠে নামায পড়েন। এরপর সালমান (রা.) বলেন, 'হে আবু দারদা (রা.), যেভাবে আপনার পালনকর্তার আপনার ওপর অধিকার রয়েছে, সেভাবে আপনার প্রাণেরও আপনার ওপর অধিকার রয়েছে আর একইভাবে আপনার স্ত্রীরও আপনার কাছে প্রাপ্য আছে। কাজেই প্রত্যেককে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করুন।' এরপর আবু দারদা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে আসেন আর তার কাছে পুরো ঘটনা বর্ণনা করেন। মহানবী (সা.) বলেন, 'সালমান (রা.) যথার্থই করেছেন'।"

(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল সওম, বাবু মান আকসামা 'আলা আখীহি লিইউফতিরা ফিত্ তাতাও'য়ে)

'যুহদ'-এর অর্থ এটি নয় যে, স্ত্রী ও সন্তানদেরকে আল্লাহ্ তা'লা যেসব জাগতিক অধিকার দিয়েছেন, মানুষ তা প্রদান করা ভুলে যাবে অথবা কাজকর্ম করা ছেড়ে দিবে। পার্থিব কাজকর্মও করবে কিন্তু তা যেন (জীবনের) একমাত্র উদ্দেশ্য না হয়, বরং প্রত্যেকের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা যেন অব্যাহত রাখে।'

(জুমুআর খুতবা, ৭ মে ২০০৪, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২১ মে ২০০৪)

একই বরাতে উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তৃতায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) বলেন, 'নারীদের সকল প্রকার স্বাধীনতা নিশ্চিৎ করার জন্য ইসলাম মহিলাদের এমন এক অধিকার দিয়েছে, যা কার্যত অনেকগুলো অধিকারের সমাহার। আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ۔ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۔ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۔ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ۝

অর্থাৎ, 'হে যারা ঈমান এনেছ! বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী সেজে বসা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আর তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ এর একাংশ ছিনিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে কষ্ট দিও না। তবে তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হলে ভিন্ন কথা। আর তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর। তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ কর সেক্ষেত্রে হয়তো তোমরা এমন কিছু অপছন্দ করছ, যার মাঝে আল্লাহ্ প্রভূত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।' (সূরা আন্ নিসা 4: 20)

কাজেই এটিও হলো নারীর একটি অধিকার। উদাহরণস্বরূপ, কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীর প্রতি অন্যায় করে, তাকে অপছন্দ করে, তার অধিকার পুরোপুরি প্রদান না করে আর তার সম্পত্তি ভোগ করার মানসে তাকে তালাকও না দেয় আর অপরদিকে সেই হতভাগা স্ত্রীকে এমন নির্যাতন করে, যার ফলে সে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায় এবং তার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি ভোগ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এছাড়াও অনেক সময় মহিলার দুর্নাম রটিয়ে ঘৃণ্য সব মিথ্যা কাহিনী রটানো হয় আর তাকে অধিকার বঞ্চিত করার লক্ষ্যে সেসব কথা বিচার বিভাগ ও আদালতে বর্ণনা করা হয়, অথবা অনেক সময় এসব দেশে আদালতের শরণাপন্ন হয়ে মহিলাদের কিছু সম্পত্তি বা অর্ধেক সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার অপচেষ্টা করা হয়। অথচ আল্লাহ্ তা'লা এটিকে পুরোপুরি অবৈধ আখ্যা দেন। এছাড়াও অনেক সময় আত্মীয়স্বজনরা তার স্বামীর সম্পত্তির ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রন বজায় রাখার জন্য বিধবাকে বিয়ে করতে দেয় না।

এসব ঘটনা বর্তমানেও ঘটছে আর ঘটে থাকে, যে বিষয়ে এমন অনেক অভিযোগ এসে থাকে। এগুলো এমন ঘটনা, যা পবিত্র কুরআন পনেরশ' বছর পূর্বে বর্ণনা করে এসব থেকে বিরত থাকার প্রতি পুরুষদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে যেন নারীর অধিকার সংরক্ষিত থাকে। এছাড়া অনেক সময় আত্মীয়স্বজনরাও মহিলাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের কোন আত্মীয়কে বিয়ে করতে বাধ্য করে যাতে তার প্রয়াত স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পত্তি পরিবারের বাইরে না যায়।

স্বামীও অনেক সময় অন্যায়ভাবে স্ত্রীর সম্পত্তি কুক্ষিগত করে। যেমনটি পূর্বেও বলা হয়েছে, এসব দেশে আইনের মারপ্যাঁচে এগুলো করা হয় আর স্বামীর আত্মীয়স্বজন তার মৃত্যুর পরও এমনটি করা অব্যাহত রাখে। স্বামী না করলেও তার আত্মীয়স্বজনরা এমনটি করা আরম্ভ করে দেয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, এর সবকটি কাজই নিষিদ্ধ আর এসব নারীকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার নামান্তর।

যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, মহিলার বৈধব্য বা তালাকের পর স্বেচ্ছায় বিয়ে করার অধিকার তার রয়েছে। কিন্তু ওলী ছাড়া যেহেতু মহিলার বিয়ে হতে পারে না, তাই যদি এমন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় তবে সেই মহিলা যুগ খলীফার কাছে আবেদন করতে পারে। বৈধ কোন কারণ যদি থাকে, তাহলে যুগ খলীফা ওলী হতে পারেন অথবা ওলী নিযুক্ত করতে পারেন বা উকিল নিযুক্ত করতে পারেন। কাজেই, নারীর অধিকার সংরক্ষণ করে আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে বলেন, عَاشِرُوْاهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ অর্থাৎ তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর। (সূরা আন নিসা 4: 20)

অন্যায় অবিচার করার অজুহাত সন্ধান করো না আর তাদের সম্পদের প্রতিও (লোভাতুর) দৃষ্টি দিও না। উপরন্তু তাদেরকে তোমরা যা দিয়েছ, তার দিকেও তাকাবে না।

মহানবী (সা.) বলেন, خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهٖ অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করে"। এরপর তিনি (সা.) বলেন, "নিজ স্ত্রীদের সাথে সবচেয়ে উত্তম ব্যবহারকারী হলাম আমি"।

(সুনান ইবনে মাজাহ্, কিতাবুন নিকাহ্, বাবু হুসনে মুয়াশেরাতুন নিসা, হাদীস নং-১৯৭৭)

অতএব, দেখুন! কুরআনের শিক্ষার পাশাপাশি স্বীয় আদর্শ দ্বারাও মহানবী (সা.) নারীর অধিকার সংরক্ষণের প্রতি পুরুষদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

এই আয়াতে (অর্থাৎ সূরা আন্ নিসার ২০ নম্বর আয়াতে) আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, 'মহিলারা যদি প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয় তা ব্যতীত'। স্পষ্ট হওয়া উচিৎ যে, সম্পদ কুক্ষিগত করার সাথে এর কোনই সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ এমনটি নয় যে, কোন মহিলা যদি কোনরূপ প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয় তাহলে পুরুষ তার সম্পদ কুক্ষিগত করার অধিকার রাখবে, বরং এর সম্পর্ক সদ্ভাবে জীবনযাপনের সাথে অথবা অধিকার প্রদানের সাথে।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এ কারণে (অর্থাৎ প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হলেও) তাকে নিজের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করো না আর তোমাদের ওপর তার যে অধিকার রয়েছে তা থেকেও তাকে বঞ্চিত রাখার চেষ্টা করো না। যে পুরুষ তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়েও মহিলাকে কষ্ট দেয় অথবা তাকে তালাক দেওয়ার হুমকী দেয়, এসবের বিপরীতে নারীর অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'লা এখানে পুরুষদেরকেই নসীহত করেছেন।

আরো বলেছেন–
"মহিলার ভুলত্রুটি এবং দুর্বলতা উপেক্ষা কর আর কেবলমাত্র উপেক্ষাই করবে না বরং তার সাথে স্নেহ ও দয়াসুলভ আচরণ কর। এই স্নেহ ও ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহার কেবল কোন বিষয়ে প্রীত হলেই করবে না বরং তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দও করো তবুও এমনটি করো। অতএব এটিই হচ্ছে সেই উন্নত মান, যা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলাম নির্ধারণ করেছে।"

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, "কোন মানুষ যখন নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে নেয় বা কাজ শেষ করে, যার জন্য তাকে সফর করতে হয়েছে তখন তার উচিৎ আপন আত্মীয়-স্বজনের কথা মনে করে দ্রুত ঘরে ফিরে আসা।"

(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং: ৩০০১)

আর একজন বিবাহিত পুরুষের জন্য তার নিকটাত্মীয় হচ্ছে তার স্ত্রী-সন্তানরা। আজ আমরা দেখি যে, কোন কোন পরিবারে মহিলারা নিঃসঙ্গ বা একা পড়ে

থাকে। বিয়ের পর মেয়েরা এখানে আসে। এসব দেশে তাদের পরিচিত কেউ নেই আর তারা ঘরে আবদ্ধ হয়ে থাকে। এসব দেশের আবহাওয়াও এমন যে, অনেক সময় মানুষ ডিপ্রেশন বা বিষন্নতার শিকার হয়ে যায় অথচ পুরুষরা কাজকর্ম শেষ করে নিজেদের বন্ধু-বান্ধবের সাথে বসে গল্পগুজব করতে থাকে। অতএব মহানবী (সা.) নারীর এই অধিকারও নিশ্চিৎ করেছেন আর পুরুষদেরকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন যে, নারীদেরকে তাদের অধিকার প্রদান কর। আত্মীয়স্বজনকে তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান কর। সন্তানদেরকে তাদের অধিকার প্রদান কর। এই কাজকে মহানবী (সা.) খুবই অপছন্দ করেছেন যে, বসে বসে গালগল্প করা হবে আর মহিলাকে উপেক্ষিতভাবে ছেড়ে দেওয়া হবে।

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৬ জুলাই ২০০৮; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৫ এপ্রিল ২০১১)

পুরুষের আচার-আচরণ এবং তাদের উদ্দেশ্যে উপদেশ

পুরুষদের অসঙ্গত আচারব্যবহার চিহ্নিত করে হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর এক জুমুআর খুতবায় বলেন–

"কতক অদ্ভুত অভিযোগও আসে। যেমন, বাড়িতে একজন আরাম কেদারায় বসে পত্রিকা পড়ছেন। পিপাসা লাগলে স্ত্রীকে ডেকে বলেন, ফ্রিজ থেকে পানি বা জুস বের করে আমাকে পান করাও। অথচ ফ্রিজ তার নাগালের ভিতর এবং নিজেই তা বের করে পান করতে পারে। সংসারের কাজ অথবা ব্যস্ততার কারণে বা অন্য কোন কারণে হতভাগী স্ত্রীর যদি আসতে বিলম্ব হয়, তখন তার ওপর সে তর্জনগর্জন আরম্ভ করে দেয়। একদিকে দাবি হলো, মহানবী (সা.)-এর প্রতি আমাদের ভালোবাসা রয়েছে আর অপরদিকে কাজ কী করছে! সামান্য সচ্চরিত্রও এরা প্রদর্শন করে না। এমন অনেক উদাহরণ সামনে আসে। জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয়া হয় যে, পবিত্র কুরআনে মহিলাদের শাসন করার অনুমতি আমাদেরকে দেয়া হয়েছে। স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, কুরআনে এমন কোন অনুমতি নেই।

এভাবে আপনি আপনার ব্যক্তিগত কামনাবাসনার বশবর্তী হয়ে পবিত্র কুরআনকে দুর্নাম করবেন না। পারিবারিক জীবন সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর সাক্ষ্য হলো, মহানবী (সা.) সব মানুষের মাঝে সবচেয়ে

নম্রভাষী আর সবচেয়ে বেশি দয়ালু ছিলেন। ঘরে তিনি সাধারণ মানুষের মতই অকৃত্রিম জীবন কাটাতেন। তিনি কখনো ভ্রুকুঞ্চিত করেন নি আর সর্বদা হাসিখুশি থাকতেন। তিনি (রা.) আরো বলেন, সারা জীবনে মহানবী (সা.) কখনো তাঁর স্ত্রীদের গায়ে হাত তুলেন নি আর সেবকদেরকে কোনদিন মারেন নি এবং তাদেরকে কখনো কিছু বলেনও নি।"

[শামায়েলে তিরমিযী, বাবু মা জায়া ফি খুলকে রসুলূল্লাহ্ (সা.)]

(জুমুআর খুতবা, ২ জুলাই ২০০৪, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, মিসিসাগা, কানাডা;
১৬ জুলাই ২০০৪, আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল)

প্রত্যেকেই রাখাল বা তত্ত্বাবধায়ক

সুপ্রসিদ্ধ একটি হাদিসের বরাতে হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর একটি জুমুআর খুতবায় পরিবার-প্রধানকে তার পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের রাখাল বা তত্ত্বাবধায়ক হওয়া সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নসীহত করেন। পরিবারের কর্তা হিসেবে পুরুষদেরকে তাদের পরিবারের অন্য সদস্যদের তত্ত্বাবধান করা সম্পর্কে হুযূর বলেন–

"হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-কে আমি একথা বলতে শুনেছি যে, তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই তত্ত্বাবধায়ক আর দায়িত্ব সম্পর্কে প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ইমাম হচ্ছে নিগরাণ বা তত্ত্বাবধায়ক, তাকেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। পুরুষ তার পরিবার পরিজনের তত্ত্বাবধায়ক, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। মহিলা তার স্বামীর ঘরের তত্ত্বাবধায়ক আর তাকেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। চাকর তার মালিকের সম্পদের নিগরাণ, তাকেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় মহানবী (সা.) একথাও বলেছিলেন যে, পুরুষ তার পিতার সম্পদের নিগরাণ বা তত্ত্বাবধায়ক, তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। আরো বলেন, তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিগরাণ বা তত্ত্বাবধায়ক, প্রত্যেককেই তার দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"

(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল জুমুআ, বাবুল জুমুআহ্ ফিল্ কুরা ওয়াল মুদুন)

অতএব এই হাদীসে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা নিজ নিজ গণ্ডিতে নিগরাণ বা তত্ত্বাবধায়ক; কিন্তু এখন যেহেতু আমি পুরুষদের

সম্পর্কে বলছি তাই এ সম্পর্কে কিছুটা ব্যাখ্যা দিতে চাই। সাধারণত এখন যা প্রচলন হয়ে গেছে তা হলো, পুরুষরা বলে, আমাদের ওপর যেহেতু বাইরের দায়-দায়িত্ব ন্যস্ত, আমরা যেহেতু নিজেদের ব্যবসাবাণিজ্য ও চাকরীবাকরী নিয়ে ব্যস্ত থাকি তাই ঘরের প্রতি মনোযোগ দিতে পারি না; সুতরাং সন্তানদের নিগরাণী বা পরিচর্যার পুরো দায়িত্ব মহিলাদের।

স্মরণ রাখবেন, পরিবারের কর্তা হিসেবে পুরুষের দায়িত্ব হলো, নিজেদের ঘরের পরিবেশের প্রতি দৃষ্টি রাখা, নিজের স্ত্রীর অধিকারও প্রদান করা আর নিজের সন্তানদের অধিকার প্রদান করা, তাদেরকে সময় দেয়া, তাদের সাথেও কিছুটা সময় কাটানো আর তা সপ্তাহের দু'টি দিনই হোক না কেন যা সপ্তাহান্তে এসে থাকে। তাদেরকে মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত করা। তাদেরকে জামা'তী অনুষ্ঠানাদিতে নিয়ে আসা। তাদেরকে নিয়ে বিনোদনমুলক প্রোগ্রাম করা আর তাদের পছন্দের বিষয়াদিতে অংশ নেয়া, যাতে একজন বন্ধুর মত তারা আপনার সাথে তাদের সমস্যাদির কথা আলাপ করতে পারে। স্ত্রীর কাছে তার সমস্যাদি এবং সন্তানদের সমস্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন এবং সেগুলো সমাধান করার চেষ্টা করুন। তবেই আপনি পরিবারের একজন কর্তার মর্যাদা পেতে পারেন। কেননা কোন জায়গার প্রধানের যদি নিজের অধিনস্ত গণ্ডিতে বসবাসকারীদের সমস্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে তাহলে সে সফল নেতা আখ্যায়িত হতে পারে না। এজন্য উত্তম নিগরাণ বা তত্ত্বাবধায়ক সে-ই যে নিজ পরিবেশ সম্পর্কে অবহিত। উদ্বেগের বিষয় হলো, ধীরে ধীরে এমন লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে যারা নিজেদের দায়িত্ব ও তত্ত্বাবধানের গণ্ডি এড়িয়ে চলতে চায় অথবা দায়িত্বের প্রতি চোখ বন্ধ করে রাখে এবং আপন জগতে বিভোর থেকে জীবন কাটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। কাজেই, মু'মিনের তথা একজন আহমদীর এসব বিষয়ের সাথে দূরতম কোন সম্পর্কও থাকা উচিৎ নয়। জাগতিক বিষয়াদির কথা না হয় বাদই দিলাম, ধর্মের ক্ষেত্রেও যদি তোমাদের ব্যস্ততা এমন হয়ে থাকে বা আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের ক্ষেত্রে তোমরা স্থায়ীভাবে নিজেদের এই রীতি বানিয়ে থাক বা এই রুটিন বানিয়ে নাও যে, নিজেদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংবাদই তোমরা রাখ না, নিজের স্ত্রী-সন্তানদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান কর না, তোমাদের সাথে যারা মেলামেশা রাখে তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান কর না আর নিজেদের সামাজিক দায়-

দায়িত্ব পালন কর না–তাহলে এটিও অন্যায়। তাকওয়ার উন্নত মান এভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না। বরং এই মান অর্জন করতে হলে আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্যও প্রদান করো আর বান্দাদের প্রাপ্য অধিকারও প্রদান করো।

যেমনটি একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) আমাকে সম্বোধন করে বলেন, "হে আব্দুল্লাহ্! আমাকে যা বলা হয়েছে তা কি সত্য যে, তুমি সারাদিন রোযা রাখ আর সারারাত দণ্ডায়মান থাকো (অর্থাৎ নামায পড়)? তখন আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! একথা সত্য। তিনি (সা.) বলেন, এমনটি কোরো না। মাঝে মাঝে রোযা রাখ আর মাঝে মাঝে রেখো না। রাতে নামাযের জন্য দাঁড়াবে আবার ঘুমাবেও। কেননা তোমার ওপর তোমার দেহেরও অধিকার আছে। তোমার চোখেরও তোমার ওপর অধিকার আছে, তোমার স্ত্রীরও তোমার ওপর অধিকার আছে এবং তোমার সাথে যারা দেখাসাক্ষাৎ করতে আসে তাদেরও তোমার ওপর অধিকার রয়েছে।"

(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুস সওম, বাবু হাক্কুল জিসমে ফিস্ সওম)

পরিবারের কর্তা হিসেবে মহানবী (সা.) পরিবারের সদস্যদের অধিকার প্রদান কীভাবে নিশ্চিৎ করতেন এ সম্পর্কে হযরত আসওয়াদ (রা.)-এর একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। তিনি বলেন, "আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করি যে, মহানবী (সা.) বাড়িতে কী কী করতেন? তিনি (রা.) বলেন, তিনি (সা.) নিজের পরিবার-পরিজনের সেবায় রত থাকতেন আর যখন নামাযের সময় হতো তখন নামাযের জন্য (মসজিদে) যেতেন।"

(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আযান)

কাজেই তাঁর চেয়ে বেশি ব্যস্ত আর তাঁর (সা.) চেয়ে বেশি ইবাদতকারী আর কে হতে পারে? কিন্তু দেখুন! মহানবী (সা.)-এর আদর্শ কী ছিল? গৃহস্থালী কাজকর্মে কত বেশি আগ্রহ ছিল দেখুন! ঘরের কাজকর্মও করছেন আবার অন্যান্য কাজেও অংশ নিতেন। তিনি (সা.) বলতেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে নিজের পরিবারের সাথে ব্যবহারে উত্তম। আর তিনি (সা.) বলেন, আর নিজের পরিবারের সাথে সদ্ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমি তোমাদের সবার চেয়ে এগিয়ে আছি।"

(তিরমিযী, কিতাবুল মানাকেব)

আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিৎ যে, এই সুন্দর দৃষ্টান্ত ও আদর্শ অনুসারে আমরা চলি কিনা?

(জুমুআর খুতবা, ২ জুলাই ২০০৪, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, মিসিসাগা, কানাডা;
১৬ জুলাই ২০০৪, আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল)

তালাক অথবা খোলা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা নারী-পুরুষের বিচ্ছেদকে অপছন্দনীয় বলে ঘোষণা করেছেন কিন্তু বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে বৈধ আখ্যা দিয়েছেন। এ সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) বলেন–

অনেক সময় বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা হয় না, স্বভাব মিলে না অথবা এর অন্য কোন কারণও থেকে থাকে। এমতাবস্থায় ইসলাম উভয়কে বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার প্রদান করেছে আর এই অধিকার কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে পুরুষদেরকে 'তালাক' এবং মহিলাদেরকে 'খোলা'র আকারে দেয়া হয়েছে।

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৩১ জুলাই ২০০৪; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৪ এপ্রিল ২০১৫)

বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ হিসেবে নৈতিক কতিপয় অবক্ষয় বা দুর্বলতাকে চিহ্নিত করে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) বলেন–

"খোলা এবং তালাকের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এটি অত্যন্ত ভয়ানক এক অবস্থা। কোন একটি জায়গায় এসে এটি থেমে যায় নি বরং আমি খতিয়ে দেখেছি যে, খোলা ও তালাকের হার প্রতি বছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে। উভয়পক্ষই কিছুটা সত্য আর কিছুটা মিথ্যা বলে নিজেদের কেস দৃঢ় করার চেষ্টা করে। এছাড়া একে অন্যের সামনে মিথ্যা বক্তব্য উপস্থাপন করে পারস্পরিক আস্থা হারায়। যেমনটি আমি বলেছি, আমার কাছে এটি উদ্বেগের কারণ। কেননা জামা'তের ভিতর খোলার সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে আর খোলা নেয়া হয় মহিলাদের পক্ষ হতে। যেমনটি আমি বলেছি, জার্মানিতেও অবস্থা খুবই দুঃখজনক।"

হুযূর (আই.) আরো বলেন, যদিও ইসলামে তালাক এবং খোলা বৈধ কিন্তু মহানবী (সা.) বলেছেন, মহান আল্লাহ্ তা'লার কাছে এটি খুবই অপছন্দের ও ঘৃণার বিষয়।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুত তালাক, হাদীস নং: ২১৭৮)

অতএব মু'মিন নারী ও মু'মিন পুরুষের মহিমা হলো, যদি একান্ত বাধ্য হয়েই এমন বিষয়ের সম্মুখীন হয়ে যায় তাহলে ন্যায়বিচারের দাবি পূরণ করা এবং খোদাভীতিকে হৃদয়ে স্থান দিয়ে সত্য কথা বলা। সত্যের আঁচল কোন

অবস্থাতেই পরিত্যাগ করবে না। কারণ মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হলো, সে কখনো মিথ্যা কথা বলে না।

(জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৫ জুন ২০১১)

তালাক বা খোলার ক্ষেত্রে পরস্পরের দোষত্রুটি ঢেকে রাখার উপদেশ দিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–

"স্বামী-স্ত্রীর অনেক ঝগড়াবিবাদের কথা জামা'তের কাছে এসে থাকে, কাযা বা বিচার বিভাগে আসে, খোলা অথবা তালাক–সংক্রান্ত বিবাদ হয়; এগুলো অপছন্দনীয় কাজ। যাহোক, কোন কারণে নারী-পুরুষের মাঝে যদি বনিবনা না হয় তাহলে পুরুষের তালাক দেওয়ার অধিকার আছে আর নারীরও খোলা নেওয়ার অধিকার রয়েছে। সুলাহ্ বা মীমাংসাকারীদের সামনে অনেক সময় বিভিন্ন কথা বর্ণনা করতে হয়। প্রয়োজনীয় বা মূল বিষয়াদি বর্ণনা করা বৈধ কিন্তু অনেক সময় এমনও হয় যে, স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্যান্য আত্মীয়স্বজনও এতে জড়িয়ে যায় আর তারা একে অপরের প্রতি একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে অপবাদ আরোপ করতে থাকে, যা শুনতেও বাধে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এমনই যে এক্ষেত্রে কিছু গোপন বিষয়ও প্রকাশ পেয়ে যায়। কাজেই কলহ-বিবাদের পর একথাগুলো বাইরে ফাঁস করা বা নিজের আত্মীয়স্বজনের কাছে অপর পক্ষকে দুর্নাম করার জন্য বলে বেড়ানো, (যাতে অন্যত্র তাদের বিয়ে না হয়) মহা অন্যায়। এ সম্পর্কে তিনি (আই.) বলেন, যদি এমন অপকর্ম কর তাহলে এটি চরম নির্লজ্জতা ও বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। বিশ্বাসঘাতক সম্পর্কে এ সতর্কবাণী রয়েছে যে, বিশ্বাসঘাতক প্রথমত মু'মিন নয়, মুসলমানও নয় আর জাহান্নামীও বটে।"

(জুমুআর খুতবা, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৪, বাইতুল ফুতুহ্, লন্ডন; খুতবাতে মসরূর, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১১, সংস্করণ ২০০৫, রাবওয়ার নাশারাতে ইশায়াত কর্তৃক প্রকাশিত)

তালাকপ্রাপ্তা নারীদের প্রাপ্য অধিকার

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) তাঁর এক জুমুআর খুতবায় ইসলামে তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে যেসব অধিকার প্রদান করা হয়েছে তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–

"তালাকপ্রাপ্তা নারীদের অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে তালাক যদি হয়ে যায় তাহলে মহিলার জন্য একটি ইদ্দত বা মেয়াদ রয়েছে যা পূর্ব-নির্ধারিত। এরপর বিবাহ করার ক্ষেত্রে সে স্বাধীন। অন্যত্র নির্দেশ রয়েছে যে, তোমরা তাদের

বিবাহের পথে বাদ সেধোনা বরং বিবাহের ক্ষেত্রে সাহায্য কর। সে নিজে সুস্থ চিন্তাধারা রাখে, তাই যদি সে পুনরায় বিবাহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে করুক। কিন্তু মহিলাদের জন্য নির্দেশ হলো, তালাকের পর যদি বুঝতে পার যে, তুমি অন্তঃসত্ত্বা তাহলে নিজের (প্রাক্তন) স্বামীকে তা অবহিত কর এবং তা গোপন করা উচিৎ নয়। বিয়ের পর যদি কোন কারণে বনিবনা না হয় তাহলে এমনটি হওয়া উচিত নয় যে, প্রতিশোধ নেয়া আরম্ভ করবে আর সন্তান যে ভুমিষ্ঠ হতে যাচ্ছে তা এই সন্তানের পিতাকে অবহিত করবে না। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, হতে পারে এভাবে তোমার জানানোর ফলে তার মন নরম হয়ে যাবে আর সে তোমার কাছে ফিরে আসবে আর তোমাদের সংসার টিকে যাবে। তিনি বলেন, স্বামী তাকে (অর্থাৎ স্ত্রীকে) ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার বেশি রাখে আর এভাবে পরিবারটি রক্ষা পেতে পারে আর মনোমালিন্য দূর হতে পারে। অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের জন্য নির্দেশ হলো, তারা যেন এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক না হয়। অনেক সময় নিকট আত্মীয়রাও মেয়েকে বিপথে পরিচালিত করে। সে (অর্থাৎ মেয়ে) যদি নিরবও থাকে বা স্বামীর কাছে ফিরে যেতে সম্মত হয়, নিকট আত্মীয়রা তখন এই বলে হইচই আরম্ভ করে দেয় যে, একবার যেহেতু তালাক হয়ে গেছে, তাই আমরা আর মেয়েকে ফেরত পাঠাবো না। অহমিকা ও মিথ্যা সম্মানের প্রশ্ন উঠে। আমার কাছে এমন অনেক বিষয় এসে থাকে। অবাক হতে হয় যে, অনেক সময় মিথ্যা অহমিকার বশবর্তী হয়ে মেয়েদের পরিবারকে ধ্বংস করে দেয়। এরপর অনেক মেয়ে চিঠি লিখে যে, আমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জন একসাথে থাকতে চাই কিন্তু উভয় পক্ষের অভিভাবকদের আমিত্ব ও অহমিকার কারণে সমস্যা প্রকট রূপ ধারণ করেছে। এমন ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এই সম্পর্ক পুনর্বহালের ক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজনের অন্তরায় হওয়া উচিৎ নয়। পুরুষ যদি তার ভুল বুঝতে পারে তাহলে মিথ্যা অহমিকার বশবর্তী হয়ে মেয়ের সংসার বরবাদ করা উচিৎ নয়। নারীর অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন, রীতি অনুসারে পুরুষের ওপর নারীর ততটুকু অধিকার রয়েছে যতটুকু রয়েছে নারীর ওপর পুরুষের।"

যে আয়াত আমি পাঠ করেছিলাম এখন এর অনুবাদও পড়ে দিচ্ছি। (আল্লাহ্ তা'লা) বলেছেন, "আর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা নিজেদের ব্যাপারে তিন ঋতুস্রাবকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। তারা যদি আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান

রাখে তাহলে আল্লাহ্ তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের জন্য বৈধ নয়। আর তারা আপোস মীমাংসা করতে চাইলে তাদের স্বামীরা নির্ধারিত এ সময়ের মধ্যে তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার বেশি অধিকার রাখে। আর রীতি অনুসারে পুরুষের ওপর নারীর ততটাই অধিকার রয়েছে যেরূপ অধিকার নারীর ওপর পুরুষের রয়েছে। কিন্তু তাদের ওপর পুরুষদের এক প্রকার প্রাধান্যও আছে। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন মহা পরাক্রমশালী এবং পরম প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আল্ বাকারা: ২২৯)

(জুমুআর খুতবা, ১৬ নভেম্বর ২০০৭; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৭)

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–

"বিয়ের পর কখনো কখনো স্বামী-স্ত্রীর বনিবনা হয় না। স্বভাব-চরিত্রে মিলে না অথবা অন্য কোন কারণ দেখা দেয়। এমতাবস্থায় ইসলাম উভয়কে বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার দিয়েছে। নির্দিষ্ট কিছু শর্তে পুরুষকে তালাকের অধিকার দিয়েছে এবং নারীকে খোলা নেয়ার অনুমতি প্রদান করেছে। পুরুষদের জন্য এই নির্দেশ রয়েছে যে, অধিকার খাটাতে গিয়ে নারীর ওপর অত্যাচার কর না। এ ধরণের বাড়াবাড়ি যদি কর, তাহলে এটি হবে অন্যায় আর এ অন্যায়ের শাস্তিও তোমরা পাবে।

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(সূরা আল্ বাকারা 2: 228)-এর ব্যাখ্যায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এর অর্থ হলো, "আর যদি তারা তালাক দেয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেক্ষেত্রে তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।" অর্থাৎ, "আর সেই নারী যাকে তালাক দেয়া হয়েছে সে যদি আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে নির্যাতিতা হয় আর অভিশাপ দেয় তাহলে খোদা তার অভিশাপ গ্রহণ করবেন।"

[তফসীর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সূরা আল্ বাকারার ২২৮]

দেখুন! পুরুষদেরকে কীভাবে সতর্ক করা হয়েছে। দেখুন! আপনাদের অধিকার প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কত কঠোরভাবে পুরুষদের সতর্ক করা হয়েছে। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) একথাও বলেছেন যে, "এসব অধিকার এমন যে, মানুষ যদি এ সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত হয় তাহলে সে বিয়ে করার পরিবর্তে চিরকুমার থাকাই পছন্দ করবে। যে ব্যক্তি খোদা তা'লার সতর্কবাণীর

সীমা-পরিসীমার মাঝে থেকে জীবনযাপন করে সে-ই এগুলো যথাযথভাবে পালন করতে পারে। এমন সুখ যার ফলে সর্বদা ঐশী শান্তির আশঙ্কা লেগে থাকে, তার চাইতে কষ্টদায়ক জীবন কাটিয়ে দেয়া সহস্র গুণ শ্রেয়।"

(মলফূযাত ৭ম খণ্ড, পৃ. ৬৩-৬৪, লণ্ডন থেকে প্রকাশিত)

হুযূর (আই.) বলেন–

"অর্থাৎ নারীর জন্য আল্লাহ্ তা'লা যেসব অধিকার নির্ধারণ করেছেন তা প্রদান না করলে পুরুষকে তিনি যে কত কঠিন শাস্তিতে নিপতিত করতে পারেন– যদি পুরুষরা তার উপলব্ধি রাখত আর জানতো তাহলে তারা হয়তো একটি বিয়ে করাও পছন্দ করতো না। একটি বিয়ে করাও তাদের জন্য কঠিন হয়ে যেতো। কেননা জানা নেই কোন্ কারণে, বা নারীর কোন্ অধিকার প্রদান না করার ফলে তারা আল্লাহ্ তা'লার কাছে শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হয়ে তাঁর ক্রোধভাজন হবে।"

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৩১ জুলাই ২০০৪; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৪ এপ্রিল ২০১৫)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী (রা.)-এর অনুকরণীয় আদর্শ

পারিবারিক সমস্যাদি প্রসঙ্গে হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর একটি জুমুআর খুতবায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দিক-নির্দেশনা এবং তাঁর (আ.)-সাহাবীদের আদর্শের কথা উল্লেখ করেন। সাহাবীদের জীবনে সংঘটিত পবিত্র পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন–

"হযরত চৌধুরী মুহাম্মদ আকবর সাহেব বর্ণনা করেন, একজন সাহাবী হলেন, চৌধুরী নযর মাহমুদ সাহেব, যিনি শাহ্পুর জেলার আদরাহমাহ্ নিবাসী ছিলেন এবং হযরত মৌলভী শের আলী সাহেবের আত্মীয় ছিলেন। তিনি চাকরি করতেন ডেরা গাজী খান-এ। এই অধমের যতদূর স্মরণ আছে, তিনি বলতেন, আহমদীয়া জামা'তে যোগদানের পূর্বে তার অবস্থা ভালো ছিল না এবং তিনি তার স্ত্রী'র খোঁজখবরই রাখতেন না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আশিসপূর্ণ যুগে আল্লাহ্ তা'লা তাকে হিদায়াত দান করেন এবং সত্যকে চেনার তৌফিক দান করেন। তার হৃদয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখার বাসনা জাগ্রত হয়। তাই তিনি কাদিয়ান দারুল আমান যান। কিন্তু সেখানে

গিয়ে জানতে পারেন, কোন মামলার কাজে হুযূর গুরুদাসপুর গেছেন। অতএব তিনিও গুরুদাসপুর যান আর এমন একটি সময় তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখার এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেন, যখন হুযূর একেবারেই একাকী ছিলেন এবং খাটে শুয়ে ছিলেন। অতএব তিনি হুযূরের পা টিপতে আরম্ভ করেন এবং দোয়ার আবেদন জানান। ইত্যবসরে অন্য কোন বন্ধু হুযূর (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। আর হুযূরের সামনে তিনি উল্লেখ করেন, তার শ্বশুরবাড়ির লোকরা অনেক পীড়াপীড়ির পর তাদের মেয়েকে তার হাতে তুলে দিয়েছেন আর তিনিও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাদের মেয়েকে ভবিষ্যতে তিনি আর তাদের কাছে পাঠাবেন না। (সম্ভবত আত্মীয়দের মাঝেই বিয়ে হয়ে থাকবে)। তার এমন কথা শোনা মাত্রই হুযূর (আ.)-এর চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করে আর হুযূর তাকে রাগতস্বরে বলেন, এখনই এখান থেকে বেরিয়ে যাও, কেননা এমন যেন না হয় যে, তোমার কারণে আমাদের ওপরও শাস্তি নেমে আসে। অতএব তিনি উঠে চলে যান আর কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে নিবেদন করেন, তিনি তওবা করছেন এবং তাকে ক্ষমা করা হোক। এরপর হুযূর (আ.) তাকে বসার অনুমতি দেন। প্রয়াত চৌধুরী নযর মাহমুদ সাহেব বলতেন যে, এই ঘটনাটি দেখে তিনি গভীরভাবে অনুতপ্ত হন যে, সামান্য বিষয়ে হুযূর (আ.) এত বেশি রাগান্বিত হয়েছেন, অথচ তার নিজের অবস্থা হলো, তিনি তার স্ত্রীর কোন খবরই রাখেন না আর নিজের শ্বশুরবাড়ির প্রতিও ভ্রুক্ষেপহীন। এটি কত বড় পাপ! তিনি বলতেন যে, তিনি সেখানে বসা অবস্থায়ই তওবা করেন আর মনে মনে অঙ্গীকার করেন, এবার গিয়ে স্বীয় স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইবেন আর ভবিষ্যতেও তার সাথে কোন দুর্ব্যবহার করবেন না। অতএব তিনি বলতেন, সেখান থেকে ফেরার পথে তিনি তার স্ত্রীর জন্য অনেক উপহার কিনেন এবং বাড়িতে ফিরে স্ত্রীর কাছে যান আর উপহারগুলো তার হাতে দিয়ে অতীতের দুর্ব্যবহারের জন্য তার কাছে মিনতিভরে ক্ষমা চান।

তিনি (অর্থাৎ তার স্ত্রী) এটি ভেবে আশ্চর্য হন যে, এমন পরিবর্তন তার মাঝে কী করে এলো। তিনি যখন জানতে পারেন যে, এটি হয়েছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কল্যাণে, তখন তিনি হুযূর (আ.)-এর জন্য এ কারণে গভীরভাবে দোয়া করা আরম্ভ করেন যে, তার তিক্ত জীবনকে হুযূর শান্তিপূর্ণ জীবনে বদলে দিয়েছেন।"

(রেজিস্টার রেওয়ায়াতে সাহাবা, সংখ্যা: ০১, পৃ. ৬-৭)

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–

"আসলে এটি হলো মহিলাদের সেই অধিকার যা মহানবী (সা.) প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে মুসলমানরা তা ভুলে গিয়েছিল আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। অতএব নারীদের সম্মান ইসলাম ধর্মেই সবচেয়ে বেশি সংরক্ষিত আর এই সম্মানকে ইসলামে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।"

(জুমুআর খুতবা, ১৩ জানুয়ারি ২০০৬, বাইতুল ফুতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৬)

অপর এক স্থানে হুযূর (আই.) বলেন–

"লক্ষ্য করুন! যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, আদর্শ হোন আর সেই সাহাবী তাৎক্ষণিকভাবে তওবা করেন এবং আদর্শস্থানীয় হওয়ার চেষ্টা করেন। আজ আপনাদের অধিকাংশ যারা এখানে বসে আছেন অথবা অন্তত বেশকিছু মানুষ এখানে এমন আছেন যারা সেসব সাহাবীর বংশধর যারা বয়আতের পর আদর্শস্থানীয় হওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং হয়েছেন। আপনারাও যদি নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক রেখে থাকেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তভুক্ত হওয়ার দাবি করেন তাহলে সেসব পুণ্য অবলম্বন করুন। আজ এই অঙ্গীকার করুন যে, আমাদেরকে পুণ্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে, নিজেদের স্ত্রীদের অপরাধ ক্ষমা করতে হবে। আর সেসব কনে পক্ষ যারা বাড়াবাড়ি করে, তারাও এই অঙ্গীকার করুন যে, বরের অপরাধ ক্ষমা করবেন; তাহলে এসব ঝগড়ার কারণে বিভিন্ন পরিবার এবং সমাজে যে তিক্ততা বিরাজমান তা দূরীভূত হতে পারে। এসব বিষয়ের অবসান ঘটতে পারে। এসব পারিবারিক কলহ বা স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াবিবাদ যদি ছাড়াছাড়ির পর্যায়েও পৌঁছে তথাপি এখন থেকে দোয়া করে এবং এই পবিত্র পরিবেশ থেকে উপকৃত হয়ে দোয়ার ওপর জোর দিয়ে সেই বিচ্ছিন্ন হৃদয়গুলোর মাঝে মিলন ঘটানোর চেষ্টা করুন।"

(জুমুআর খুতবা ২৪ জুন ২০০৫, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, কানাডা;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০৮ জুলাই ২০০৫)

২০১০ সনে স্পেনের জলসা সালানা উপলক্ষ্যে জামা'তের সদস্যদেরকে মহিলাদের সাথে সদাচরণের নসিহত করতে গিয়ে মহানবী (সা.)-এর হাদীসের আলোকে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বলেন–

"পারিবারিক সম্পর্কের বিষয়ে মহানবী (সা.)-এর নসীহত হাদীসে উল্লিখিত রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, মহিলাদের মঙ্গল এবং কল্যাণ কামনা কর, কেননা মহিলাদেরকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে (অর্থাৎ তাদের মাঝে পাঁজরের হাড়ের ন্যায় প্রকৃতিগত বক্রতা রয়েছে)। পাঁজরের ওপরের অংশে বক্রতা বেশি থাকে। তোমরা যদি এটিকে সোজা করার চেষ্টা কর তবে তা ভেঙে ফেলবে। তোমরা যদি একে এর মত থাকতে দাও তাহলে এর মাঝে যে কল্যাণ রয়েছে তা তোমরা লাভ করতে থাকবে। অতএব নারীর প্রতি উত্তম আচরণ প্রদর্শন কর এবং এ বিষয়ে আমার উপদেশ মেনে চল।

(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুন নিকাহ্, হাদীসঃ ৫১৮৬)

এরপর আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.)ই বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেন, মু'মিনের উচিত নয় নিজের মু'মিনা স্ত্রীর প্রতি ঘৃণা এবং বিদ্বেষ পোষণ করা। যদি তার একটি বিষয় অপছন্দনীয় হয়ে থাকে তাহলে অপর বিষয় পছন্দেরও হতে পারে।

(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুর রেযা', হাদীসঃ ৩৬৪৮)

অর্থাৎ তার কিছু বিষয় অপছন্দের হয়ে থাকলে কিছু বিষয় ভালোও থাকবে। দৃষ্টি যেন সর্বদা ভালো বিষয়াদির প্রতি থাকে।

(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুন নিকাহ্, হাদীসঃ ৫২০০)

উভয় পক্ষ থেকে যদি এমন ব্যবহার করা হয় তাহলেই গৃহের শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় থাকতে পারে। মহানবী (সা.) নারীদের অধিকার কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা দেখুন; একবার তিনি (সা.) জানতে পারেন যে, সাহাবীরা তাদের স্ত্রীকে প্রহার করেন। তখন তিনি (সা.) বলেন, "নারীরা খোদার দাসী, তোমাদের নয়।" তিনি (সা.) আরো বলেন, তাদেরকে চপেটাঘাত করো না, গালি দিও না, ঘর থেকে বের করে দিও না। অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মুআবিয়া বিন হেয়দা বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করি যে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার কী? মহানবী (সা.) বলেন, তুমি যা খাও তাকেও তা-ই খাওয়াবে। তুমি যা পরিধান কর তাকেও তা-ই পরিধান করাবে। তার চেহারায় আঘাত করবে না এবং তার সৌন্দর্য নষ্ট করবে না। তার কোন ভুলের কারণে তাকে শিক্ষা দেয়ার জন্য যদি তোমার নিজেকে তার থেকে

পৃথক করতেই হয় তাহলে তা করবে গৃহাভ্যন্তরে; অর্থাৎ তাকে ঘর থেকে বের করে দিও না।

(সুনানে আবি দাউদ, কিতাবুন নিকাহ্, হাদীস: ২১৪২;
০৩ এপ্রিল ২০১০ তারিখে স্পেনের সালানা জলসায় প্রদত্ত ভাষণ)

২০০৪ সনে যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় এ সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (আই.) বলেন–

"অর্থাৎ কঠোরতা যদি প্রদর্শন করতে হয়, তাহলে তা হওয়া উচিত সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রতিশোধ নেয়া এবং রাগ বা উত্তেজনার বশে নয়। সেইসাথে তাদের আবেগ অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার পাশাপাশি তাদের বাহ্যিক চাহিদাগুলোর প্রতিও যত্নবান থাক।"

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৩১ জুলাই ২০০৪;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৪ এপ্রিল ২০১৫)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নিজের এক ভাষণে পুরুষদের সামাজিক দায়-দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন।

আল্লাহ্ বলেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ
إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

(সূরা আল্ হাশর 59: 19)

যেকোন জাতি বা সমাজের উন্নতির কেন্দ্রবিন্দু হলো সেই জাতির মহিলাদের মান কতটা উন্নত তার ওপর, তাই ইসলাম মহিলাদের এক উন্নত মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। স্ত্রী হিসেবেও (তাদের জন্য) এক মর্যাদা রয়েছে আর মা হিসেবেও এক পদমর্যাদা রয়েছে।

عَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ (সূরা আন্ নিসা 4: 20) বলে পুরুষদেরকে এই কথা বলা হয়েছে যে, মহিলাদের একটি মর্যাদা রয়েছে। অকারণে আর বিভিন্ন অজুহাতে তাকে বিরক্ত করার চেষ্টা করো না। মহিলাদের কারণেই তোমাদের বংশধারা চলমান রয়েছে। কোন কোন বিষয় মানুষের জানা থাকে না আর পুরুষরা এই

জ্ঞান-স্বল্পতার কারণে অনেক সময় মহিলাদের প্রতি বাড়াবাড়ি করে বসে, তাই তিনি বলেন, নিজেদের এই জ্ঞান-স্বল্পতা এবং বিষয়ের গভীরে না পৌঁছার কারণে সেসব মহিলার প্রতি তোমরা ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ করতে পার এবং তাদেরকে অপছন্দ করতে পার, কিন্তু মনে রেখো যে, সর্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ তা'লা তাদের মাঝে তোমাদের জন্য উন্নতির উপকরণ রেখেছেন। তাই মহিলাদের বিষয়ে যেকোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ত্বরাপরায়ণ হওয়া উচিত নয়।"

(জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২১ আগস্ট ২০০৪)

মহিলাদের আবেগ অনুভূতির প্রতি সংবেদশীলতা

মহিলাদের আবেগ অনুভূতির প্রতি যত্নবান হওয়ার বিষয়ে পুরুষদেরকে নসীহত করতে গিয়ে হুযূর (আই.) নিজের সেই ভাষণেই বলেন–

"অনুরূপভাবে মাতারূপে নারীদের মর্যাদা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মায়ের পায়ের নীচে রয়েছে জান্নাত। অর্থাৎ নারীদের প্রদত্ত শিক্ষাই সন্তানদেরকে জান্নাতের উত্তরাধিকারী করতে পারে। সেই সাথে পুরুষদেরকে এটিও বলা হয়েছে যে, মহিলাদের আবেগ অনুভূতির প্রতিও যত্নবান হবে। যেমনটি বলা হয়েছে–

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের মতো আবেগ অনুভূতিসম্পন্ন স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন (সূরা আন্ নাহল 16: 73)। অর্থাৎ পুরুষদের এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সামান্য বিষয়াদি নিয়ে মহিলাদের সাথে অসৌজন্যমূলক এবং শত্রুতাপূর্ণ আচরণ করো না। তারাও মানুষ, তাদেরও রয়েছে তোমাদের মতো আবেগ অনুভূতি, তাদের মাধ্যমেই তোমাদের বংশধারা চলমান রয়েছে। অকারণে যদি তাদেরকে কষ্ট দাও তাহলে হয়ত তোমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মই তোমাদের বিরোধী হয়ে যাবে আর প্রায় সময় এমনটি হয়ে থাকে। মহিলাদের প্রতি পুরুষদের অন্যায় ও কঠোরতা সত্ত্বেও মহিলারা যখন স্বামীদের বাধ্য এবং আনুগত্যকারিণীও হয়ে থাকে, পুরুষের কথা মান্য করে, তার গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং তার পিতামাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করে। কিন্তু এরপরও যদি পুরুষরা তাদের সাথে বাড়াবাড়ি করে তাহলে তা হবে অত্যাচার এবং সীমালঙ্ঘনের নামান্তর। এসব বিষয় যেহেতু এমন যা মহিলাদের তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রমাণ,

তাই পুরুষের অযথা বাড়াবাড়ির কারণে কখনো কখনো সন্তানরা তাদের পিতার বিরোধী হয়ে যায়। অতএব লক্ষ্য করুন, মহিলাদের অধিকার এবং আবেগ অনুভূতির বিষয়কে আল্লাহ্ তা'লা কত অসাধারণ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, তাই নিজেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখ আর এভাবে তোমরা শুধু মহিলাদের আবেগ অনুভূতির প্রতিই যত্নবান হবে না বরং নিজের এবং নিজের সন্তানদেরও মঙ্গল করবে। যেমনটি আমি বলেছি, কখনো কখনো সন্তান শুধু এ কারণেই বিপথগামী হয় এবং পিতার অবাধ্য হয়। কেননা পিতারা তাদের স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ করে না।"

(জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ১২ আগস্ট ২০০৪;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০১ মে ২০১৫)

এ প্রেক্ষিতেই অপর এক স্থানে হুযূর বলেন–

"সুতরাং দেখুন, কতভাবে তিনি পুরুষদেরকে নসীহত করে মহিলাদের অধিকার প্রদানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন! যেমনটি আমি বলেছি, এখন মহিলা তথা একজন আহমদী মহিলার জন্য আবশ্যক হলো সেসব অধিকার প্রতিষ্ঠার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ নিজেদের দায়িত্ব পালন করা।"

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৬ জুলাই ২০০৮;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৫ এপ্রিল ২০১১)

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর একটি পথনির্দেশ

"আমাদের ধর্ম নারীর ওপর ঘরের তত্ত্বাবধান এবং স্বামীর ঘরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আল্লাহ্ তা'লাকে প্রকৃত অর্থে চিনতে না পারবে আর নিজেদের দায়িত্ব উপলব্ধি করতে না পারবে ততক্ষণ তোমাদের ঘরে শান্তি আসতে পারে না।"

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৯ জুলাই ২০০৬; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৬ জুন ২০১৫)

আহমদী মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং তার দায়িত্ব

সমাজে মহিলাদের ভূমিকা

আহমদীয়া জামা'ত ঘানার ২০০৪ সনের সালানা জলসার বক্তৃতায় হুযূর বিশেষ করে মহিলাদের উদ্দেশ্যেও কয়েক মিনিট বক্তব্য রাখেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–

"সমাজে নারীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একজন নারীর মৌলিক ভূমিকা তার ঘর থেকে আরম্ভ হয়, যেখানে সে একজন স্ত্রী এবং একজন মা হিসেবে অথবা বিয়ে না হয়ে থাকলে ভবিষ্যৎ মা হিসেবে নিজ ভূমিকা পালন করে থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেছেন যে, সর্বদা তাকওয়ার পথে পদচারণা কর। মহিলারা যদি এই বিষয়টি বুঝতে পারে এবং খোদা তা'লাকে ভয় করে আর তাকওয়ার পথে পদচারণা করে তাহলে তারা সমাজে এক বিপ্লব সাধনের যোগ্যতা অর্জন করবে। একজন নারী নিজের স্বামীর ঘরের তত্ত্বাবধায়ক আর স্বামীর অনুপস্থিতিতে গৃহের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এবং সন্তানদের যথার্থ প্রতিপালনের দায়িত্ব তার।"

পুনরায় তিনি (আই.) বলেন–

"অতএব হে আহমদী নারীগণ! আপনারা নিজেদের এই উচ্চ মর্যাদা অনুধাবন করুন আর নিজ বংশধরকে সমাজের মন্দ বিষয়াদি থেকে রক্ষা করে তাদের উন্নত নৈতিক চরিত্রে গড়ে তুলুন। এভাবে নিজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রক্ষাকবচ হয়ে যান। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাহায্য করেন না যারা তাঁর নির্দেশাবলীকে গুরুত্ব দেয় না। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে নিজেদের প্রকৃত পদমর্যাদা বোঝার এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সঠিক তত্ত্বাবধানের তৌফীক দান করুন। আমীন।"

(ঘানার সালানা জলসা-২০০৪, আলআযহারো লেযাওয়াতিল খিমার, 'ওড়নী ওয়ালীওঁ কে লিয়ে ফুল', তৃতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ)

২০০৪ সনে নাইজেরিয়ায় অনুষ্ঠিত সালানা জলসা উপলক্ষ্যে হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) নিজ বক্তৃতায় আহমদী নারীদের সম্বোধন করে বলেন–

"নারীদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলামী সমাজে তাদের একটি উচ্চ

মর্যাদা রয়েছে। তারা যদি নিজেদের এই উচ্চ মর্যাদাকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যে ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে– এর কোন নিশ্চয়তা দেয়া যায় না। তাই নারীকে অবশ্যই সমাজে তাদের নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা রাখা উচিত। অন্যথায় তারা নিজেদের স্বামীর অবাধ্য এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়িত্বে অবহেলাকারী বলে গণ্য হবেন। সর্বোপরি তারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। অতএব প্রত্যেক আহমদী নারীর আত্মসংশোধনের প্রতি প্রতিনিয়ত দৃষ্টি রাখা আর সর্বদা দোয়ায় রত থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, যেন আল্লাহ্ তা'লা তাকে পথপ্রদর্শন করেন এবং তাকে এতটা যোগ্য করে তোলেন যার সুবাদে সে নিজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী লালনপালন করতে পারবে।

হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন যে, এক নারী, যে নিজের পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময় মতো আদায় করে এবং রমযানের রোযা রাখে আর নিজেকে পাপাচার থেকে রক্ষা করে এবং নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে নিজ স্বামীর সেবা করে, এমন নারী জান্নাতের যে কোন দ্বারপথে জান্নাতে প্রবেশের অধিকার রাখে। প্রত্যেক আহমদী নারী নিজ স্বামীর প্রতি দায়িত্ব পালনকারী হবে এবং নিজ সন্তানদের অধিকার প্রদানকারী হবে– এ দোয়াই আমার থাকবে। আল্লাহ্ করুন তারা যেন নিজেদের সন্তানদের সঠিকভাবে তরবিয়ত করে আর পবিত্র ও নৈতিকতাপূর্ণ পরিবেশে তাদের লালনপালন করে আর এভাবে তারা যেন জান্নাতের উত্তরাধিকারী হতে পারে।"

(নাইজেরিয়ার সালানা জলসা-২০০৪, আলআযহারো লেযাওয়াতিল খিমার, 'ওড়নী ওয়ালীওঁ কে লিয়ে ফুল', তৃতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ)

২০০৬ সনে অনুষ্ঠিত যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা উপলক্ষ্যে আহমদী মুসলমান নারীদের দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন–

"আমাদের ধর্ম নারীকে ঘরের তত্ত্বাবধান এবং স্বামীর ঘরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আল্লাহ্ তা'লাকে প্রকৃত অর্থে চিনতে না পারবে আর নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন না হবে তোমাদের ঘরে শান্তি আসতে পারে না।"

তিনি আরো বলেন–

"আপনারা আহমদী নারীরা কোন প্রকার হীনমন্যতার শিকার হওয়ার পরিবর্তে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বে আস্থা রাখুন। নিজেদের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান করুন। পবিত্র কুরআনের শিক্ষার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিন এবং সেই শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করুন তাহলে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আপনারাই জগতের পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবেন। অন্যথায় যদি কেবল এই জগতের পিছনে ছুটতে থাকেন তাহলে যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে আর তারা হাহুতাশ করতে থাকবে। স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এমনসব জাতি দান করবেন যারা এই কাজকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমি আশা করি ইনশাআল্লাহু তা'লা এই সম্মান সেসব পুরোনো পরিবার এবং পুরোনো বংশ আর সেসব আহমদী নারীদের ভাগেই থাকবে যারা কঠিন সময়ে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। সুতরাং আপনারা নিজেদের মাঝে এই দায়িত্ববোধের চেতনাকে কখনো হারিয়ে যেতে দিবেন না, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সেই তৌফিক দান করুন। সুতরাং এই মহান নিয়ামতের সম্মান করুন যা আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে দান করেছেন। দোয়া করি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী পালনের ক্ষেত্রে আপনাদের পদচারণা যেন অব্যাহত থাকে আর আপনারা যেন নিজেদের পেছনে এমন বংশধর রেখে যেতে পারেন যারা পরবর্তী প্রজন্মের হৃদয়েও আল্লাহ্ তা'লার ধর্মের মাহাত্ম্য সৃষ্টি করবে।"

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৯ জুলাই ২০০৬;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৬ জুন ২০১৫)

কুধারণা এবং পঙ্কিলতা থেকে শিশুদেরকে রক্ষা করুন

২৭ আগস্ট ২০০৫ সনে জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে আহমদী মহিলাদেরকে তাদের দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–

"একজন নারী যেহেতু যুগপৎ স্ত্রীও আবার মাও, একারণে নিজের স্বামীর জন্যও সমস্যা সৃষ্টি করতে থাকে, সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষার ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে থাকে। কেননা ঘরে এসব কুধারণার বশে আলোচনা-পর্যালোচনা চলতে থাকে। এসব কথা সন্তানদের কানে পড়তে থাকে আর তারাও এসব কথায় প্রভাবিত হয় এবং এর প্রভাব গ্রহণ করে। কুধারণা-দুষিত

এই পরিবেশে তারা বড় হয় আর এভাবে বড় হয়ে তারাও এর প্রভাবে এই মন্দকাজে জড়িয়ে যায়। অতএব যেসব কথায় নৈরাজ্যের সম্ভাবনা থাকে আর যা হৃদয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, যা কুধারণার প্ররোচনা যোগায় এবং যাতে পঙ্কিলতার আশঙ্কা থাকে, এমন মায়েরা সন্তানদের সামনে এ ধরনের কথা বলে নিজেদের সন্তানদেরকে নষ্ট করার পাশাপাশি জামা'তের আমানতের বিষয়েও বিশ্বাসঘাতকতা করে।"

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫)

স্ত্রী হিসেবে নারী

জুমুআর এক খুতবায় মহানবী (সা.)-এর একটি হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার সুবাদে তার ওপর অর্পিত দায়িত্বাবলী সম্পর্কে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–

"এরপর (আল্লাহ্ তা'লা) স্ত্রীর মনোযোগ আকর্ষণ করেন যে, সে যেন স্বামীর ঘর, তার সম্মান ও সম্পদ এবং তার সন্তানের সঠিক তত্ত্বাবধান করে। তার উঠাবসা এবং লালনপালনের কাজ এমন হওয়া উচিত যেন তার প্রতি কারো আঙুল উঠানোর ধৃষ্টতা না হয়। স্বামীর সম্পদ যেন সঠিকভাবে ব্যয় হয়। কারো কারো এ অভ্যাস থাকে যে, অকারণে তারা অর্থের অপচয় করে বা নিজের ফ্যাশন অথবা অপ্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য খরচ করে; এসব এড়িয়ে চলুন। সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষা এমনভাবে হওয়া উচিত যেন তাদের মাঝে জামা'ত ও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ততার চেতনা সৃষ্টি হয়, দায়িত্ববোধের চেতনা সৃষ্টি হয়, পড়াশোনার চেতনা সৃষ্টি হয়, উন্নত নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলী প্রদর্শনের চেতনা সৃষ্টি হয়, যেন স্বামী কখনো এই অভিযোগ করতে না পারে যে, আমার স্ত্রী আমার অনুপস্থিতিতে (যেহেতু স্বামীরা অধিকাংশ সময় নিজ কাজের জন্য ঘরের বাহিরে থাকে) তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে না। শুধু তা-ই নয়, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেন, স্বামী যদি অভিযোগ করে এমন কি যদি (আবেগের সাথে সম্পৃক্ত) শাস্তিও দেয়, তা এক অতি সামান্য বিষয়। কেননা এসব তো এখানে এই পৃথিবীতেই রয়ে যাবে। কিন্তু স্মরণ রেখো, বিচার দিবসেও তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে, আর আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন সেখানে কেমন ব্যবহার হবে। আল্লাহ্ তা'লা সবার প্রতি কৃপা করুন।"

(জুমুআর খুতবা, ০৬ এপ্রিল ২০০৭, বাইতুল ফুতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৭ এপ্রিল ২০০৭)

মা হিসেবে নারী

এক আহমদী মুসলমান নারীর পারিবারিক দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে অপর এক স্থানে সৈয়দনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন–

"মা হিসেবে সন্তানদের সাথে এক নারীর শক্তিশালী বন্ধন থাকে, সন্তানদের সাথে উঠাবসা তারই বেশি হয়। শিশু বয়সে সন্তানরা বাবার তুলনায় মায়ের সাথে বেশি সম্পৃক্ত থাকে। অতএব শুরু থেকেই যদি নিজের কর্ম ও কথার মাধ্যমে সন্তানদের মন-মস্তিষ্কে এই কথা গ্রথিত ও প্রোথিত করে দেয়া হয় তাহলে বংশপরম্পরায় ইবাদতকারী সৃষ্টি হতে থাকবে এবং এর ফলে একের পর এক আহমদীয়াতের বাণী প্রচারকদের বাহিনী গড়ে ওঠবে। কিন্তু সচরাচর দেখা গেছে যে, স্বাচ্ছন্দ্যের কারণে পূর্বে কাটানো কষ্টের দিনগুলোকে মহিলারা স্বল্প সময়ের ভেতর বেমালুম ভুলে যায় আর এটিই মহিলার প্রকৃতি তার পছন্দ-অপছন্দই ভিন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু এক আহমদী নারীর উচিত নিজের পছন্দ-অপছন্দকে জগতমুখী করার পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশের অধীনস্ত করা আর নিজের ঘরকে সর্বদা ইবাদতে সজ্জিত রাখা।

মহানবী (সা.)-এর এই হাদীসটি সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখুন। তিনি (সা.) বলেন: **সেই ঘর যাতে খোদা তা'লাকে স্মরণ করা হয় এবং সেই ঘর যাতে খোদা তা'লাকে স্মরণ করা হয় না, উপমায় এদের একটি জীবিত আর অপরটি মৃত।** অতএব নিজেদের ঘরকে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত এবং যিকরে ইলাহীতে সাজিয়ে রাখুন যেন আপনাদের ঘরে সর্বদাই জীবনের লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। স্বামীরা আপনাদের ইবাদতের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করবে, এই অপেক্ষা না করে আপনারা স্বামীদেরকে নামাযের জন্য জাগ্রত করুন এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করুন।"

পুনরায় তিনি বলেন–

"নিজ সন্তানদের তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার কারণে তাদেরকে জাগ্রত করার দায়িত্বও নারীদের ওপর বর্তায় এবং নামাযের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার দায়িত্বও তাদের। অতএব যেসব ঘরের নারীরা ইবাদতের মাধ্যমে রাতকে প্রানবন্ত করবে এবং নিজেদের স্বামী এবং সন্তানদের দৃষ্টি ইবাদতের

প্রতি আকর্ষণ করবে সেসব ঘর আল্লাহ্ তা'লার কৃপার উত্তরাধিকারী হতে থাকবে।"

(অস্ট্রেলিয়ার সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ১৫ এপ্রিল ২০০৬;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১২ জুন ২০১৫)

১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৫ তারিখে সুইডেনের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে হুযূর আনোয়ার (আই.) বিভিন্ন বিষয়ে আহমদী নারীদের পথনির্দেশ প্রদান করেন আর স্বামীর অধিকারের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন–

"আল্লাহ্ তা'লার রসূল (সা.) বলেছেন, নারী হলো ঘরের তত্ত্বাবধায়ক এবং স্বামী-সন্তানদের জন্য সে হচ্ছে অভিভাবক। তাই মায়েদের এবং নারীদের অবশ্যই সন্তানদের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা উচিত, ঘরে থাকা উচিত। সন্তানরা যখন স্কুল থেকে ফিরে আসে তখন তারা যেন একটি প্রশান্ত এবং ভালোবাসাপূর্ণ পরিবেশ খুঁজে পায়। খোঁজ নিয়ে দেখুন, বর্তমান পরিবেশে সন্তানদের নষ্ট হওয়ার কারণ হলো তারা পিতামাতার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত। তারা হয়ে থাকে পিতামাতার ভালোবাসার ভিখারী, কিন্তু তারা তা পায় না। তারা নিজেদের প্রতি মনোযোগের দাবি করে কিন্তু পিতামাতা তাদের প্রতি সেই মনোযোগ প্রদান করে না আর পিতামাতা অর্থ উপার্জনের জন্য হন্যে হয়ে বেড়ায় এবং নিজেদের স্বার্থ সন্তুষ্টিতে ডুবে থাকে।"

পুনরায় বলেন–

"এছাড়া বিয়েশাদির বিষয়াদি সামনে আসে। স্মরণ রাখতে হবে, যেখানে কেবল জাগতিক অর্থ-বিত্ত থাকে কিন্তু ধর্ম থাকে না, এমন পরিবারে বিয়ে করাবেন না। এটি দেখে যদি বিয়ে করান যে, আমাদের মেয়ের অবস্থা ভালো হয়ে যাবে অথবা আমাদের ছেলে ব্যবসায় উন্নতি করবে, এসব বিষয় অবশ্যই দেখুন, কিন্তু যে পরিবারে বিয়ে করাচ্ছেন অথবা যার সাথে বিয়ে করাচ্ছেন সেই ছেলে অথবা মেয়ের ধার্মিকতার প্রতিও দৃষ্টি দিন। মহানবী (সা.) বলেছেন, সম্পর্ক গড়ার সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি তোমাদের দেখা উচিত তা হলো ধার্মিকতা। কেউ কেউ বলে যে, আমরা অমুক বংশ বা পরিবারকে দেখেছি, যারা বড়ই নেক পরিবার ছিল, এমন ছিল, তেমন ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও এ পরিস্থিতির অবতারণা হয়েছে। আজকাল তো ছেলের নিজের ধার্মিকতার প্রতিও দৃষ্টি দেয়া উচিত। সর্বত্র একই অবস্থা বিরাজমান। জাগতিকতায় জগদ্বাসী এত বেশি নিমজ্জিত যে, যতক্ষণ ছেলে স্বয়ং মত না দেয়, ততক্ষণ বৈবাহিক সম্পর্ক গড়া

উচিত নয়। অর্থাৎ শুধু অর্থ-বিত্ত রয়েছে, সেটি দেখে সম্পর্ক করে নিলাম (এমনটি হওয়া উচিত নয়)। বহু এমন সম্পর্ক কষ্টের কারণ প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু যদি শুধু জাগতিকতা দেখা হয় তাহলে এটি সন্তানদেরকে ধর্ম থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার কারণ হবে। বহু এমন মেয়ে রয়েছে যারা এমন সম্পর্কের কারণে শুধু জামা'ত থেকে দূরে চলে যায় নি বরং পরিবারের সদস্যদের সাথেও তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। পরিবারের লোকদের সাথেও তাদেরকে সাক্ষাৎ করতে দেয়া হয় না। তাই শুধু অর্থ-বিত্ত দেখে সম্পর্ক করা উচিত নয়। সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করে সম্পর্ক গড়া উচিত। অনুরূপভাবে সন্তান হত্যারও আরো বহু উদাহরণ রয়েছে। **যেখানেই তরবিয়ত বা সঠিক শিক্ষাদীক্ষার ঘাটতি রয়েছে সেটি মূলত সন্তান হত্যারই নামান্তর।**

অতএব সন্তানের তরবিয়ত সর্বদা যত্নসহকারে করা উচিত এবং তাদেরকে সঠিকপথে পরিচালিত করা উচিত। মহিলাদের উচিত নিজেদের ঘরে সময় অতিবাহিত করা। একান্ত বাধ্য না হলে যতদিন সন্তানদের তরবিয়ত করার বয়স রয়েছে ততদিন চাকরি করার কোন প্রয়োজন নেই। যদি করতেই হয় তাহলে পরবর্তীতে করুন। কোন কোন মা এমন আছেন যারা সন্তানদের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন, অথচ তারা পেশাজীবি, ডাক্তার এবং উচ্চ শিক্ষিতও বটে, কিন্তু সন্তানদের জন্য তারা ঘরেই থাকেন আর সন্তানরা যখন এমন বয়সে উপনীত হয় আর তাদের উত্তম তরবিয়ত হয়ে যায় যেখানে তাদের তাৎক্ষণিকভাবে মায়ের প্রয়োজন পড়ে না, তখন তারা কর্মক্ষেত্রে ফিরে যান।

যাহোক এর জন্য মহিলাদের ত্যাগ স্বীকার করা উচিত। এই সকল ত্যাগের জন্যই মহান আল্লাহ্ মহিলাদেরকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছেন, যে মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত হয়ে থাকে। নারীদের মাঝে ত্যাগের বৈশিষ্ট্য অনেক বেশি থাকে। যেসব নারী নিজেদের কামনা-বাসনা জলাঞ্জলি দেয়, তাদের পায়ের নীচেই জান্নাত রয়েছে।"

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৫ মে ২০১৫)

২০০৬ সনে অস্ট্রেলিয়ার সালানা জলসায় নারীদের মর্যাদার বরাতে উপদেশ দিতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–

"আপনাদের তরবিয়তই আপনাদের সন্তানদেরকে ইহকাল ও পরকালে জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানাতে পারে। সন্তানদের এসব কর্ম এবং আপনাদের সন্তানদের উন্নত তরবিয়্যত বা শিক্ষাদীক্ষাই তাদেরকে সর্বদা খোদা তা'লার

সাথে যুক্ত রাখবে আর সন্তানদের মাঝেও আপনাদের জন্য দোয়া করার অভ্যাস সৃষ্টি হবে। আপনাদের জন্য সন্তানদের কৃত দোয়া আপনাদেরকে পরকালে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদায় আসীন করবে।

অতএব আহমদী মায়েরা যদি তাদের সন্তানদের দায়িত্বের প্রতি সচেতন হন আর আপনারা যদি নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন, **আপনাদের কথা এবং কাজে যদি কোন বিরোধ না থাকে, আপনাদের সকল কথা সত্য এবং শুধুমাত্র সত্যভিত্তিক হয় তাহলে আহমদীয়া জামা'তের পরবর্তী প্রজন্ম ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী এক প্রজন্ম হবে।** অতএব নিজেদের মন-মস্তিষ্কে নিজেদের এই মর্যাদা সর্বদা জাগ্রত রাখুন আর নিজেদের ইবাদত এবং ব্যবহারিক কর্মে উন্নত মান অর্জনের চেষ্টা করুন। পবিত্র কুরআনের যত নির্দেশ রয়েছে, সেগুলো মেনে চলার চেষ্টা করুন। সমস্ত উন্নত নৈতিক গুণাবলী অর্জনের চেষ্টা করুন, যার প্রতি আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নিজে পুণ্যকর্ম করার পাশাপাশি সর্বদা অন্যদেরকেও তা করার নসীহত করা অব্যহত রাখুন। মন্দকে পরিত্যাগ করুন এবং এরপর নিজ নিজ গণ্ডিতে মন্দকে প্রতিহত করুন আর পারিপার্শ্বিক সকল পাপ দূরীকরণের চেষ্টা করুন। একে অন্যের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করুন। পারস্পরিক মনোমালিন্য এবং অসন্তোষ ভুলে যান। সাধারণত দেখা যায় যে, মহিলারা নিজেদের ক্ষোভ বেশি সময় ধরে হৃদয়ে পুষে রাখে। আপনাদের হৃদয়ে যদি হিংসা এবং বিদ্বেষ লালিত হতে থাকে তাহলে স্মরণ রাখবেন খোদা তা'লা এরূপ হৃদয়ে অবতরণ করেন না। এমন হৃদয়ের ইবাদতের মান তেমন হয় না যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা চান।"

(অস্ট্রেলিয়ার সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ১৫ এপ্রিল ২০০৬;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১২ জুন ২০১৫)

এরপর তিনি বলেন–

"এছাড়া শিশুদের সাথে স্নেহপূর্ণ আচরণ করা উচিত। এক হাদীসে মহিলাদের যে বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণিত হয়েছে তা হলো, তারা শিশুদেরকে স্নেহ করে এবং স্বামীর অনুগত থাকে যেন তাদের তরবিয়্যত বা শিক্ষাদীক্ষা উত্তম হয় আর তারা যেন ভালোভাবে প্রতিপালিত হয় এবং সমাজের জন্য কল্যাণকর সত্তায় পরিণত হতে পারে।"

(জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৩ আগস্ট ২০০৩;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৮ নভেম্বর ২০০৫)

তিনি আরো বলেন–

"সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং শিক্ষাদীক্ষার অনেক বড় দায়িত্ব নারীদের ওপর অর্পিত রয়েছে। অতএব সকল আহমদী নারীর এই বিষয়টিকে দৃষ্টিপটে রাখা উচিত।"

(জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৫ জুন ২০১১;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৩ এপ্রিল ২০১২)

ঘরের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নারী

জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদানকালে তাদের দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) বলেন–

"মহিলা তার স্বামীর ঘরের তত্ত্বাবধায়ক। এর দেখাশুনা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্থায়িত্ব, ঘরের হিসাব নিকাশ পরিচালনা এবং সংসার খরচের জন্য স্বামী যে পয়সা দেয়, এর মধ্যেই সংসার চালানোর চেষ্টা করা তারই দায়িত্ব। এমন কতক দক্ষ মহিলাও আছেন যারা সামান্য অর্থ দিয়েও এত ভালোভাবে ঘর-সংসার চালান, যা দেখে অবাক হতে হয় যে, এত অল্প টাকায় কী করে এতো ভালোভাবে সংসার চালাচ্ছেন! যদি সামান্য টাকাও বেশি পেয়ে যান তাহলে নিশ্চিত থাকুন, তিনি সেখান থেকে কিছু টাকা সাশ্রয় করবেন। এটা দ্বারা ঘরের জন্য কোন সুন্দর জিনিস তিনি ক্রয় করে নিচ্ছেন, অথবা সন্তানদের বিয়েশাদির জন্য কোনকিছু বানিয়ে নেন। এমন মায়েদের সন্তানরা যখন বিয়ে করে, তখন সবাই অবাক হয় যে, এতো অল্প আয়ের মাঝেও এতো ভালো জিনিসপত্র বাচ্চাদেরকে দিয়েছেন! এর বিপরীতে এমন মহিলাও আছে, যাদের হাতে মনে হবে কোন ফুঁটো আছে। যত বার তাদের হাতে টাকা দাও না কেন বুঝাই যায় না যে, টাকা কোথায় গেল? আয় উপার্জন অনেক ভালো কিন্তু ঘর বিরান পরিদৃষ্ট হয়। বাচ্চাদের বেশভুষা এমন, মনে হবে যেন ফকির মিসকিনের বাচ্চা। এমন মায়েদের সন্তানরা হীনম্মন্যতার শিকার হয়ে পড়ে আর তা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়, যখন তারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যায় আর তখন হা-হুতাশ করেও আর কোন লাভ হয় না।

এজন্য আল্লাহর রসূল (সা.) আপনাদেরকে সতর্ক করেন যে, যদি আপনারা স্বামীদের ঘর-সংসার ভালোভাবে পরিচালনা না করেন তাহলে আপনাদেরকে

জিজ্ঞেস করা হবে, জবাবদিহি করা হবে, যেভাবে আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আর এর পরিণাম এ জগতেই প্রকাশ পাওয়া শুরু হবে। তাই এটা আপনাদের চিন্তা করার বিষয়। প্রত্যেক মহিলাকে নিজের ঘরের প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত আর যখন আপনারা নিজেদের স্বামীর ঘরের দেখাশুনায় সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন, সন্তানদের খেয়াল রাখবেন, স্বামীর প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখবেন আর তাদের কথার মান্যকারী হবেন, তখন এমন মহিলাদেরকে আল্লাহর রসূল ততটুকু পুণ্যের অধিকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন, যতটা পুণ্য ইবাদতকারী পুরুষ এবং আল্লাহর রাস্তায় কুরবানীকারী পুরুষ লাভ করে থাকে আর একই সাথে তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদও রয়েছে।

এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, "যে মহিলা পাঁচবেলার নামায পড়েছে, রমযানের রোযা রেখেছে, মন্দকাজ থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে, নিজের স্বামীর আনুগত্য করেছে আর তার কথা মান্য করেছে, এমন মহিলা জান্নাতের যে দরজা দিয়েই চাইবে, প্রবেশ করতে পারবে।"

(মজমাউজ জায়ায়েদ, কিতাবুন্নিকাহ্, বাবু ফি হাক্কিয্ যাওজে আলাল মারআতে)
(জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৩ আগষ্ট ২০০৩;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৮ নভেম্বর ২০০৫)

মহিলাদের দৃষ্টি তাদের দায়িত্বাবলীর প্রতি আকর্ষণ করতে গিয়ে ২০০৪ সালের ৩১ জুলাই তারিখে যুক্তরাজ্যের জলসা সালানার প্রাক্কালে প্রদত্ত বক্তৃতায় হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন–

"যেসব মহিলা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণকারী, নিজের স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত এবং সন্তানদের সঠিক শিক্ষাদিক্ষা প্রদানকারী, তাদের বিষয়ে আল্লাহর রসূল (সা.) যা বলেছেন তা নিম্নোক্ত হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়।

আসমা (রা.) বিনতে ইয়াজিদ আনসারী বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হন। তিনি (সা.) তখন সাহাবীদের (রা.) মাঝে ছিলেন। তিনি বলেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত। আমি মুসলমানদের প্রতিনিধি হয়ে আপনার কাছে এসেছি। আমার প্রাণ আপনার জন্য নিবেদিত। পূর্ব-পশ্চিমের সব মহিলা আমার সাথে এ বিষয়ে একমত যে, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন। তথাপি আমরা মহিলারা ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে থাকি। আমরা

আপনাদের তথা পুরুষদের চাওয়া-পাওয়া পূর্ণ করি আর সন্তানদের দেখাশুনা করি। আর আপনাদের (অর্থাৎ পুরুষদের) জুমআর নামায, বা-জামা'ত নামায, রোগীদের পরিচর্যা, জানাযায় যাওয়া এবং হজ্জ করা ইত্যাদি কারণে আমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। এর চেয়েও বড় বিষয় হলো জিহাদে অংশ নেয়া। আপনাদের কেউ যখন হজ্জে যায়, উমরায় যায় অথবা জিহাদের জন্য যাত্রা করে তখন আমরা আপনাদের সম্পদের সুরক্ষা করি। পোশাকের জন্য সূতা কাটি আর আপনাদের বাচ্চাদেরকে লালনপালন করি। হে আল্লাহর রসূল! পুরষ্কারের ক্ষেত্রে এরপরও আমরা আপনাদের সাথে সমান অংশীদার নই।

মহানবী (সা.) নিজের সাহাবীদের (রা.) দিকে ফিরে বললেন, ধর্মীয় বিষয়ে তোমরা এই মহিলার চেয়ে উত্তমভাবে কাউকে নিজের কেইস বা অবস্থান উপস্থাপন করতে শুনেছ কি? সাহাবা (রা.) নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কখনও এটা কল্পনাও করতাম না যে, ধর্মের বিষয়ে এক মহিলা এত ব্যুৎপত্তি রাখেন। মহানবী (সা.) তাঁর দিকে মুখ করে বললেন, হে মহিলা! ফিরে যাও আর অন্যসব মহিলাকে জানিয়ে দাও, কোন মহিলার জন্য ভালো স্ত্রী হওয়া, স্বামীর সন্তুষ্টির চেষ্টা করা এবং সে অনুসারে জীবন কাটানো পুরুষদের ঐসব পুণ্যের বরাবর হবে। সেই মহিলা ফেরৎ যান আর যেতে যেতে আনন্দের আতিসহ্যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই) ও 'আল্লাহু আকবার' (আল্লাহ সবচেয়ে মহান) ধ্বনি উচ্চকিত করতে থাকেন।"

(তফসীর দুররে মনসুর)

হুযূর (আই.) আরও বলেন–

"যেসব মহিলা এভাবে সহযোগিতা করে আর সুন্দরভাবে ঘর-সংসার পরিচালনা করে এবং ভালো স্ত্রী, তাদের প্রতিদান তাদের ইবাদতকারী স্বামী অথবা আল্লাহর খাতিরে জিহাদকারী স্বামীদের পুণ্যের সমান হবে। সুতরাং দেখুন, ঘরে বসে থাকা সত্ত্বেও মহিলাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.) কত মহান পুরষ্কারের সু-সংবাদ দিচ্ছেন!"

(জলসা সালানা যুক্তরাজ্য, ৩১ জুলাই ২০০৪;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৪ এপ্রিল ২০১৫)

কুরআন করীমের উদ্ধৃতির ভিত্তিতে মহিলাদের উপদেশ দিতে গিয়ে অন্য এক জায়গায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন–

আল্লাহ তা'লা বলেন–

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ

সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা আনুগত্যকারিণী, আর অদৃশ্যের সেসব বিষয়েরও হেফাযতকারিণী, যা রক্ষণাবেক্ষণের নির্দেশ আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন। (সূরা আন নিসা 4: 35) পুণ্যের ওপর সে-ই প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে অথবা সেই ব্যক্তিই আনুগত্যকারী হতে পারে, সে মহিলাই আনুগত্যকারিণী হতে পারে আর তারাই নিজেদের ও স্বামীদের গোপন বিষয়াদির রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে, যাদের আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে এবং যাদের হৃদয়ে আল্লাহর ভয়ভীতি কাজ করে।

অদৃশ্যে বা অগোচরে যেসব জিনিসের তত্ত্বাবধানের নির্দেশ রয়েছে, তার মধ্যে নিজের স্বামীর সন্তানদের সুশিক্ষার তত্ত্বাবধান এবং তাদের দেখাশুনা অন্তর্ভূক্ত। এটি হওয়া উচিত নয় যে, স্বামী তার নিজের কাজে ঘর থেকে বের হতেই স্ত্রীও নিজের ব্যাগ নিয়ে সন্তানদেরকে ঘরে রেখে আড্ডা জমানোর জন্য বেরিয়ে পড়বে অথবা সন্তানদের তরবিয়তের দিকে যথাযথ দৃষ্টি দেবে না। মহিলাদের ওপর বাচ্চাদের সুশিক্ষার এক গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত। এ দায়িত্ব পালন করা ব্যতিরেকে তারা সৎকর্মশীলা ও অনুগতদের মাঝে গণ্য হতে পারবে না আর না হতে পারবে সেই প্রজন্মের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালনকারিণী যার হিফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ তা'লা তাদের হাতে সোপর্দ করেছেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, মহিলারা নিজেদের ঘরের তত্ত্বাবধায়ক আর এ বিষয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ইসতেকরাজু ওয়া আদাদ্দিনা ১৩৩, বাবু আব্দুর রায়ে ফি মালে সাইয়্যিদাহ ১৩৩, হাদীস-২৪০৯) (জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৫ জুন ২০১১; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৩ এপ্রিল ২০১২)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আম্মাজান (রা.)-এর উপদেশ

ইউকে লাজনা ইমাইল্লাহর বাৎসরিক ইজতেমায় উম্মুল মু'মিনীন হযরত আম্মাজানের উপদেশাবলীর বরাতে বক্তৃতা প্রদান করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–

"এখন আমি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আম্মাজানের (রা.) কিছু কথা বা কিছু উপদেশ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি, যা তিনি তাঁর ও হযরত মসীহ্

মওউদ (আ.)-এর বড় কন্যা হযরত নবাব মোবারেকা বেগম সাহেবার বিয়ের পর, স্বামীর ঘরে প্রেরণের সময় তাঁকে প্রদান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, নিজের স্বামীর অগোচরে বা এমন কাজ, যা স্বামী থেকে লুকানোর প্রয়োজন মনে করো, সেটা কখনও করবে না। স্বামী না দেখুক কিন্তু খোদা দেখে থাকেন আর শেষ পর্যন্ত এমন বিষয় প্রকাশ পেয়ে মহিলাদের আত্মসম্মানকে ধুলিসাৎ করে দেয়। ফলে তার আর কোন মানসম্মান অবশিষ্ট থাকে না। তিনি বলেন, স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি কোন কাজ ঘটেও যায় তাহলে কখনো তা গোপন করবে না, বরং স্পষ্ট বলে দিবে। কেননা এতেই সম্মান নিহিত। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে লুকানোর মাঝেই অসম্মান নিহিত থাকে আর অপদস্ত হবার আশংকা থাকে এবং তা নারীর জন্য মর্যাদা হানিকর হয়ে থাকে।

তিনি আবারও বলেন, স্বামীর রাগত অবস্থায় কিছু বলবে না। যদি তিনি শিশু বা চাকরবাকরের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে থাকেন আর তুমি বুঝতে পার যে, স্বামী ন্যায় করছেন না এবং তুমি স্পষ্ট দেখতে পাও যে, স্বামী ভুল করছেন, তবুও সে সময় তার সামনে কিছু বলবে না।

তিনি বলেন, রাগান্বিত অবস্থায় পুরুষের সাথে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়কারী মহিলার মানসম্মান থাকে না। অধিকাংশ ঝগড়াবিবাদ অধৈর্য্যের কারণে হয়ে থাকে। কেননা তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া দেখানো হয় আর এর ফলে ঝগড়া বাড়তেই থাকে। তিনি বলেন, রাগের সময় তোমার নাক গলানোর কারণে তোমাকে যদি কিছু বলে ফেলে এতে তোমার সম্মানহানী হবে। পরে স্বামীর রাগ প্রশমিত হলে ধীরে-সুস্থে অবশ্যই তার ভুল ধরিয়ে দেয়া উচিত। কেননা সংশোধনও আবশ্যক।

পুরুষ ও মহিলাদের এই ব্যবস্থাপত্রও মনে রাখা উচিত, যার উল্লেখ হাদীসে পাওয়া যায়। রাগের সময় দাঁড়ানো থাকলে বসে যাও অথবা ওযু করে নাও তাহলে রাগ প্রশমিত হয়ে যাবে। আমার কাছে যেসব অভিযোগ আসে, সেক্ষেত্রে পুরুষদেরকে আমি এটাই বলে থাকি– এ দেশে তো পানির কোন অভাব নেই। তুমি শাওয়ার বা পানির ট্যাপ খুলে তার নীচে মাথা রেখে দেবে, রাগ প্রশমিত হয়ে যাবে।

যাহোক, হযরত আম্মাজান (রা.) পুনরায় তাঁর মেয়েকে এ উপদেশ দেন, **স্বামীর আত্মীয়দেরকে এবং আত্মীয়দের সন্তানদেরকে আপনজন মনে করবে,** যেমনটি কিনা হাদীসেও উল্লেখিত আছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর

বরাতেও আমি বলেছি, একে অন্যের রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনকে আপনজন মনে করবে। তুমি কারো মন্দ চাইবে না। কেউ তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করলেও তুমি নিজ হৃদয়ে সবার মঙ্গলকামী হবে।

তোমার সাথে কেউ মন্দ ব্যবহার করলে করুক কিন্তু নিজ হৃদয়ে তুমি কখনো কারো মন্দ চাইবে না আর কর্মের মাধ্যমে মন্দের প্রতিশোধ নিবে না; তাহলে দেখবে, খোদা সর্বদা তোমার মঙ্গল করবেন। অধিকাংশ সময় তিনি ছেলেমেয়েদেরকে এ উপদেশও দিতেন, নিজের নতুন ঘরে যাচ্ছ, সেখানে এমন কোন কথা বলবে না, যাতে তোমার শ্বশুরবাড়ির লোকজনের হৃদয়ে ঘৃণা ও মালিন্য সৃষ্টি হয় আর তা তোমার পিতামাতার জন্য দুর্নাম বয়ে আনে। অতএব, শ্বশুরবাড়ির কোন বিষয়ে কখনও হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। তাদের বিষয়াদি যা ঘটছে তা সেভাবেই ঘটতে দাও। আর শাশুড়ি কিংবা ননদের কথা অভিযোগ আকারে স্বামীর কাছে উত্থাপন করা উচিত নয়।

যেভাবে আমি বর্ণনা করেছি, হযরত নবাব মোবারেকা বেগম সাহেবা (রা.) ছিলেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বড় কন্যা। তিনি হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.)-এর একটি উপদেশ শুনাতেন, যা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.) তাঁকে এবং অন্যান্য মেয়েদেরকেও দান করতেন। আমি মনে করি, এই উপদেশ এবং এর ওপর আমলের বিষয়টি পূর্বের চেয়ে বর্তমানে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যৌবনে পদার্পণকারীনী বারো/তের বছরের মেয়েদের অবশ্যই এ দোয়া করা উচিত। হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.) তাঁকে অনেক বার বলেছেন, দেখ! আল্লাহ তা'লার সামনে কোন লজ্জা নেই। তুমি যে ছোট এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু খোদার কাছে অবশ্যই এ দোয়া করতে থাক যে, আল্লাহ্ যেন তোমাকে আশিসময় ও পুণ্যবান সাথী দান করেন।

(লাজনা ইমাইল্লাহ্ যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৪ অক্টোবর ২০০৯; আল ফযল ইন্টারন্যাশলনাল, ১৮ ডিসেম্বর ২০০৯)

আগুন থেকে পরিত্রাণের মাধ্যম হচ্ছে কন্যাসন্তান

কন্যাসন্তান জন্মের কারণে উদ্ভুত পারিবারিক সমস্যা সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) তাঁর এক খুতবা জুমুআয় বলেন–
"আজ আমি সর্ব প্রথম যে হাদীসটি উপস্থাপন করব, এর সম্পর্ক শত্রুদের

সাথে নয়, বরং এটি পারিবারিক জীবনে ধৈর্য্য ধারণের সাথে সম্পর্কযুক্ত, স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক জীবন কিভাবে কাটানো উচিত এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অনেক মহিলার চিঠি আসে আর যদি সাক্ষাতের সুযোগ হয় তাহলে সাক্ষাতে তারা এ অভিযোগ করে যে, আমাদের মেয়ে আছে কিন্তু কোন ছেলে হয় না, যার কারণে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকরা অনবরত খোঁটা দিয়ে বেড়ায় আর তাতে পারিবারিক জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। অথবা মেয়েরা নিজেরাই পত্রের মাধ্যমে অবহিত করে যে, মেয়ে হওয়ার কারণে তাদের সাথে তাদের পিতার ব্যবহার ভালো নয় আর এ কারণে তাদের জীবন কষ্টে জর্জরিত।

এ বিষয়ে মহানবী (সা.)-এর একটি হাদীস রয়েছে, যা লোকদের সামনে উপস্থাপন করতে চাচ্ছি। কেননা অনেকেই এমন আছেন যারা ধর্মের জ্ঞানও রাখে আর জামা'তের কাজও করে কিন্তু এরপরও ঘরে তাদের ব্যবহার ভালো নয়। এই হাদীস শোনার পর আমি মনে করি কোন মানুষ, যার মাঝে সামান্য পরিমাণও ঈমান অবশিষ্ট আছে, সে নিজের স্ত্রী কিংবা মেয়েদেরকে মেয়ে হবার কারণে খোঁটা দিবে না বা কটাক্ষ করবে না ।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, যাকে শুধুমাত্র কন্যা সন্তানের মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে আর সে ধৈর্য ধারণ করেছে, সেই মেয়েরা তার ও আগুনের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

(সুনানে তিরমিযি, কিতাবুল বিররে ওয়াসসিলা, বাবু মা জায়া ফিন্নাফাকাতে আলাল বানাতে ওয়াল ইখওয়াত)

জগতে এমন কে আছে, যার ছোটোখাটো ভুলভ্রান্তি ও পাপ সংঘটিত হয় না? এমন কে আছে, যে আল্লাহর আশ্রয় পেতে চায় না? প্রত্যেক ব্যক্তি অবশ্যই আল্লাহ্‌র আশ্রয় লাভের বাসনা রাখে। তাই কন্যাসন্তানের পিতাদের জন্য এ সুসংবাদ যে, মু'মিন মেয়েদের কারণে তারা খোদার নিরাপত্তায় এসে যাবে। কিছু সমস্যা দেখা দেয়, এগুলোর সমাধান করা উচিত। মেয়েদের কারণে এই সমাজেও অনেক সমস্যা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এগুলো সহ্য করা আর কোনভাবে মেয়েদের সামনে তা প্রকাশ পেতে না দেয়া এবং মেয়েদের কারণে মায়েদেরকে কটাক্ষের লক্ষ্যে পরিণত না করাই হলো মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'লা বলেন, এ কারণে এ কথাগুলো তার ও আগুনের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

(খুতবা জুমুআ, তারিখ: ১৯ নভেম্বর, ২০১০, মসজিদ ফযল, লন্ডন)

দুই পক্ষের বন্ধু ও বান্ধবীদের ভূমিকা

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া ও পারিবারিক সমস্যার ক্ষেত্রে দু'পক্ষের বন্ধু ও বান্ধবীরাও অনেক বড় ভূমিকা পালন করে থাকে।

নিজের এক খুতবা জুমুআয় হুযূর (আই.) বলেন, "স্বামী-স্ত্রী'র বন্ধুবান্ধবের কারণেও কতক সমস্যা মাথা চাড়া দেয়। এই বন্ধুদের ভূমিকা এমন যে, নিজেদের অজান্তেই তারা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করতে থাকে। অতএব এ হলো শয়তান, যে অজান্তে এমন ঘরকে নিজের পছন্দের রাস্তায় চালানোর চেষ্টা করে।"

(জুমুআর খুতবা, ১২ ডিসেম্বর ২০০৩, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৪)

এ বিষয়ে আরো এক জায়গায় একটি রেওয়াত বর্ণনা করতে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন, "সোলায়মান বিন আমর বিন আওস নিজের পিতা আমর বিন আওস (রা.)-এর বরাতে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন, যা ছিল বিদায় হজ্জের সময় মহানবী (সা.)-এর উক্তি। এর কিছু অংশ মহিলা-সংক্রান্ত, যা নিম্নরূপ:

তিনি (সা.) বলেন, "শোন! তোমার স্ত্রীর ওপর তোমার একটি অধিকার আছে। অনুরূপভাবে তোমার ওপরও তোমার স্ত্রীর এক অধিকার আছে। তোমার স্ত্রীর ওপর তোমার অধিকার হলো– সে তোমার বিছানায় এমন লোকদেরকে যেন না বসায়, যাদেরকে তুমি অপছন্দ কর আর এমন লোকদেরকে যেন তোমার ঘরে আসার অনুমতি না দেয় যাদেরকে তুমি অপছন্দ কর। আর তোমার ওপর তোমার স্ত্রী'র অধিকার হলো, খাবার ও পোশাক পরিচ্ছদের বিষয়ে তার সাথে সদ্ব্যবহার কর।"

(তিরমিযি, কিতাবুর রেযা, বাবু মা যাআফি হাক্কিল মারআতে আলা জাওযিহা)

এই হাদীসে এটা বর্ণনা করা হয়েছে যে, ঘরের পরিবেশ ইনসাফ ও ন্যায়ের ভিত্তিতে রক্ষা করতে হবে। স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই পরস্পরের প্রতি যত্নবান হতে হবে এবং পরস্পরের অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। মহিলাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, তাদের ঘরে তাদের বান্ধবীরাই এসে থাকে। কিন্তু বান্ধবীরা যেন এমন না হয়, যাদের বাড়ি আসা স্বামী অপছন্দ করবে। (স্বামী যদি না চায় তাহলে) তাদের সাথে অবৈধ বা বৈধ বন্ধুত্ব করবেন না। স্বামী যদি এমন লোকদের বাড়ি আসা পছন্দ না করে তাহলে তারা যেন বাড়ি না আসে। হতে

পারে কোন কোন ঘরের খবর স্বামী জানে। এ কারণে সে এটা পছন্দ করে না যে, এমন লোক বাড়ি আসুক। স্বামীর খুশি ও সন্তুষ্টি যদি অগ্রগণ্য হয় তাহলে এগুলো এমন বিষয় যার জন্য মহিলাদের মন খারাপ করা উচিত নয় আর স্বামী যা বলে তা মেনে নেওয়া উচিত। এ হাদীসে দ্বিতীয় যে বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো, স্বামীদেরও আবশ্যকীয় দায়িত্ব হলো, পরিবার-পরিজনের যে অধিকার রয়েছে তা প্রদান করা এবং পরিবারের ব্যয়ভার নির্বাহ করা ও তাদের পোশাক-পরিচ্ছদের খেয়াল রাখা।

(জুমুআর খুতবা, ৫ মার্চ ২০০৪, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৯ মার্চ ২০০৪)

কর্মকর্তাদের প্রতি উপদেশবাণী

কর্মকর্তাদেরকে নসীহত ও সতর্কীকরণ

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা প্রসঙ্গে একটি খুতবায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) কর্মকর্তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,–

"এ ছাড়া কর্মকর্তারাও অন্যায়ভাবে পুরুষদের পক্ষপাতিত্ব করে। কর্মকর্তাদেরকেও আমি এটিই বলছি যে, আপনারা নিজেদের আচরণ পরিবর্তন করুন। আল্লাহ তা'লা যদি আপনাদেরকে জামা'তের কাজ করার সুযোগ দিয়ে থাকেন তাহলে তা যথাযথভাবে কাজে লাগানো উচিত। তাকওয়া-শূন্য কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আমাকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, এমন পরিস্থিতির উদ্ভব যেন না হয়।"

(জুমুআর খুতবা, ২৪ জুন ২০০৫, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, টরেন্টো, কানাডা; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৮ জুলাই ২০০৫)

পরবর্তী খুতবায় পূর্ববর্তী খুতবার বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–

"কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে যেমনটি আমি এর আগেও বলে এসেছি যে, ন্যায়বিচারের দাবি অনুসারে **সিদ্ধান্ত** দেয়া উচিত। **কিন্তু** বিবদমান দুই পক্ষকেও আমি বলবো, আপনারাও সুধারনা রাখুন আর সিদ্ধান্ত যদি আপনার বিপক্ষে যায় তাহলে বিষয়টি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিন। যেভাবে হাদীসে এসেছে, অপর পক্ষকে অগ্নি-গোলক দ্বারা উদর পূর্ণ করতে দিন আর ঝগড়াবিবাদকে দীর্ঘায়িত করা এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যত্রতত্র কথা বলার পরিবর্তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত হোন যে, সত্যবাদী হয়েও মিথ্যাবাদীর ন্যায় বিনয়াবনত হও। আল্লাহ তা'লা সকলের মাঝে এই প্রেরণা সৃষ্টি করুন। প্রত্যেকেই একে অপরের প্রাপ্য প্রদান করবে এটিই আমার প্রত্যাশা।

কিন্তু এখানে আমি কর্মকর্তাদের, বিশেষ করে আমীরদের জন্য একটি কথা স্পষ্ট করতে চাই যে, এই পশ্চিমা দেশগুলোতে পারিবারিক বিবাদ বা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়াবিবাদের সংখ্যা বা মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেমনটি আমি আমার

জলসার বক্তৃতায় উল্লেখ করেছি। এই ঝগড়াবিবাদ এমন রূপ ধারণ করে যে, জানা সত্ত্বেও আর সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও জামা'তের ব্যবস্থাপনা কোন কোন বিধিনিষেধের কারণে কিছুই করতে পারে না। কেননা কোন কোন ক্ষেত্রে এক পক্ষ ন্যায়ের ওপর না থাকা সত্ত্বেও দেশীয় আইন তাকে কোন কোন অধিকার প্রদান করে থাকে। এ কারণে এমন স্বামী যারা তাদের স্ত্রীদের ওপর অত্যাচার নির্যাতন করে বাড়ি থেকে বের করে দেয় আর এটিও দেখে না যে, বাইরের পরিবেশ কতটা বৈরী। শুধু তাই নয়, এমন অত্যাচারী বাবাও আছে যারা এটিও দেখে না যে, এমন বৈরী আবহাওয়ায় মায়ের কোলে কয়েক মাসের শিশু বাচ্চাও রয়েছে! সুতরাং জামা'তের ব্যবস্থাপনার উচিত হবে এমন লোকদের বিরুদ্ধে সেই মহিলাকে সাহায্য করা। পুলিশের কাছে গিয়ে যদি মামলা নথিভুক্ত করতে হয় তবে তাও করা উচিত। সেক্ষেত্রে এটি ভাবা উচিত নয় যে, আমরা কি মীমাংসার জন্য বাইরে যাবো নাকি জামা'তের মধ্যেই মিমাংসা করে নিব? পরবর্তীতে যদি জামা'তের মাধ্যমেই মিমাংসা করা যায় তাহলে অবশ্যই করুন। মামলা ফেরতও নেয়া যেতে পারে, কিন্তু প্রাথমিক ভাবে অবশ্যই রিপোর্ট করা উচিত।

যে সকল অসহায় ও আত্মীয়স্বজনহীন (অর্থাৎ এসব দেশে এসে যারা আত্মীয়স্বজনহীন হয়ে পড়ে, কেননা এখানে তাদের পিতামাতা থাকে না আর তারা অন্যের ঘরে থাকে) মহিলারা রয়েছে, জামা'তের উচিত তাদেরও দেখাশুনা করা। জামা'ত যেন তাদের বাসস্থানের বন্দোবস্ত করে এবং তাদের জন্য উকিলের ব্যবস্থা করে (বিষয় তো প্রকাশ পেয়েই যায়, কিন্তু তা যদি গোপন রাখা হয় তাহলে ভিন্ন কথা)। এমন অত্যাচারী স্বামীদের বিরুদ্ধে আমার কাছে জামা'তী শাস্তির সুপারিশও যেন করা হয়। অতএব আমেরিকা এবং কানাডার আমীরগণ সত্বর এতদসংক্রান্ত তালিকা প্রস্তুত করুন। পশ্চিমা আরো কিছু দেশও রয়েছে সেখানেও এমনটি করা প্রয়োজন। লাজনা সংগঠনের মাধ্যমেও খবর নিন এবং এমন নির্যাতিত মহিলাদেরকে তাদের প্রাপ্য-অধিকার প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিৎ করুন। যেসব নারীর অধিকার প্রদান করা হচ্ছে না আর জামা'তের ব্যবস্থাপনাও এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না সেক্ষেত্রে এমন মহিলারা যেন সরাসরি আমার কাছে লিখে।

আল্লাহ তা'লা আমাদের সকলকে আমাদের দায়িত্বাবলী সুচারুরূপে পালন

করার তৌফিক দান করুন এবং তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে জামা'তের সক্রিয় ও কল্যাণকর অংশ হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন।"

(জুমুআর খুতবা, ১ জুলাই ২০০৫, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, টরেন্টো, কানাডা;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৫ জুলাই ২০০৫)

অপর একটি জুমুআর খুতবায় হুযূর আনোয়ার (আই.) এই বিষয়টিকেই এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, "কিছু কর্মকর্তা সম্পর্কেও অভিযোগ এসে থাকে যে, স্ত্রী সন্তানদের সাথে তাদের আচরণ ভালো নয়। পূর্বেও আমি উল্লেখ করেছি, এই অন্যায়ের সংবাদ কোন কোন সময় এত বেশি আসে যে, হৃদয় ব্যাকুল হয়ে যায়! হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসেছিলেন কী বিপ্লব সাধন করতে আর কিছু লোক তাঁর প্রতি আরোপিত হয়ে বরং জামা'তের বিভিন্ন কাজ করা সত্ত্বেও এবং কোন কোন কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা সত্ত্বেও কত ঘৃণ্যভাবে নিজেদের পরিবার-পরিজনের সাথে অসদাচরণ করে যাচ্ছে! আল্লাহ তা'লা তাদের প্রতি করুণা করুন এবং তাদেরকে কাণ্ডজ্ঞান দান করুন। এমন লোকেরা যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় আর যুগ খলীফার কাছে এই সংবাদ এসে যায় তখন তাদেরকে জামা'তের খেদমত করা থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়। তখন তারা হইচই আরম্ভ করে আর বলে যে, আমাদেরকে জামা'তের কাজ করা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে! অতএব সময় থাকতে তাদের ভাবা উচিত, কর্মকর্তা হিসেবে কুরআনের বিধিনিষেধের ওপর কতই না সচেতনতার সাথে তাদের প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত আর শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের কতই না চষ্টা-সাধনা করা উচিত"!

(জুমুআর খুতবা, ১ জুন ২০০৭, বায়তুল ফুতুহ, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২২ জুন ২০০৭)

১১ জুলাই ২০১২ সনে কানাডা সফরকালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) সেখানকার রিশতানাতা কমিটির সাথে মিটিং-এ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–

"এখানে অর্থাৎ কানাডা, আমেরিকা এবং পশ্চিমা দেশগুলোতে কিছু যুবক অসঙ্গত জীবনাচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের মাঝে কিছু রোগব্যাধি দেখা দেয়। কোন কোন সময় তরবিয়ত করলে ও বুঝালে সংশোধন হয়ে যায় কিন্তু অনেক সময় সেটা হয় না। একইভাবে কোন কোন সময় কতক মেয়ের মাঝেও বিভিন্ন ধরণের ভুলত্রুটি বা ব্যাধি থেকে থাকে। মোটকথা আত্মীয়তা

করার সময় এসব বিষয় সামনে আসা উচিত এবং উভয়কেই তাকওয়ার সাথে তা জানানো উচিত, যাতে পরে ঝগড়াবিবাদ না হয়।"

তারপর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–

"অনেক পরিবার এমন আছে যারা বিয়ের পর মেয়েকে এই বলে খোঁটা দিয়ে থাকে যে, সে যৌতুক নিয়ে আসে নি, তার কোন সন্তান হয় না কিংবা তার শুধু কন্যাসন্তানই হয়! এভাবে ছেলে পক্ষ মেয়েকে খোঁটা দিতে থাকে যার ফলশ্রুতিতে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। কতক দাদী নানীরা পাকিস্তানের গ্রামের পরিবেশ থেকে এসে থাকে আর গ্রাম্য প্রভাবেই প্রভাবিত থাকে। তাদের এই অজ্ঞতাপূর্ণ মনমানসিকতার কারণে কতক সংসার ভেঙ্গে যায়।"

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১২)

লাজনা ইমাইল্লাহর দায়-দায়িত্ব

১৭ জুন ২০১১ সনে জার্মান সফরের সময় হুযূর আনোয়ার (আই.) লাজনা ইমাইল্লাহ জার্মানির ন্যাশনাল মজলিস আমেলার সভায়ও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–

আপনারা আমাকে একটি জরিপ রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন। সেই জরিপ অনুযায়ী বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মেয়েরা 'খোলা' নিচ্ছে। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মেয়েরা খোলা নেয়ার জন্য কেন এতটা ব্যস্ত, সে খোঁজ কি আপনারা নিয়েছেন? শ্রদ্ধেয়া সদর সাহেবা বলেন, আমরা জরিপ করেছি। পাকিস্তান থেকে যে সকল মেয়ে আসে, তাদের পরিবার এখানকার খবরাখবর নেয় না, অপরদিকে এখানকার মেয়েরা মনে করে, আমরা যদি পৃথকও হয়ে যাই তাতেও অর্থনৈতিক দিক থেকে কোন সমস্যা হবে না।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–

"তাদেরকে আপনারা সামলান। তাদেরকে বুঝান যে, তোমরা যদি আহমদী হয়ে থাক তাহলে অন্ততপক্ষে জাগতিক লোভ লালসার কারণে নিজেদের সংসার ধ্বংস করো না।" খোলা'র ক্রমবর্ধমান সংখ্যার কারণে হুযূর আনোয়ার (আই.) উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং এদিকে বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করতে লাজনার কর্মকর্তাদেরকে তিনি নির্দেশ প্রদান করেন।

দুশ্চিন্তার সূরাহাঃ ইস্তেগফার

২০১২ সালের জুন মাসে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর আমেরিকা সফরকালে ওয়াশিংটনের মসজিদ বায়তুর রহমানে ছাত্রীদের সাথে একটি সভা হয়, যে সভায় হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর অনুমতিক্রমে ছাত্রীরা তাঁকে কিছু প্রশ্নও করে।

এক প্রশ্নের উত্তরে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–
সমাজে, ঘরে, শ্বশুরবাড়ির লোকদের সাথে এবং চারপাশে যেসব অস্থিরতা ও অস্বস্তি দেখা দেয় তা 'ইস্তেগফার' এবং 'লা হাওলা ওয়া কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যুল আযীম' পড়ার মাধ্যমে দূর করা সম্ভব।

(আল ফযল ইন্টরন্যাশনাল, ১৭ আগস্ট ২০১২)

একটি পূর্ণাঙ্গীন বার্তা

২০১১ সালে যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা উপলক্ষ্যে ২৩ জুলাই তারিখে সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) আহমদী মহিলাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদানের পূর্বে পবিত্র কুরআন করীমের যে সকল আয়াত পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা হলো নিকাহ্'র খুতবার জন্য নির্ধারিত সেই চারটি আয়াত যা এই পুস্তকের প্রারম্ভে অনুবাদসহ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর এই সম্পূর্ণ বক্তৃতা এমন সব নির্দেশনায় পরিপূর্ণ যা আমাদের আহমদী মহিলাদের সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত।

তাশাহ্হুদ, তাআউয এবং সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–

"অধিবেশনের প্রারম্ভে যে আয়াতগুলো আপনাদের সামনে পাঠ করা হয়েছে তা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সূরার আয়াত যা নিকাহ্র সময় পড়া হয়ে থাকে। বিয়েতে সাধারণত পুরুষরা বেশি সংখ্যায় অংশগ্রহণ করে থাকে ফলে এই আয়াতগুলো সম্পর্কে তারা জানে। অন্ততপক্ষে এতটুকু অবশ্যই জানে যে, এই আয়াতগুলো বিয়ের সময় পাঠ করা হয়ে থাকে। এতে আমল করার ক্ষেত্রেও তারা সোচ্চার তা আমি বলছি না। কিন্তু বিয়ের ঘোষণার সময় মহিলারা অনেক কম সংখ্যায় উপস্থিত থাকে বা অংশগ্রহণ করে, তাই তাদের সামনে সংক্ষেপে এর বিষয়বস্তু বর্ণনা করার জন্য এই আয়াতগুলো আমি নির্বাচন করেছি।

এই আয়াতসমূহে নারী ও পুরুষের জন্য বিয়েশাদির মত গুরুত্বপূর্ণ বন্ধন বজায় রাখার নিমিত্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কথা যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তা হলো, তাকওয়া। যেভাবে আপনাদেরকে বলা হয়েছে, এই আয়াতগুলোর মাঝে প্রথম আয়াতটি হলো সূরা নিসার আয়াত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতটি সূরা আহযাবের এবং চতুর্থ আয়াতটি সূরা হাশরের।

আমি আগেও বলেছি যে, সর্বপ্রথম যে বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তা হলো তাকওয়া। প্রথম আয়াতে তাকওয়া শব্দটি দু'বার এসেছে এরপর দ্বিতীয় আয়াতেও তাকওয়া শব্দটি এসেছে। তারপর চতুর্থ ও শেষ আয়াতে তাকওয়ার উল্লেখ দুই বার রয়েছে। অতএব বিয়ের খুতবায় যে

আয়াতগুলো পাঠ করা হয় এতে পাঁচ বার তাকওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। যতবারই তাকওয়ার কথা উল্লেখ হয়েছে ততবারই বলা হয়েছে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন কর এবং এরপর সেই সাথে নতুন একটি দিক-নির্দেশনাও প্রদান করেছেন আর তা হলো, তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। এ কাজটি তোমাদেরকে অবশ্যই সম্পাদন করতে হবে। কেননা তা তোমাদের এই সম্পর্ক অটুট রাখার জন্য আবশ্যক।

গতকাল আমি তাকওয়া বা খোদাভীতির কথা বলেছিলাম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের মাঝে তাকওয়ার অনেক উন্নত মান দেখতে চেয়েছেন। আল্লাহ তা'লা তাঁকে বলেছেন, মানুষ যদি নিজের মাঝে তাকওয়ার মূলকেই সুপ্রোথিত করে নেয় তাহলে তার সবকিছু লাভ হবে। এই পৃথিবীর সম্মান ও মর্যাদা, এই পৃথিবী এবং এই পার্থিব জ্ঞানগরিমা কিছুই না। একজন মু'মিন পুরুষ বা নারী যদি মনে করে যে, ধর্মকে আমি জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিব আর এই বিশ্বাস রাখে যে, আমি বয়আতের যে অঙ্গীকার করেছি তা হতে হবে আমার হৃদয়ের ধ্বনি আর আমি এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে চাই; তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, এক্ষেত্রে সফলতার ভিত্তি হলো তাকওয়া। তাকওয়া ছাড়া এ অঙ্গীকার রক্ষা করা সম্ভব নয় এবং একজন মু'মিন পুরুষ বা নারী নিজের ঈমানী অবস্থা ও অবস্থানকে ধরেও রাখতে পারে না। যদি এটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে ইহজগতেও ধন্য হবে আর পরকালেও। একজন মানুষ (সে পুরুষ কিংবা নারী) যখন বিশ্বাসী বা মু'মিন হওয়ার দাবি করে তখন নিশ্চিতরূপে খোদা তা'লাকে পাওয়ার আশা ও আকাঙ্খা তার মাঝে জাগে এবং জাগা উচিত, যেন তার ইহকাল ও পরকাল সুন্দর ও সুনিশ্চিৎ হয়। অতএব যদি খোদা তা'লাকে পেতে হয়, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হয়, তাহলে তাকওয়ার পথে চলা একান্ত আবশ্যক। আর প্রত্যেক তুচ্ছাতিতুচ্ছ মন্দ কর্মকেও ঘৃণাভরে পরিহার করা এবং প্রত্যেক ছোট থেকে ছোট পুণ্যকর্ম আন্তরিকতার সাথে করার নামই তাকওয়া। মন্দকর্ম বা পুণ্যকর্মের সংজ্ঞা মানুষ নিজে নির্ধারণ করবে না বরং তাকওয়া হলো, তোমরা তা আল্লাহ তা'লার শিক্ষার মাঝে সন্ধান কর। মহানবী (সা.)-এর নির্দেশাবলী এবং তাঁর জীবনাদর্শের মাঝে তা অনুসন্ধান কর। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), যাকে এ যুগের মানুষের কাছে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইমাম

নিযুক্ত করে পাঠানো হয়েছে তাঁর নির্দেশসমুহ পাঠ কর ও নোট কর এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা কর। অর্থাৎ দেখ, এর মধ্যে এমন কোন কোন পাপের উল্লেখ রয়েছে যা থেকে আমাদেরকে নিবৃত থাকতে বলা হয়েছে আর এমন কোন কোন ভালো ও পুণ্যকর্মের উল্লেখ রয়েছে যা আমাদেরকে পালন করতে বলা হয়েছে। শুধুমাত্র এই আয়াতগুলোতেই তাকওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয় নি বরং কুরআন করীমের অসংখ্য স্থানে এর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন–

"পবিত্র কুরআনে অন্য সকল আদেশ-নিষেধের চেয়ে তাকওয়া এবং পরহেযগারী অবলম্বনের প্রতিই বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এর কারণ হলো, তাকওয়া প্রত্যেক মন্দ থেকে মুক্ত থাকার শক্তি যোগায় এবং প্রত্যেক পুণ্যকর্মের দিকে ধাবিত হওয়ার গতি সঞ্চার করে। আর এমন গুরুত্বারোপের মূল কারণ হলো তাকওয়া মানুষের জন্য প্রতিটি পদক্ষেপে শান্তি ও নিরাপত্তার রক্ষাকবচ এবং সকল প্রকার ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার সুরক্ষিত দূর্গস্বরূপ। একজন মুত্তাকী মানুষ এমন অনেক বৃথা বিষয় এবং ভয়াবহ ঝগড়াবিবাদ থেকে মুক্ত থাকতে পারে যাতে অন্য লোকেরা জড়িয়ে গিয়ে অনেক সময় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয় আর নিজেদের অধৈর্য ও কু-ধারনার বশবর্তী হয়ে জাতির মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং বিরুদ্ধবাদীদেরকে আপত্তি করার সুযোগ করে দেয়।"

(আইয়ামুস সুলেহ, রূহানী খাযায়েন, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ৩৪২)

তিনি (আ.) পুনরায় বলেন–

"মানুষের আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য তাকওয়ার সকল সূক্ষ্ম পথে চলার মাঝে নিহিত। তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথগুলো হচ্ছে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের সূক্ষ্ম-সুন্দর ছাপ ও দৃষ্টিনন্দন বৈশিষ্ট্য। আর এটি স্পষ্ট যে, খোদা তা'লা কর্তৃক ন্যাস্ত আমানত ও ঈমান-সংশ্লিষ্ট অঙ্গীকারসমূহের প্রতি যথাসাধ্য যত্নবান থাকা এবং আপাদমস্তক যত শক্তিবৃত্তি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রয়েছে যার মধ্যে বাহ্যিকভাবে রয়েছে চোখ, কান, হাত, পা আর অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং অভ্যন্তরীনভাবে হৃদয় ও অন্যান্য শক্তিবৃত্তি এবং গুণাবলী– এগুলোকে প্রয়োজন মতে যথাস্থানে যথাসম্ভব ব্যবহার করা এবং অবৈধ ক্ষেত্র থেকে বিরত রাখা এবং এ সবের গোপন

হামলা সম্পর্কে সতর্ক থাকা আর অপরদিকে বান্দার অধিকারের বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা। এটি সেই রীতি যার সাথে মানুষের সকল আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য সম্পৃক্ত। এটিকেই আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআনে তাকওয়ার পোশাক নামে অভিহিত করেছেন। দেখ, 'লিবাসুত তাকওয়া' হচ্ছে কুরআন শরীফের শব্দ। এটি এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যে, তাকওয়ার মাধ্যমেই আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। তাকওয়া হলো, খোদা তা'লার সকল আমানত প্রত্যার্পণ, ঈমানী অঙ্গীকার পালন এবং একইভাবে সৃষ্টির সকল আমানত প্রত্যার্পন ও অঙ্গীকার যথাসাধ্য পালন করার চেষ্টা করা; অর্থাৎ এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দাবিগুলোর ওপর যথাসম্ভব প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

(বারাহীনে আহমদীয়া, পঞ্চম খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, ২১তম খণ্ড, পৃ. ২০৯-২১০)

অতএব এটি হলো সেই মানদণ্ড যা অর্জিত হলে সমাজকে তা অনেক সমস্যা থেকে রক্ষা করে। এটি সেই মানদণ্ড যা আমাদের মাঝে সৃষ্টি হয়ে গেলে আমাদের জাগতিক কার্যকলাপও ধর্মীয় কাজ হিসেবে গণ্য হবে। আমাদের প্রতিটি আকাঙ্খা ও বাসনা হবে আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে আর আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারীদের এমন কোন আশা আকাঙ্খা থাকে না যা নিছক পার্থিবতার মোহে কলুষিত। অতএব এরূপ তাকওয়া যদি অর্জিত হয়ে যায় তাহলে সমাজের মৌলিক একক অর্থাৎ নরনারীর সম্পর্ক সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির সাথে হওয়া সত্ত্বেও স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সুবাদে তারা একক সত্ত্বায় পরিণত হয়। এটিই হলো সেই আত্মীয়তার বন্ধন ও সম্পর্ক যার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের ধারা সূচিত হয়। এই মৌলিক ভিত্তি বা এককে যদি তাকওয়া না থাকে, এই দম্পতি যদি তাকওয়াশূণ্য হয় তবে পরবর্তী প্রজন্মের তাকওয়ারও কোন নিশ্চয়তা নেই আর সমাজের উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং তাকওয়ারও কোন নিশ্চয়তা নেই। কেননা এক থেকে দুই, দুই থেকে চার–এভাবেই সমাজ গঠিত হয়। অতএব একজন মু'মিন যখন তাকওয়ার সন্ধানে থাকে তখন সে শুধু নিজের জন্য নয় বরং নিজের পরবর্তী প্রজন্ম এবং সমাজের জন্যও তা সন্ধান করে। মৌলিক এই ইট বা ভিত্তিতে তাকওয়া সৃষ্টি হয়ে গেলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মেও তাকওয়ার নিশ্চিয়তা লাভ আর সামাজেও তাকওয়ার নিশ্চয়তা লাভ হবে এবং সমাজে উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়বে।

যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন–
তাকওয়া হলো নিরাপত্তার মূলমন্ত্র বা রক্ষাকবচ। অতএব তুমি যদি নিরাপত্তা চাও, নিঃসন্দেহে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিরাপত্তার দুর্গে অবস্থানের প্রত্যাশা রাখে, তা সে যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন অথবা ধর্মে বিশ্বাস নাইবা করুক। অন্যের নিরাপত্তা বিধান না করলেও সে নিজের জন্য নিরাপত্তা কামনা করে। একজন গুণ্ডা-বদমাশ, চোর বা ডাকাত অন্যের ক্ষতি সাধন করলেও নিজে সকল প্রকার ক্ষয়ক্ষতির উর্ধ্বে থাকতে চাইবে। অতএব প্রত্যেকেই যখন নিরাপদে থাকার বাসনা রাখে (আর চায়) তার যেন কোন ক্ষতি না হয়, তার দিন ও রাত যেন মঙ্গলজনকভাবে ও নিরাপদে অতিবাহিত হয়, প্রত্যেক শত্রু হতে যেন সে নিরাপদে থাকে, সকল প্রকার দুঃচিন্তা হতে মুক্ত থাকে, তাকে যেন সমস্যাবলীর সম্মুখীন হতে না হয়। অতএব একজন মু'মিন যদি এমনটি চায় তাহলে তার জন্য একমাত্র পথ হলো তাকওয়া অবলম্বন করা। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের সামনে এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন যে, তোমরা যদি শান্তি ও নিরাপত্তা চাও তবে তাকওয়া অবলম্বন কর। কেননা তাকওয়াই হলো নিরাপত্তার একমাত্র নিশ্চয়তা। এটিই তোমাদেরকে নিরাপদ রাখবে। তাকওয়ার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ তা'লার আশ্রয় বেষ্টনিতে স্থান পেতে পার।

এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মউদ (আ.) বলেন–
"তোমরা যদি খোদার হয়ে যাও তবে নিশ্চিতভাবে জেনো! খোদা তোমাদেরই। তোমরা ঘুমিয়ে থাকবে কিন্তু খোদা তা'লা তোমাদের জন্য সজাগ থাকবেন।"

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃ.২২)

অতএব স্বয়ং খোদা তা'লা যার জন্য জাগ্রত থাকেন এবং যাকে সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন, সে শান্তি ও নিরাপত্তার এমন এক শক্তিশালী দূর্গে অবস্থান করে, যেটাকে পৃথিবীর কোন শক্তিই ধ্বংস করতে পারে না।

কিন্তু যেভাবে পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য শর্ত হলো তাকওয়া। অর্থাৎ খোদাভীতি অবলম্বন করে সকল প্রকার মন্দ বিষয় এড়িয়ে চলা এবং সকল প্রকার পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা আবশ্যক। সত্যিকার অর্থেই

যদি খোদাভীতি সৃষ্টি হয়ে যায় তবেই মানুষ মন্দকর্ম থেকে বিরত থাকে। এজন্যই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, তাক্ওয়া (মানুষকে) সকল প্রকার মন্দকর্ম হতে বিরত থাকার শক্তি যোগায়। এই শক্তি যখন অর্জিত হবে তখন সেই মহামূল্যবান রক্ষাকবচ মানুষের হাতে এসে যায় যা শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করে। মানুষ তখন এমন এক শক্তিশালী দূর্গে এসে যায় যার চতুর্দিকে খোদা তা'লা পাহারা বসিয়ে রেখেছেন আর কোন ধরণের শয়তানী ষড়যন্ত্র যার ক্ষতি করতে পারে না। শয়তানী ধ্যানধারণা ও চিন্তাধারা তখনই মাথা চাড়া দেয় যখন মানুষ খোদা তা'লাকে ভুলে বসে আর খোদার ভয় থাকে না। অতএব খোদাভীতি থাকলে মানুষের হাতে এমন কোন অপকর্ম সাধিত হতে পারে না যা আল্লাহ্ তা'লাকে অসন্তুষ্ট করে এবং পৃথিবীর শান্তিকে বিনষ্ট করে আর নিজেদের ও সমাজের শান্তিতে বিঘ্ন ঘটায়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন–
এই দূর্গে অবস্থান গ্রহণের মাধ্যমে তোমরা বহু নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা পাও এবং নিরাপদ হয়ে যাও। অনর্থক ও ভয়ঙ্কর ঝগড়াবিবাদ থেকে রক্ষা পাও। অতএব বর্তমান সমাজে আমাদের জন্য একান্ত করণীয় বিষয় হলো- নিরর্থক ও বৃথা কার্যকলাপ এড়িয়ে চলার মাধ্যমে, নিজেদের জীবনে সুখ ও শান্তি আনয়ন করা। আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে বিভিন্ন ধরণের নৈরাজ্য এবং ভয়ানক সব ঝগড়াবিবাদ থেকে বাঁচার ও বাঁচানোর পন্থা শিখিয়েছেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত মানুষ এসব পন্থায় কর্ণপাত না করে নিজেদের জীবন ধ্বংস করে দেয়। সেই সৌন্দর্য হতে নিজেদেরকে বঞ্চিত রাখে যা আল্লাহ্ তা'লা এক মু'মিন নর ও নারীকে প্রদান করেছেন আর যা এক মু'মিন নরনারীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত, যা তার সৌন্দর্য বহুগুণে বর্ধিত করে।

পোশাক-আশাক বা বাহ্যিক সৌন্দর্য কোন বিষয় নয়। প্রকৃত সৌন্দর্য হচ্ছে তা যা আল্লাহ তা'লা প্রদান করেন।

মহিলারা তাদের সৌন্দর্য্য ও সাজগোজ নিয়ে বেশী যত্নবান হয়ে থাকে কিন্তু এমন বহু নারী আছে যারা তাদের প্রকৃত সৌন্দর্য সম্পর্কে অবগত নয়। সুন্দর পোশাক, মেকআপ আর গহনা পরার মাধ্যমে সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায় না। প্রকৃত সৌন্দর্য হলো তা-ই যা আল্লাহ তা'লা আমাদের শিখিয়েছেন। সেই সৌন্দর্য সম্পর্কে তারা অজ্ঞ থেকে যায় যার মাধ্যমে তাদের সৌন্দর্য বহুগুণ বৃদ্ধি পায়

আর যা স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে লাভ হয় না, এই সমাজের বৃথা কার্যকলাপে গা ভাসিয়ে দিয়ে লাভ হয় না, পর্দা ছেড়ে দিয়ে তা হস্তগত হয় না, ঘোমটা খুলে ফেলে তা পাওয়া যায় না এবং যা নিজ স্বামীর নিকট জাগতিক কামনা-বাসনা ব্যক্ত করার মাধ্যমেও লাভ হয় না। অপর দিকে পুরুষদের জন্যও এক সৌন্দর্য রয়েছে। পুরুষদের সেই সৌন্দর্য ফ্যাশন্যাবল নারীর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে লাভ হয় না, বরং এটি আল্লাহ তা'লার তাকওয়া অবলম্বনের মাধ্যমে লাভ হয়। আজকাল পাশ্চাত্যের ভাবধারায় প্রভাবিত আমাদের কতিপয় নারীও এই ধরণের মতামত ব্যক্ত করে যে, সম্ভবত এটিই সৌন্দর্য। সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, তাক্ওয়ার পোশাক পরিধানের মাধ্যমেই এই সৌন্দর্য অর্জিত হয়। তাক্ওয়ার পোশাকও সে-ই লাভ করে, যে তার ঈমানী অঙ্গীকার ও আমানতকে নিজের সমস্ত যোগ্যতা ও শক্তিসামর্থ্য কাজে লাগিয়ে পূর্ণ করার চেষ্টা করে, হোক সে পুরুষ বা নারী।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন–

নিজ দেহের বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে এসব আমানতের দাবি পূরণার্থে কাজে লাগাও। প্রত্যেক নারী ও পুরুষের কাজ হলো নিজের কান, চোখ, মুখ এবং অন্য সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহার কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির অধিনে করা। পারিবারিক ঝগড়াবিবাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, মুখ, কান এবং চোখ অনেক বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। এসবের সঠিক ব্যবহার না পুরুষরা করছে আর না নারীরা। পূর্বেও আমি বলেছিলাম, যারা নসীহত করার অনুরোধ করে, এমন দম্পতিকে আমি অধিকাংশ সময় এ কথাই বলি যে, পরস্পরের ক্ষেত্রে নিজেদের মুখ, কান বা চোখের সঠিক ব্যবহার কর, তাহলে তোমাদের মাঝে কখনো কোন সমস্যা সৃষ্টি হবে না। মুখের ভাষা যদি কোমল ও ভালোবাসাপূর্ণ হয় তবে কখনো সমস্যা সৃষ্টি হবে না। সাধারণত দেখা যায়, যখন কোন মামলা করা হয় বা ঝগড়াবিবাদের বিষয় আসে তখন পুরুষ বা নারীর মুখই এসব ঝগড়াবিবাদকে দীর্ঘ করতে থাকে। অবশেষে একটি সময় এমন আসে যখন তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে অগ্রসর হয় যে, এখন একত্রে বসবাস করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। একইভাবে উভয় পক্ষের আত্মীয়স্বজনের কথা অথবা অন্য এমন কোন কথা, যা শুনলে যেকোন প্রকার তিক্ততা সৃষ্টি হবার আশংকা থাকে তা শোনা থেকে নিজেদের কান বন্ধ রাখুন। এক পক্ষ যদি কখনো কোন ভুল কথা বলে বসে

সেক্ষেত্রে অপর পক্ষও তাকে সেভাবেই (ইটের বদলে পাটকেল হয়ে) উত্তর দেয়। ঝগড়া থামানোর উদ্দেশ্যে যদি কিছুক্ষণের জন্য কান বন্ধ রাখা হয় তবে অনেক সমস্যার সমাধান সেখানেই হতে পারে, অবশ্য ঝগড়া করা যদি কোন পুরুষ বা নারীর মজ্জগত অভ্যাস হয়ে থাকে তাহলে তারা ছাড়া (অন্য ক্ষেত্রে) সাধারণত ঝগড়া হয় না। অতএব কান বন্ধ করে রাখ নিরাপদ থাকবে।

একটি ঘটনা আমি প্রায়শ শুনিয়ে থাকি আর সেটি একটি সত্য ঘটনা। এক দম্পতি ঝগড়া করছিল। একটি ছোট মেয়ে তাদেরকে দেখছিল আর অবাক বিস্ময়ে তাদের প্রতি তাকিয়ে ছিল। যাহোক, স্বল্পক্ষণ পর তাদের উভয়েই সম্বিত ফিরে পেল যে, তারা ভ্রান্ত কাজ করছে। নিজেদের লজ্জা লুকোনের জন্য তারা তাকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার মা-বাবা কি কখনো ঝগড়া করে না বা পরস্পর কঠোর বাক্যবিনিময় করে না বা রাগ করে না? সে বলে, হ্যাঁ! তবে আব্বা যখন রাগ করেন তখন আম্মা নিরবতা অবলম্বন করেন আর আমার আম্মা যখন রাগান্বিত হন তখন আব্বা চুপ হয়ে যান। একারণে ঝগড়া আর দীর্ঘ হয় না। এর ফলে শিশুদের ওপরও এই পবিত্র প্রভাব পড়ে। একে অন্যের অপছন্দনীয় বিষয়গুলো দেখা থেকে নিজেদের চোখ বন্ধ রাখুন আর পরস্পরের ভালো বিষয়গুলো দেখার জন্য নিজেদের চোখ খুলে রাখুন। মূলত নারী হোক বা পুরুষ সব মানুষের মাঝে ভালো-মন্দ উভয়টিই থেকে থাকে। আমি দেখেছি, সচরাচর পুরুষই প্রথমে অন্যায় করে। তাদের চোখে নারীদের ভুলত্রুটি ধরা পড়া আরম্ভ হয়ে যায় আর প্রত্যুত্তরে মহিলারাও স্বামীদের ভুলত্রুটি অনুসন্ধান করতে শুরু করে। এক্ষেত্রে তারা এতদূর চলে যায় যে, ফিরে আসার আর কোন পথ অবশিষ্ট থাকে না। তাই এমন অবৈধ জিনিসের প্রতি চোখ তুলেও তাকানো উচিত নয় যার ফলে তোমাদের তাকওয়া প্রশ্নবিদ্ধ হয়। এরপর পারিবারিক এমন সব বিষয়াদিও রয়েছে যার ফলে পারস্পরিক আস্থায় আঘাত আসে। এমন ক্ষেত্রে দৃষ্টির পবিত্রতা বজায় রাখলে সম্পর্কে চিড় ধরতে পারে না এবং এসব সমস্যার নিরসন হয়ে যায়। অতএব নিজ হৃদয়কে অবৈধ বিষয়াবলীর কেন্দ্রস্থল হতে দিবেন না। আল্লাহ্ তা'লার ভয়ে একে যদি পরিপূর্ণ রাখেন তবে কোন সমস্যাই সৃষ্টি হবে না। পিছনের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করেও শয়তান কখনো নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে পারে না। শয়তান এমন কোন সত্তা নয় যার সম্পর্কে বুঝা যাবে যে, কীভাবে সে প্রবেশ করেছে? প্রত্যেক অসৎ সঙ্গ এবং খারাপ বন্ধু যে আপনার সংসার ভাঙ্গার চেষ্টা

করে, যে স্বামী অথবা শ্বাশুড়ী কিংবা ননদের বিরুদ্ধে অথবা স্বামীকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে অথবা এমন কোন ছোট কথা পাড়ে যার ফলে হৃদয়ে অস্থিরতা বা সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তখনই বঝুতে হবে যে, সে শয়তান। অতএব এমন সব শয়তান সম্পর্কে সতর্ক থাকা প্রত্যেক মু'মিন নরনারীর জন্য আবশ্যক আর এই আস্থা স্থাপিত হলেই এই বন্ধনের ভিত আরো দৃঢ়তা লাভ করে। এই বিশ্বাস যখন ভেঙ্গে যায় তখনই সেই প্রাসাদ যা প্রেম, প্রীতি ও ভালোবাসার অঙ্গীকারে নির্মিত তা ধুলিসাৎ হয়ে যায় বরং ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়।

অতএব একজন মু'মিন যেখানে তার খোদার সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা করে সেখানে মানুষের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণের জন্যও তার মাঝে সর্বাত্মক চেষ্টা থাকে। যেভাবে আমি গতকালও বলেছিলাম, বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা ছাড়া আল্লাহ্র প্রাপ্য প্রদানের ক্ষেত্রে ভালো মানে পৌঁছা সম্ভব হয় না; তাতেও চিড় ধরতে শুরু করে বা ফাটল দেখা দেয়। কোন পাত্রে একবার যখন ফাটল ধরে তখন ধীরে ধীরে তা বাড়তেই থাকে। অতএব বান্দার প্রাপ্য প্রদান করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়। হুকূকুল ইবাদ বা বান্দার প্রাপ্য-অধিকারের মাঝে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক প্রাপ্য প্রদানও অনেক গুরুত্ব রাখে। সমাজ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নতির ক্ষেত্রে এসবের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। তাই এগুলো পালন করা প্রকৃত এক মু'মিনের অনেক বড় একটি দায়িত্ব।

স্বামী-স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা এজন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং বিয়ে পড়ানো বা নিকাহ্র এলানের সময় এই আয়াতগুলো মহানবী (সা.) এজন্যই রেখেছেন যে, তোমরা যদি তাক্ওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে পরস্পরে প্রাপ্য অধিকার প্রদান কর, তবেই তোমরা খোদা তা'লার সব আমানত ও ঈমানী অঙ্গীকার সঠিক অর্থে রক্ষা করতে পারবে আর নিজ সমাজের সব আমানত ও অঙ্গীকার সঠিক ভাবে পালন করতে পারবে। অতএব প্রত্যেক মু'মিন নর-নারীকে, বিশেষ করে প্রত্যেক আহমদী নর-নারীকে স্মরণ রাখতে হবে যে, তার অঙ্গীকার তখনই সে পূর্ণ করতে পারবে যখন সে তার সকল আত্মীয়তার মূলে তাদের যে প্রাপ্য রয়েছে তা প্রদানে সচেষ্ট থাকবে।

আল্লাহ তা'লা যেখানে বিয়ের পবিত্র বন্ধন পারস্পরিক **প্রশান্তির** জন্য সৃষ্টি

করেছেন, সেখানে এটি মানুষের বংশধারা চলমান রাখার মাধ্যমও বটে। পবিত্র এই বন্ধনের মাধ্যমে এমন বংশধর জন্ম নিবে, যাদের জন্য সুশিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তা সামাজিক নিরাপত্তাও নিশ্চিৎ করে। বিয়ের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র দৈহিক প্রশান্তি এবং বংশ বৃদ্ধি করা নয়, কেননা এমনটি তো জীবজন্তুর মাঝেও বিদ্যমান। মানুষকে আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টির সেরা জীব বানিয়েছেন। তাই এর সাথে সম্পৃক্ত আবশ্যিক কিছু বিষয়াদিও রয়েছে। আর এর মাঝে মানুষের মানসিক প্রশান্তিও অন্তর্নিহিত রয়েছে। একারণে আত্মীয়তার ক্ষেত্রে মহানবী (সা.) কুফু বা দুপক্ষের সমতার প্রতিও খেয়াল রাখতে বলেছেন আর কুফু-র অধীনে অনেক জিনিসই এসে যায়; যেমন জাতি বা বংশ পরিচয় এবং শিক্ষাদীক্ষা সবই এর অধীনে আসে। কিন্তু এর অজুহাত দেখিয়ে সম্পর্ক না করার কিংবা সম্পর্ক ছিন্ন করার বৈধতা দাঁড় করানো হয়। তাক্ওয়ার ওপর চললে এসব অজুহাত সৃষ্টি হয় না আর তখন সঠিক সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা যায়। এরপর আত্মীয়তার মাধ্যমে জ্ঞানগত প্রশান্তিও লাভ হয় আর আধ্যাত্মিক প্রশান্তির উপকরণও এই আত্মীয়তার মাধ্যমেই লাভ হয়। নারী-পুরুষের মাঝে যদি পারস্পরিক সমঝোতা এবং সম্প্রীতি বজায় থাকে, তবেই পরবর্তী প্রজন্মের মানসিক, আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানগত বৃত্তির বিকাশ ঘটে। অতএব একজন পুরুষ ও একজন নারী, যারা একটি বংশের ভিত রচনা করে থাকে, সত্যিকার অর্থে তারা একটি সমাজের গোড়াপত্তন করে এবং একটি জাতিকে ভালো অথবা মন্দ বানানোর ভিত্তিও স্থাপন করে। অতএব এ বিষয়ে গভীর প্রণিধান করা প্রয়োজন। বিয়ে উপলক্ষ্যে (পঠিত আয়াতে) পাঁচ জায়গায় তাকওয়া শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা মানুষের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছেন যে, তোমাদের প্রতিটি কথা, কর্ম এবং কার্যকলাপ যেন নিছক তোমাদের নিজেদের ইচ্ছা পুরণের জন্যই না হয়, বরং তা যেন তাক্ওয়ার ওপর ভিত্তি করে, খোদাভীতির সাথে এবং আল্লাহ্র প্রাপ্য ও পরস্পরের প্রাপ্য প্রদানের নিমিত্তে হয়ে থাকে। এমনটি নিশ্চিত হলে সেই প্রজন্ম সৃষ্টি হয় যারা পিতামাতার জন্য দোয়া করে, যেভাবে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ পাওয়া যায়। পিতামাতার এই নেক শিক্ষাদীক্ষার সুবাদে তারা এই দোয়া করে থাকে যে, رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (সূরা বনি ইসরাঈল 17: 25)। অর্থাৎ 'হে আমার প্রভু! তুমি তাদের প্রতি সেভাবে দয়া কর যেভাবে শৈশবে তারা আমায় লালনপালন করেছিলেন'। শুধু প্রতিপালনই করেন নি, বরং আমার শিক্ষাদীক্ষার প্রতিও

তারা দৃষ্টি রেখেছেন। আমার আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতিও দৃষ্টি রেখেছেন, আমার নৈতিক শিক্ষার প্রতিও মনোযোগী ছিলেন আর জাগতিক শিক্ষার প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন যাতে করে আমি সমাজের একটি কল্যাণকর অংশে পরিণত হই। কিন্তু যে সমস্ত পরিবারে নারী-পুরুষ উভয়েই ঝগড়াবিবাদে লেগে থাকে এবং যে সমস্ত ঘরে শুধুমাত্র অহমিকার পূজা হয় সে সমস্ত ঘরে এমন সন্তান জন্মগ্রহণ করে না, (দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া)। কতিপয় ঘর এমনও হয়ে থাকে যেখানে সন্তানরা প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে থাকে আর পিতামাতার মধ্যে যে-ই সীমালঙ্ঘন করে, তার প্রতি সে ঘৃণা প্রদর্শন করে ঘর ছেড়ে চলে যায় আর নিজের তরবিয়্যত বা শিক্ষাদীক্ষার প্রতি নিজেই দৃষ্টি দেয় (অবশ্য এমনটি খুব কমই হয়ে থাকে)। অতএব, বংশধরদের রক্ষার জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। শুধুমাত্র নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন না, বরং নিজ ধ্যানধারণা ও আবেগ-অনুভূতিকে জলাঞ্জলি দেয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা আবশ্যক, কেবল তবেই একটি সুন্দর সমাজ গড়ে উঠতে পারে।

এই দোয়া করার মন-মানসিকতা কেবল একজন মু'মিন সন্তানের মাঝেই সৃষ্টি হতে পারে। এটি কেবল সেই ব্যক্তির মাঝেই সৃষ্টি হতে পারে যে বুঝে, তাকওয়া কী? সে বুঝতে পারে যে, তাকওয়া হলো নিজ পিতামাতার অনুগ্রহরাজির জন্য তাদের গুণগ্রাহী হয়ে তাদের জন্য খোদা তা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা, দোয়া করা এবং তাদের কল্যাণার্থে কাকুতিমিনতি করা। আল্লাহ্ তা'লা অসংখ্য নারী ও পুরুষ বিস্তার ঘটিয়েছেন আর কাফেরদের মাধ্যমেও তা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, হে লোকেরা! তোমাদেরকে যে অগণিত নারী-পুরুষরূপে বিস্তৃত করা হয়েছে এজন্য তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন কর। অর্থাৎ হে সেই বিশেষ ব্যক্তিবর্গ! ধর্মের প্রতি যাদের আকর্ষণ রয়েছে, যদি খোদা তা'লার সন্তুষ্টি তোমাদের লক্ষ্য হয় এবং ধর্মই যদি তোমাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে সেই তাকওয়ার অনুসন্ধান কর যা তোমাকে আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছে দিবে। সেই খোদাভীতির অন্বেষণ কর যা তোমাদেরকে আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য পাপ থেকে বিরত রাখে এবং পুণ্য করার সুযোগ সৃষ্টি করে। আমরা বরং দেখি জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে মুমিনদের বিপরীতে কাফেরদের সংখ্যা অধিক। কিন্তু এখানে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, প্রকৃত সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্ধারিত হয় তাকওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে। কেননা চূড়ান্ত পরিণাম ও উত্তম পরিণতি তাদেরই

হয়ে থাকে আর তাদের দ্বারাই পৃথিবীতে শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং পার্থিবতার মোহে আচ্ছন্ন লোকদের দ্বারা তোমরা প্রভাবিত হয়ো না। তাদেরকে দেখে প্রভাবিত হয়ো না বরং তাক্ওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হও। তাহলে ঐশী পুরস্কারের উত্তরাধিকারী হবে আর তোমাদের বংশধরেরাও তোমাদের জন্য দোয়া করবে আর খোদার দরবারে তোমাদের মর্যাদা উন্নীত হওয়ার কারণ হবে।

আমাদের সামনে যেসব পারিবারিক সমস্যা এসে থাকে তাতে কখনো নারীর পক্ষ থেকে আবার কখনো পুরুষের পক্ষ থেকে এই বিষয়টি জোরালোভাবে উত্থাপন করা হয় যে, আমাদের পিতামাতা বা ভাইবোনদের সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী'র কোন একজন বাজে মন্তব্য করেছে। পুরুষরা স্ত্রীদের বিরুদ্ধে আর স্ত্রীরা পুরুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, আমাদের পিতামাতার বিরুদ্ধে বাজে মন্তব্য করা হয়েছে। তাদেরকে এই বলেছে সেই বলেছে এবং তাদেরকে গালি দিয়েছে। স্মরণ রাখবেন! তাক্ওয়ার সাথে এ বিষয়টির কোনই সম্পর্ক নেই। এটি ঘরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। শুধু এতটুকুই নয়, শুধু অভিযোগের মাঝেই বিষয়টি সীমাবদ্ধ থাকে না বরং কখনো কখনো এমনও হয় যে, কতক মানুষ রয়েছে সন্তানদের মাঝে তাদের দাদা-দাদি, নানা-নানির বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টির চেষ্টা করে। কতক অভিযোগ সত্যও বটে অর্থাৎ একে অপরের নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে অশালীন বাক্য ব্যবহার করা হয় এবং সন্তানদের হৃদয়ে তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এগুলোর সাথে তাকওয়ার দূরতম কোন সম্পর্কও নেই। এটি তাক্ওয়া নয়। তোমরা তাক্ওয়া থেকে দূরে সরে যাচ্ছ। সুতরাং রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়দের বিষয়েও যত্নবান হও।

এ আয়াতগুলোর প্রথমটিতে এদিকেই মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে, নিজেদের রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়দের প্রতি যত্নবান হও। শুধু পিতামাতারাই যে খেয়াল রাখবেন তা নয় বরং আপনাদের সন্তানদেরকেও রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়তার পবিত্রতা রক্ষা এবং তাদের প্রতি সম্মানবোধের শিক্ষা দিন। কেবল তবেই একটি পবিত্র সমাজ গড়ে ওঠা সম্ভব। এ পবিত্রতা রক্ষার প্রতি আপনারা নিজেরাও সমধিক দৃষ্টি রাখুন। কেননা সন্তানদের ওপর পিতামাতার আদর্শের প্রভাব পড়ে। সমগ্র মানবমণ্ডলির মাঝে মহানবী (সা.)-ই মানব

প্রকৃতির সবচেয়ে বেশী জ্ঞান রাখতেন। বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হবার সময় বিবাহের খুতবায় এ আয়াতগুলোকে নির্বাচিত করে তিনি এ চেতনা সৃষ্টি করেছেন অথবা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লার এ আদেশকে সর্বদা সামনে রাখবে। স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন এমন এক বন্ধন যেখানে তোমরা পরস্পরের মঙ্গল কামনা করবে, ভালো চাইবে; সেখানে একে অপরের নিকটাত্মীয়দেরকে এবং শ্বশুরবাড়ির লোকদেরকেও সম্মান করবে। তোমরা যদি প্রকৃত মুমিন হও তাহলে এটা তোমাদের জন্য আবশ্যক। হৃদয়ে যদি আল্লাহ্ তা'লার ভয় থাকে, তাহলে রক্তসম্পর্কের আত্মীয়দের উন্নতির জন্য অবশ্যই তোমাদেরকে নিজেদের দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পাশাপাশি মনকেও কাজে লাগাতে হবে। তোমরা যদি এমনটি না কর বা পুরুষরা যদি এমনটি না করে থাকে তাহলে স্মরণ রেখ, আল্লাহ্ তা'লা হচ্ছেন তোমাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক। তোমাদের কর্ম এবং অবস্থার ওপর আল্লাহ্র দৃষ্টি রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু বলেন, আমি তত্ত্বাবধায়ক; তাই তিনি এমন পুরুষ এবং মহিলাদেরকে সেই কর্মের জন্য শাস্তিও দিয়ে থাকেন যা করতে গিয়ে রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়দের প্রাপ্য প্রদান করা হয় না।

অতএব প্রথম দিন থেকেই এই চিন্তাচেতনা নিয়ে একজন পুরুষ এবং নারীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত যে, আমি শুধুমাত্র একটি সম্পর্কই রক্ষা করব না, অর্থাৎ কেবল স্বামী-স্ত্রীর সাথে এবং স্ত্রী স্বামীর সাথেই সম্পর্ক রক্ষা করবে না বরং নিকটাত্মীয়তার যত সম্পর্ক আছে, সবগুলোই রক্ষা করব। এই মন-মানসিকতা নিয়ে একজন নারীকে স্বামীর ঘরে যাওয়া উচিত এবং পুরুষের উচিত এমন চেতনার সাথে নারীকে বিয়ে করে আনা যে, আমরা আমাদের বৃহত্তর আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখব অর্থাৎ বিবাহের পর উভয় পক্ষের আত্মীয়তাও রক্ষা করব। আমরা যদি বিষয়টি ভালোভাবে উপলব্ধি করে সমাজে এই মনমানসিকতা সৃষ্টি করি তাহলে আমাদের সমাজে সামান্য কারণে যে ঝগড়াবিবাদ শুরু হয়ে মারামারি, পুলিশ কেস আর খোলা-তালাক পর্যন্ত বিষয় গড়ায়, তা ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে।

এরপর সততা হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা সকল পুণ্যের মূল। এক ব্যক্তির এ কথায় যে, আমি শুধু একটি পাপ ছাড়তে পারবো, আমাকে বলুন, আমি কোন পাপটি পরিত্যাগ করব? মহানবী (সা.) তাকে বললেন, মিথ্যা বলা ছেড়ে দাও

আর সদা সত্য বল। যখনই সে কোন পাপ করার চিন্তা করত, মিথ্যা এড়ানোর সুবাদে তার জীবন থেকে একে একে সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়ে যায়।

[আত-তাফসীরুল কবীর, ইমাম রাযী (রহ.) ১৬তম খণ্ড, সূরা তওবা, আয়াত- 'ইয়া আয়্যুহাল্লাযিনা আমানুত্তাকুল্লাহ...', পৃ. ১৭৬, ২০০৪ সনে বৈরুতে মুদ্রিত]

এজন্য আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, সত্য বল বা সততা অবলম্বন কর।

দ্বিতীয় আয়াত যা বিবাহের খুতবায় পাঠ করা হয় আর যা মহানবী (সা.) নির্ধারণ করেছেন, তাতে বলা হয়েছে যে, সরল, সুদৃঢ় এবং স্বচ্ছ কথা বলাই তাকওয়া। কোন কোন কথা নিঃসন্দেহে সত্যি হয়ে তাকে কিন্তু কখনো কখনো সেগুলোর একাধিক অর্থ হতে পারে, যেগুলোর কোন কোনটি পক্ষেও যেতে পারে আবার বিপক্ষেও। অত্যন্ত ধূর্ত প্রকৃতির কিছু মানুষ রয়েছে যারা নিজেদের স্বার্থের কথা বলে আবার ব্যাখ্যা দিয়ে বলে যে, আমি তো একথা বলতে চেয়েছি কিন্তু অন্য সবার দৃষ্টিতে এর অর্থ ভিন্ন কিছু হয়ে থাকে। এখানে বলেছেন 'কওলে সাদীদ' অবলম্বন কর অর্থাৎ অত্যন্ত সহজ-সরল পরিষ্কার কথা বল।

যেভাবে আমি উল্লেখ করেছি, কতক পুরুষ ও নারী এমন রয়েছে যে, বিশেষভাবে যখন তাদের মামলার শুনানী হয় বা বিষয়গুলো সামনে আসে তখন অত্যন্ত চতুরতার সাথে তারা কথা বলে। আল্লাহ বলেন, প্রথমত বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ার সময় প্রত্যেক বিষয়ের প্রকৃত চিত্র তুলে ধর। মেয়ের প্রস্তাব আসলে তখন মেয়ের স্বাস্থ্য, বয়স এবং উচ্চতা ইত্যাদি স্পষ্ট করে বলা উচিত। তার সমস্ত তথ্য ছেলেকে সরবরাহ করা উচিত। কিন্তু ছেলেদের জন্যও আবশ্যক হলো যখন এ তথ্যগুলো সরবরাহ করা হয়ে যায় তখন শুধু মেয়ে দেখার জন্য উপস্থিত হবেন না, বরং তথ্যগুলো যেহেতু পাওয়া গেছে তাই দোয়া করে এ নিয়্যতে যাওয়া উচিত যে, আমরা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করব। এ মানসে যদি যান তাহলে একটি পবিত্র সমাজ গড়ে ওঠবে। আত্মীয়তা যদি তাক্ওয়া বা খোদাভীতির সাথে করা হয় তাহলে মেয়েদের মধ্যে যে অস্থিরতা দেখা দেয় তার অবসান ঘটবে। একইভাবে পাত্রের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ইত্যাদি-সংক্রান্ত কোন ধরনের ত্রুটি থাকলে স্পষ্ট করে বলে দেয়া উচিত। কেননা 'কওলে সাদীদ' হলো বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার পূর্বেই প্রত্যেক বিষয় স্পষ্ট করে উল্লেখ করা। এ বিষয়গুলো যদি (শুরুতেই) সামনে এসে যায় তাহলে পরবর্তিতে ঝগড়াবিবাদ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। যেমন ইউরোপ-

আমেরিকার দেশগুলোতে কিছু বিয়ে হয়। পাকিস্তান অথবা ভারত বা অন্যান্য দেশ থেকেও মেয়েরা এসে থাকে অথবা ছেলেরা বিয়ে করে মেয়েদেরকে নিয়ে আসে। কিন্তু সঠিক এবং স্পষ্ট কথা না বলে মিথ্যার আশ্রয় নেয়ার কারণে এখানে আসার কিছুদিন পরেই খোলা-তালাক পর্যন্ত পরিস্থিতি গড়ায়, যা আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে অত্যন্ত অপছন্দনীয়। যদিও এটি হারাম নয় এবং বৈধ আখ্যা দেয়া হয়েছে কিন্তু এটি খুবই অপছন্দনীয়। এ থেকে বেঁচে চলা উচিত।

শুরুতেই যদি এভাবে সঠিক তথ্যগুলো সরবরাহ করা হয়, তাহলে যেভাবে আমি বলেছি, অনেক বিচ্ছেদের ঘটনা যা সূচনাতেই ঘটে থাকে তা এড়ানো সম্ভব।

কিছু ছেলেমেয়ে নিজদের পছন্দমত অন্যত্র বিয়ে করতে চায় কিন্তু পিতামাতার পীড়াপীড়ি আর কথার কারণে তাদের (অর্থাৎ পিতামাতার) পছন্দসই বিয়ে করে নেয়। এরপর কিছুদিনের মাথায় সে সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়। তাই পিতামাতারও কাজ হলো 'কওলে সাদীদ' অবলম্বন করা এবং যেখানে সম্বন্ধ করছে তাদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া যে, আমার ছেলে অথবা মেয়েকে আমরা এ বিয়ের জন্য বাধ্য করেছি, যাতে অপর পক্ষও চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

বিয়ের পর পরস্পরের মাঝে যে বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে উঠে তার ভিত্তিও 'কওলে সাদীদ' এর ওপর হওয়া উচিত অর্থাৎ পরিষ্কার, খাঁটি এবং সত্য কথার ওপর হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা, যিনি মানব প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক অবগত, তিনি সমাজের শান্তির জন্য এ মৌলিক উপদেশ দিয়েছেন যে, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত কর, তবেই তোমরা পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারবে এবং শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে থাকতে পারবে। আর সেটি হবে এমন সত্য, যাতে বক্রতা বা জটিলতার লেশমাত্র থাকে না। তিনি বলেন, তোমরা যদি এ অঙ্গীকার কর যে, সর্বদা স্পষ্ট এবং পরিষ্কার কথা বলবে, মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথার নিকটেও যাবে না তাহলে খোদা তা'লা তোমাদের পাপ ক্ষমা করার নিশ্চয়তা দিচ্ছেন। এর ফলে তোমাদের কর্মের সংশোধন হয়ে যাবে। স্পষ্টতই যখন কর্মের সংশোধন হয়ে যাবে এবং মানুষ আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে শুরু করবে তখন আল্লাহ্ তা'লাও তাকে ভালোবাসতে আরম্ভ করবেন। যেভাবে আমি হাদীসের উদাহরণ দিয়েছি, মহানবী (সা.) বলেছেন,

মিথ্যা বলা পরিত্যাগ করলে তোমাদের সমস্ত পাপ মুছে যাবে; এ নীতি সবারই আত্মস্থ করা উচিত।

অতএব আল্লাহ এবং রসূলের আদেশনিষেধ মেনে চলার মাঝেই সকল মানুষের জীবনের নিশ্চয়তা নিহিত। পুরুষ হোক বা নারী, তার যদি মুমিন হওয়ার দাবি থাকে তাহলে এগুলো তার মেনে চলা আবশ্যক; আর এতেই আমাদের সফলতা নিহিত। এ সফলতা লাভ হলে পৃথিবীতেও আমাদের জীবন আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে সিক্ত হবে এবং পারলৌকিক জীবনেও তা আমাদেরকে পুরস্কারে ভূষিত করবে।

এ আয়াতগুলোর মধ্য থেকে শেষ আয়াতে তাকওয়ার বরাতে এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে, শুধুমাত্র এ পৃথিবীকেই নিজেদের সাকুল্য সম্পদ মনে করো না। এটা মনে করো না যে, এ পৃথিবীই সবকিছু। এটাও দৃষ্টিতে রাখ এবং লক্ষ্য কর বরং বিশেষভাবে দৃষ্টিতে রাখ যে, এটি কোন সাধারণ বিষয় নয় যে, আগামীর জন্য তোমরা অগ্রে কী প্রেরণ করেছ? কোন্ কোন্ পুণ্য তোমরা সম্পাদন করছ? কেমন তাকওয়া তোমরা অবলম্বন করেছ? নিজেদের নামাযের রক্ষণাবেক্ষণ করেছ কি? নিজেদের স্বামীদের অধিকার প্রদান করেছ কি? স্বামীরা স্ত্রীদের অধিকার প্রদান করেছে কি? সন্তানদের প্রাপ্য প্রদান করেছ কি? নিজেদের অঙ্গীকার সমূহ রক্ষা করেছ কি? নিজেদের রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়তার দাবি পূরণ করেছ কি? আল্লাহ্ তা'লা এ সবকিছুরই হিসাব নিবেন। তাই দৃষ্টিতে রাখ যে, তোমরা অগ্রে কী প্রেরণ করেছ? কেননা প্রকৃত পুরস্কার যা অফুরান-অনন্ত তা হলো পারলৌকিক পুরস্কার। স্মরণ রেখো! এ পৃথিবীতে তোমাদের কর্মকাণ্ড যাই হোক না কেন তা আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টির আড়ালে– এমনটি মনে করো না। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের সকল কর্মকাণ্ড এবং গতিবিধি সম্পর্কে তিনি অবগত। এ আয়াত পুনরায় স্মরণ করাচ্ছে যে, তাকওয়ার দাবি অনুসারে জীবনযাপন না করা এবং এর প্রতি মনোনিবেশ না করাই হলো সকল পাপের মূল। কাজেই তোমরা যদি সত্যিকার চারিত্রিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি চাও তাহলে স্মরণ রেখো! খোদা তা'লার প্রতি ঈমান, দৃঢ় বিশ্বাস এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে পালন করা ব্যতীত এটি অর্জিত হতে পারে না।

সুতরাং বিয়ে-শাদির বিষয়াদির পর সুসম্পর্ক বজায় রাখা বাহ্যত একটি পার্থিব

কাজ বলে মনে হয়, কিন্তু একজন মু'মিনের জাগতিক কার্যক্রম আসলে ধর্মীয় কার্যক্রমই হয়ে থাকে। একজন আহমদী মু'মিন নারী এবং মু'মিন পুরুষকে নিজ জীবন এই অভিগমনেই পরিচালনা করতে হবে, যেন তাদের যেসব অঙ্গীকার রয়েছে সেগুলো রক্ষা করতে পারে। তবেই তারা পুরস্কার পাবে এবং তবেই তারা সে অঙ্গীকার রক্ষাকারী হবে, যা যুগ ইমামের সাথে অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে বয়আতের অঙ্গীকারের আদলে করেছে। আমাদের মেয়েদেরকে এবং মহিলাদেরকে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করা। খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং পবিত্র বংশধারা রক্ষার জন্যই বিয়ের প্রয়োজন। এ কারণেই জীবনসাথি খোঁজার সময় মহানবী (সা.) পুরুষদেরকে যেসব গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, (অর্থাৎ বিয়ের সম্বন্ধ খোঁজার সময় একজন নারীর যে গুণগুলোকে তোমাদের প্রাধান্য দেয়া উচিত) সেগুলোর অন্যতম হলো পুণ্য।

একটি হাদীসে আছে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, জগৎ তো জীবনোপকরণ মাত্র আর পুণ্যবতী নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন উপকরণ বা সম্পদ আর নেই।

(সুনানে ইবনে মাজা, কিতাবুন নিকাহ, বাব আফযালুন নিসা, হাদিস নম্বর ১৮৫৫)

এ পৃথিবীর জীবন অতিবাহিত করার জন্য যে উপকরণ রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম উপকরণ হচ্ছে একজন পুণ্যবতী নারী।

একইভাবে অপর একটি হাদীসে আছে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, কোন নারীকে বিয়ে করার যে চারটি মৌলিক কারণ থাকতে পারে তা হচ্ছে– হয় তার ধনসম্পদ অথবা তার বংশমর্যাদা অথবা তার রূপ সৌন্দর্য অথবা তার ধার্মিকতা। কিন্তু তুমি প্রাধান্য দাও ধার্মিক নারীকে। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন এবং তুমি ধার্মিক নারী লাভ কর।

(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, বাব আল আকফায়ে ফিদ্দিন, হাদীস নম্বর ৫০৯০)

অতএব আমাদের পুরুষরাও যদি তাকওয়ার পথে চলে আর সেই গুণাবলীর ওপর দৃষ্টি রাখে, তাহলে প্রত্যেক মেয়েই পুণ্যের দিকে পূর্বের চেয়ে বেশি পদচারণাশীল হবে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সাধারণত আমাদের মেয়েরা পুণ্যের পথে পদচারণা করে। কিন্তু যারা সামাজিক প্রভাবে প্রভাবিত হয়,

তারাও যেন নিজেদের পুণ্যের মান সমুন্নত করে। পুণ্যের মান সমুন্নত হলে মেয়েরাও সেসব ছেলে খুঁজবে, যারা পুণ্যের সুউচ্চ মানে অধিষ্ঠিত। কেননা পুণ্যই হচ্ছে সম্পর্কের মানদণ্ড। সমকক্ষ বা সমান হয় তখন, যখন পুণ্য এবং তাকওয়ার মান সমান হয়। এটা তো হতে পারে না যে, এক অসৎ ও ডাকাত বলবে যে, আমার একজন পুণ্যবতী, সুন্দরী আর তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত স্ত্রী প্রয়োজন। একথা ভাবা উচিত নয় যে, সকল পুরুষকে মহানবী (সা.) নিষ্পাপ মনে করে বলে থাকবেন, তোমরা (পুরুষরা) সবাই পুণ্যবান আর পুণ্যের চুড়ান্ত মার্গে উপনীত আর এ কারণেই তোমরা পুণ্যবতী নারী খুঁজে নাও! পুণ্যবান ব্যক্তিকে অবশ্যই মহানবী (সা.) দোয়া দিয়ে থাকবেন। কেননা তার পুণ্য সম্পর্কে তিনি অবহিত থাকবেন। কিন্তু পুরুষদেরকে একটি নীতিগত কথাও তিনি বলেছেন যে, তোমরা পুণ্যবান হও। তোমরা যদি পুণ্যবান হও তবেই তো পুণ্যবতী নারীর সাথে সম্পর্ক করবে। তোমরা যদি পুণ্যবান না হও আর অপকর্মে লিপ্ত থাক, তাহলে কোনমুখে পুণ্যবতী নারীর সন্ধান করবে? অতএব, কেবল পুণ্যবান পুরুষই তো পুণ্যবতী স্ত্রী খুঁজবে। এভাবে নারী ও পুরুষ উভয়ই পুণ্য ও তাকওয়ার পথে চলে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়বে আর পুণ্যবান বংশধর রেখে যাওয়ার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধকারী হবে। অতএব এখানে এ দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে, উভয়েই পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হও, যেন পুণ্যবান বংশধারা অব্যাহত থাকে। বংশধর যেন এমন হয় যারা তাকওয়ার পথে পদচারী চমৎকার একটি সমাজের গোড়াপত্তন করবে। তারা এমন পরিবারের গোড়াপত্তন করবে যারা কিনা তাকওয়ার পথ অনুসরণকারী।

বর্তমানে সারা পৃথিবীতে যে ধৈর্যহীনতা, জাগতিকতার প্রতি আশক্তি এবং তাকওয়া শূণ্যতা রয়েছে, তা স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র বন্ধনেও ফাটল তৈরী করে রেখেছে। এর সমাধান কুরআনের এসব আদেশ নিষেধ মেনে চলার মাঝে নিহিত। আমাকে দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, আমাদের মেয়েরা, মহিলারা এবং পুরুষরাও আধুনিক যুগের ভাবধারায় প্রভাবিত হচ্ছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, "ভিন জাতির অনুকরণ করো না, যারা সম্পূর্ণরূপে জাগতিক উপকরণের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে"।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ২২)

তোমরা তাদের অনুসারী হয়ো না, যারা ইহজগতকেই সবকিছু মনে করে বসে

আছে। বিশেষভাবে এসব দেশে তালাকের হার অনেক বেড়ে গেছে। বস্তুবাদী লোকদের মাঝে অনেক পাপ চরম রূপ ধারণ করেছে। তাদের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক কিছুকাল টিকে থাকে, এরপর এ সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। পরিবেশগত কারণে এর প্রভাব আহমদীদের ওপরও পড়ছে। কেবল এখানেই নয় বরং পাকিস্তানেও, ভারতেও আর অন্যান্য স্থানেও এর ক্ষতিকর প্রভাব বিদ্যমান। সুতরাং আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে আত্মসংশোধনের দিকে। জগতের লোকদের অনুকরণে আমরা যেন নিজেদেরকেও ঐ অন্ধকারে নিমজ্জিত না করি, যা আসলে পৃথিবীর ধ্বংসের জন্য দায়ী, বরং আমাদের উচিত নিজেদের দূর্বলতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজেদের সংশোধনের দিকে মনোযোগ দেয়া।

বিভিন্ন দেশ থেকে অত্যন্ত উদ্বেগজনক পরিসংখ্যান আমার সামনে উঠে এসেছে। আমি যখন সেসব দেখি, তখন মোটের ওপর এটিই প্রতিভাত হয় যে, আমাদের মধ্যে তালাক এবং খোলার (অর্থাৎ বিবাহবিচ্ছেদের) হার বেড়েই চলেছে। এর কারণ হলো– ধৈর্য্যের অভাব, পুণ্যের ঘাট্তি এবং তাকওয়া থেকে বিচ্যুতি। এখানকার অর্থাৎ ব্রিটেনের গত তিন বছরের পরিসংখ্যান দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই; তালাক আর খোলার হার প্রায় তিন শতাংশ বেড়ে গেছে আর যত বিয়ে হয় এর বিশ শতাংশ তালাকে পর্যবসিত হয় (অর্থাৎ যতগুলো বিয়ের সিদ্ধান্ত হয় তার বিশ শতাংশ ভেঙ্গে যায়)। এদিকে আমাদেরকে গভীর দৃষ্টি দিতে হবে। বিবাহ ভেঙ্গে যাবার কারণগুলো এক ও অভিন্ন। কারণ যখন খোঁজা হয়, যেমনটি আমি বলেছি, দেখা যায় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে নোংরা বাক্য বিনিময়, দুর্ব্যবহার, ধৈর্য-সহ্যের অভাব, পিতামাতা ও ভাইবোন এবং আত্মীয়স্বজন কর্তৃক স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে অনধিকার হস্তক্ষেপ। তারা ছেলের পিতামাতা ও ভাইবোন হোক কিংবা মেয়ের, সম্পর্কের গণ্ডিতে যখন অন্যায় হস্তক্ষেপ করে, তখন তাদের মাঝে দূরত্ব আরো বৃদ্ধি পায়। রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়তা রক্ষার নির্দেশ যদিও রয়েছে কিন্তু পিতামাতা, ভাইবোনদের প্রতিও নির্দেশ আছে যে, তোমরা ঝগড়াবিবাদ সৃষ্টি করো না। স্বামী-স্ত্রীকে শান্তিতে ও স্বাচ্ছন্দে থাকতে দাও। এমনটি হলে বিচ্ছেদের ঘটনা কখনো এত দ্রুত ঘটতে পারে না। এছাড়া রয়েছে সত্য না বলা। বিয়ের পর অন্যান্য দেশ থেকে ছেলেরা এখানে আসে। এখানকার মেয়েরা সুশিক্ষত। ছেলে সম্পর্কে বলা হয় যে, ছেলে গ্র্যাজুয়েট, কিন্তু পরবর্তীতে খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, ম্যাট্রিক ফেল। এর ফলেও বিবাহ-বিচ্ছেদ

ঘটে। অনুরূপভাবে মেয়েদের সম্পর্কেও কিছু দূর্বলতার কথা সামনে আসে। সুতরাং সকল ক্ষেত্রে সদা সত্য কথা বলা উচিত।

বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার ব্যাপারে এ অভিযোগও রয়েছে যে, শ্বশুর-শাশুড়ি পুত্রবধুকে মারধর করে। কেবল পুত্রদের হাতে পুত্রবধুকে মার খাওয়ায় না, বরং এতটা সীমা ছাড়িয়ে যায় যে নিজেরাও বৌদের ওপর হাত উঠায়। সুতরাং আমি এখন বয়স্কা মহিলাদেরকে বলবো যে এটি কোনভাবেই বৈধ নয়। তারপর দেখা গেছে ছেলেরা এখানে এসে কতক অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। স্ত্রীরা তাদের সাথে থাকুক, তা তারা চায় না। স্ত্রী যদি পাকিস্তান থেকে এখানে এসে থাকে তাহলে কোন না কোন অজুহাতে তাদেরকে পাকিস্তানে রেখে আসার চেষ্টায় রত থাকে। একে অপরের পাপ্য অধিকার প্রদান করতে চায় না আর জামা'ত যখন তাদের মাঝে মিমাংসার চেষ্টা করে, তাদের সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে, তখন তারা জামা'তের সাথে সহযোগীতা করে না।

অতএব পারিবারিক সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার অনেকগুলো কারণই রয়েছে তবে মূল কারণ হলো তাকওয়ায় ঘাট্তি। এর ফলে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়াচ্ছে আর এর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। মহিলা ও পুরুষদেরকে আল্লাহ্ তা'লা বিবেকবুদ্ধি দান করুন, তারা যেন তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে নিজেদের বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করে।

অতএব এদিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে অন্তর্ভুক্ত করে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, আমরা যেন সেই অনুগ্রহের মূল্যায়ন করি। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির প্রতি আমাদের দৃষ্টি থাকা চাই। নিজেদের জন্য ইহজগতে আমরা কী অর্জন করলাম তা না দেখে আমাদের দেখতে হবে আগামী দিনের জন্য আমরা অগ্রে কী প্রেরণ করেছি? সকল নারী-পুরুষকে আল্লাহ্ এ সামর্থ্য দান করুন।

[যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় লাজনাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৩ জুলাই ২০১১;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৪ মে ২০১২]